আগমনী

। প্রথম বৎসর, ১৩২৬ ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সমাজপতি

সম্পাদিত

[illegible]

বাঙ্গালা সাহিত্য মন্দির হইতে

শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা

মূল্য ২॥০ টাকা

মুদ্রাকর।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বসুমতী প্রেস

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নিবেদন

যাহাদের সাহায্যে এই সংগ্রহের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইল, যাঁহারা রচনা ও ছবি দিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আগমনী নামটি নির্ব্বাচন করিয়া দিয়া আমার ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

মহালয়া
১৩২৬

শ্রীসুরেশ সমাজপতি

চিত্রসূচী

সমস্ত চিত্রগুলি কলিকাতা ফটো-টাইপ কোম্পানী প্রস্তুত করিয়াছেন,
চিহ্নিত চিত্রগুলি তাঁহারা মুদ্রিত করিয়াছেন।

আগমনী

ত্রিবেণী-মঙ্গল

জ্ঞান ধর্ম্ম প্রেম— উজ্জ্বল হেম
মিলিলে ত্রিবেণী যোগে,
ও তিন হরিণ হলে যূথহীন,
আধ্‌খানা হয় রোগে ॥

খদ্যোৎ কীট করে মিট মিট
জ্ঞান হ'লে পথহীন।
পথবাঁধা জ্ঞান জ্যোতি রস প্রাণ,
তিনে এক একে তিন ॥

যুগভাঙ্গা প্রেম বাহিরেই হেম,
ভিতরে ফোঁপরা মাটী।
কি ছার স্বরগ চতুর নরগ,
প্রেম যদি হয় খাটী ॥

জ্ঞান প্রেম যার যুগল আধার,
ধরম-সে নাহি টলে।
হলে যুগভাঙ্গা ধরমের ডাঙ্গা
ধসি' যায় জলতলে ॥

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগমনী

১

আয়োজন চলেইচে। তার মাঝে একটুও ফাঁক পাওয়া যায় না যে, ভেবে দেখি, কিসের আয়োজন।

তবুও কাজের ভিড়ের মধ্যে মনকে এক একবার ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "কেউ আসবে বুঝি?"

মন বলে, "রোসো! আমাকে জায়গা দখল কর্‌তে হবে, জিনিসপত্র জোগাতে হবে, ঘরবাড়ী গড়্‌তে হবে, এখন আমাকে বাজে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করো না।"

চুপচাপ ক'রে আবার খাট্‌তে বসি। ভাবি, জায়গা দখল সারা হবে, জিনিষপত্র সংগ্রহ শেষ হবে, ঘরবাড়ী গড়া বাকী থাক্‌বে না, তখন শেষ জবাব পাওয়া যাবে।

জায়গা বেড়ে চলেচে, জিনিষপত্র কম হ'ল না, ইমারতের সাতটা মহল সারা হ'ল। আমি বল্‌লেম, "এইবার আমার কথার একটা জবাব দাও।"

মন বলে, "আরে রোসো, আমার সময় নেই।"

আমি বল্‌লেম, "কেন, আরো জায়গা চাই? আরো ঘর, আরো সরঞ্জাম?"

মন বল্‌লে, "চাই বই কি।"

আমি বল্‌লেম, "এখনো যথেষ্ট হয়নি?"

মন বল্‌লে, "এতটুকুতে ধরবে কেন?"

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "কি ধরবে? কাকে ধরবে?"

মন বল্‌লে, "সে সব কথা পরে হবে।"

তবু আমি প্রশ্ন কর্‌লেম, "সে বুঝি মস্ত বড়?"

মন উত্তর কর্‌লে, "বড় বই কি।"

এত বড় ঘরেও তাকে কুলবে না, এত মস্ত জায়গায়! আবার উঠে পড়ে লাগ্‌লেম। দিনে আহার নেই, রাত্রে নিদ্রা নেই। যে দেখ্‌লে, সেই বাহবা দিলে, বল্‌লে, "কাজের লোক বটে!"

এক একবার কেমন আমার সন্দেহ হ'তে লাগ্‌ল; বুঝি মন বাঁদরটা আসল কথার জবাব জানে না। সেই জন্যেই কেবল কাজ চাপা দিয়ে জবাবটাকে সে ঢাকা দেয়। মাঝে মাঝে এক একবার ইচ্ছা হয়, কাজ বন্ধ ক'রে কান পেতে শুনি, পথ দিয়ে কেউ আসচে কি না। ইচ্ছা হয়, আর ঘর না

বাড়িয়ে ঘরে আলো জ্বালি, আর সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ না ক'রে ফুল ফোটবার বেলা থাকতে থাকতে মালা গেঁথে রাখি।

কিন্তু ভরসা হয় না। কারণ, আমার প্রধান মন্ত্রী হ'ল মন। সে দিনরাত তার দাঁড়িপাল্লা আর মাপকাঠি নিয়ে ওজনদরে আর গজের মাপে সমস্ত জিনিস যাচাই করচে। সে কেবল বলচে, "আরো না হলে চল্‌বে না।"

"কেন চল্‌বে না?"

"সে যে মস্ত বড়।"

"কে মস্ত বড়?"

বাস্, চুপ। আর কথা নেই।

যখন তাকে চেপে ধরি, 'অমন ক'রে এড়িয়ে গেলে চল্‌বে না, একটা জবাব দিতেই হবে,' তখন সে রেগে উঠে বলে, "জবাব দিতেই হবে, এমন কি কথা? যার উদ্দেশ মেলে না, যার খবর পাইনে, যার মানে বোঝবার জো নেই, তুমি সেই কথা নিয়েই কেবল আমার কাজ কামাই ক'রে দাও। আর আমার এই দিক্‌টাতে তাকাও দেখি! কত মামলা, কত লড়াই, লাঠি সড়কি পাইক বরকন্দাজে পাড়া জুড়ে গেল; মিস্ত্রীতে মজুরে, ইঁট কাঠ চুন সুরকিতে কোথাও পা ফেল্‌বার জো কি! সমস্তই স্পষ্ট, এর মধ্যে আন্দাজ নেই, ইসারা নেই। তবে এ সমস্ত পেরিয়েও আবার প্রশ্ন কেন?"

শুনে তখন ভাবি, "মনটাই সেয়ানা, আমিই অবুঝ।" আবার ঝুড়িতে ক'রে ইঁট বয়ে আনি, চুনের সঙ্গে সুরকি মেশাতে থাকি।

২

এমনি করেই দিন যায়। আমার গাঁথনি ভিত পেরিয়ে গেল, ইমারতে পাঁচতলা সারা হয়ে ছ তলার ছাদ পিটনো চলচে। এমন সময়ে একদিন বাদ্‌লা মেঘ কেটে গেল, কালো মেঘ হোলো সাদা; কৈলাসের শিখর থেকে ভৈরোঁর তান নিয়ে ছুটির হাওয়া বইল, মানসসরোবরের পদ্মগন্ধ দিনরাত্রির দণ্ডপ্রহরগুলোকে মৌমাছির মত উতলা ক'রে দিলে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সমস্ত আকাশ হেসে উঠেচে, আমার ছ'তলা ঐ বাড়িটার উদ্ধত ভারাগুলোর দিকে চেয়ে।

আমি ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেম; যাকে দেখি, তাকেই জিজ্ঞাসা করি, 'ওগো, কোন্ তোষাখানা থেকে আজ নহবৎ বাজ্‌চে বল ত?"

তারা বলে, "ছাড়, আমার কাজ আছে।"

একটা ক্ষ্যাপা পথের ধারে গাছের গুঁড়িতে হেলান্ দিয়ে মাথায় কুন্দফুলের মালা জড়িয়ে চুপ করে বসে ছিল। সে বল্‌লে, "আগমনীর সুর এসে পৌঁছল।"

আমি যে কি বুঝ্‌লেম, জানিনে, ব'লে উঠ্‌লেম, "তবে আর দেরী নেই।"

সে হেসে বল্লে, "না, এল বলে।"

তখনি খাতাঞ্জিখানায় এসে মনকে বল্‌লেম, "এবার কাজ বন্ধ কর।"

মন বল্‌লে, "সে কি কথা। লোকে যে বল্‌বে অকর্ম্মণ্য।"

আমি বললেম, "বলুকগে।"

মন বল্‌লে, "তোমার হ'ল কি। কিছু খবর পেয়েছ নাকি।"

আমি বল্‌লেম, "হাঁ, খবর এসেচে।"

"কি খবর?"

মুস্কিল, সুস্পষ্ট ক'রে জবাব দিতে পারিনে। কিন্তু খবর এসেচে। মানসসরোবরের তীর থেকে আলোকের পথ বেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হাঁস এসে পৌঁছল।

মন মাথা নেড়ে বল্‌লে, "মস্ত বড় রথের চুড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারী সমারোহ? কিছু ত দেখিনে, শুনিনে।"

বল্‌তে বল্‌তে আকাশে কে যেন পরশমণি ছুঁইয়ে দিলে। সোনার আলোয় চারদিক্ ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌ল। কোথা থেকে একটা রব উঠে গেল,—"দূত এসেচে।"

আমি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দূতের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা কর্‌লেম, "আস্‌চেন নাকি?"

চারদিক্ থেকে জবাব এল—"হাঁ, আস্‌চেন।"

মন ব্যস্ত হয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "কি করি। সবেমাত্র আমার তেতলা বাড়ীর ছাদ পিটোনো চল্‌চে; আর সাজসরঞ্জাম সব ত এসে পৌঁছল না।"

উত্তর শোনা গেল, "আরে, ভাঙো, ভাঙো তোমার ছ'তলা বাড়ী ভাঙো।"

মন বল্‌লে, "কেন?"

উত্তর এল, "আজ আগমনী যে। তোমার ইমারৎটা বুক ফুলিয়ে পথ আট্‌কেচে।"

মন অবাক্ হয়ে রইল।

আবার শুনি, "ঝেঁটিয়ে ফেল তোমার সাজসরঞ্জাম।"

মন বল্‌লে, "কেন?"

"তোমার সরঞ্জাম যে ভিড় ক'রে জায়গা জুড়েচে।"

৩

যাক্ গে। কাজের দিনে ব'সে ব'সে ন'তলা বাড়ী গাঁথলেম, ছুটির দিনে একে একে সব ক'টা তলা ধূলিসাৎ করতে হ'ল। কাজের দিনে সাজ-সরঞ্জাম হাটে হাটে সংগ্রহ করা গেল, ছুটির দিনে সমস্ত বিদায় করেছি।

কিন্তু মস্ত বড় রথের চূড়ো কোথায়, আর মস্ত ভারী সমারোহ?

মন চারদিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে।

কি দেখ্‌তে পেলে?

শরৎপ্রভাতের শুকতারা।

কেবল ঐটুকু?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখ্‌তে পেলে শিউলিবনের শিউলি ফুল।

কেবল ঐটুকু?

হাঁ, ঐটুকু। আর দেখা দিল ল্যাজ দুলিয়ে ভোরবেলাকার একটি দোয়েল পাখী।

আর কি?

আর একটি শিশু, সে খিল্‌খিল্ ক'রে হাস্‌তে হাস্‌তে মায়ের কোল থেকে ছুটে পালিয়ে এসেছে বাইরের আলোতে।

তুমি যে বল্‌লে আগমনী, সে কি এরই জন্যে?

হাঁ, এরি জন্যেই ত প্রতিদিন আকাশে বাঁশী বাজে, ভোরের বেলায় আলো হয়।

এরি জন্যে এত জায়গা চাই?

হাগো, তোমার রাজার জন্যে সাতমহলা বাড়ী, তোমার প্রভুর জন্যে ঘরভরা সরঞ্জাম। আর এদের জন্যে সমস্ত আকাশ, সমস্ত পৃথিবী।

আর মস্ত বড়?

মস্ত বড় এইটুকুর মধ্যেই থাকেন।

মন আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "হাঁ গো কবি, কিছু দেখ্‌তে পেলে, কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লে?"

আমি বল্‌লেম, "সেই জন্যেই ছুটি নিয়েছি। এত দিন সময় ছিল না, তাই দেখ্‌তে পাইনি, বুঝ্‌তে পারিনি।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বামুনের দুর্গোৎসব

১

"মা, তুমি কান্‌ছ কেন ?"

একটি আট-নয় বছরের ব্রাহ্মণের ছেলে, গলায় এক গোছা ধপ্‌ধপে পইতা, দিব্য মোটা-সোটা নুদুস্‌নুদুস্‌ গড়িপানা ছেলে, একটি ঘেরা বাড়ীর উত্তরের পোতার বড় ঘরের দাওয়ার একপাশে খেলা করিতে করিতে দৌড়িয়া আর এক পাশে মায়ের কাছে গেল ও মায়ের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া দেখিল, মায়ের চোখ দিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল পড়িতেছে—দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল :—"মা, তুমি কাঁ'দ্‌ছ কেন ?"

অনেকদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বাড়ীতে যে চা'ল তৈয়ারি করা ছিল, তা' প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আগের দিন একটু ধরণ করায় মা কিছু ধান সিদ্ধ করিয়াছেন, এবং সেইগুলি ঘরের বড় দাওয়ায় তালপাতার চেটাই বিছাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিতেছেন। ধান ত প্রায়ই উঠানে শুকায় ; কিন্তু এখন বিশ্বাস ত নাই। কখন্ বৃষ্টি আসিয়া ধান সব আবার ভিজাইয়া দিবে, আর ভিজাইয়া দিলেই চা'লে এক সাঁদবুড়া গন্ধ বাহির হইবে। তাই মা ধানগুলি দাওয়াতেই শুকাইতে দিতেছেন—এমন সময়ে দূরে খোলকরতালের শব্দ ও হরিনামের রোল উঠিয়া মাকে জানাইয়া দিল যে, আজ জন্মাষ্টমী।

জন্মাষ্টমীর দিন এ বাড়ীর কাঠামপূজা হইত। মা ক'নে বৌ সাজিয়া যে দিন এ বাড়ীতে পা দিয়াছেন, সেই দিন হইতে এ পর্য্যন্ত কোন জন্মাষ্টমীর দিনেই কাঠামপূজা ফাঁক যায় নাই—এবার বুঝি ফাঁক যায়। কারণ, কর্ত্তাটি চৈত্রমাসের সংক্রান্তির দিন স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক আট বছরের ছেলে ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার আর বছর ফিরিবে না। তাই মাঘমাসেই তিনি ছেলেটির পইতা দিয়াছিলেন, এবং তাহাকে শালগ্রাম ও বাণলিঙ্গের পূজা করিতে ও ভোগ দিতে শিখাইয়াছিলেন, আর তা'র সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর দরকারি লক্ষ্মীপূজা-ষষ্ঠীপূজোটাও শিখাইয়াছিলেন। ছেলের বিদ্যা ত ঐ পর্য্যন্ত। কিন্তু সে বালক হইলেও অতি সাত্ত্বিকভাবে যে সব নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা সে শিখিয়াছিল, তাহার অনুষ্ঠান করিত, মাকে বড় একটা শুধ্‌রাইয়া দিতে হইত না।

আজ মায়ের চোখে জল দেখিয়া ছেলে বড়ই ব্যস্ত হইয়া উঠিল, আর একশ'বারই জিজ্ঞাসা

করিতে লাগিল—"মা, তুমি কা'ন্দ কেন?" ছেলে যতই জেদ করিতে লাগিল, মায়ের চোখের জলও ততই বাড়িতে লাগিল। মা একবার ভাবেন—বলিয়া ফেলি, আবার ভাবেন—এ যেরূপ ছেলে, বলিলে ত এখনই পূজা করিতে চাহিবে; কিন্তু আমার ত কোনই সম্বল নাই, কি দিয়া পূজা নির্ব্বাহ হইবে? আবার ভাবিলেন—"মা জগদম্বা ত বছরের মধ্যে একবার আসা। তার'ই জন্য বাড়ী, তা'রই জন্য ঘর, তা'রই জন্য বিষয়, তা'রই জন্য বৈভব। তাঁই যদি না আনিতে পারিলাম, ত গৃহস্থালীতেই কাজ কি? গৃহস্থালী রাখিতে হইলে, বিশেষ আমাদের পক্ষে, জগদম্বাকে আনা চাই-ই চাই-ই।"

মা এই সব ভাবিতেছেন, আর চুপ করিয়া কেবল চোখের জল ফেলিতেছেন, ছেলে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"বল না মা, কা'ন্‌ছ কেন?"—বলিয়াই মায়ের অঞ্চল দিয়া মায়ের চোখদুটি মুছাইয়া দিল। বলিল—"তোমাকে বলিতেই হইবে।" ছেলে আবার জেদ ধরিল।

"আজ না জন্মাষ্টমী?"

"হাঁ মা, আজ ত জন্মাষ্টমী বটেই। ঐ যে বৈষ্ণবদের বাটীতে খোলকরতাল বাজিতেছে; আমিও পাঁজিতে দেখিয়াছি। কিন্তু জন্মাষ্টমী হইল, তা, তুমি কাঁদিবে কেন?"

"জন্মাষ্টমীর দিন না তোদের বাড়ী চিরদিনই কাঠামপূজা হইয়া থাকে?"

"হয় ত বটে। কিন্তু এবার ত কোনই উদ্যোগ দেখিতেছি না।"

"কে করিবে বাছা! কর্ত্তা কি আছেন?"

"আমিই করিব মা—কাঠাম ত রহিয়াছে।"

"দূর পাগ্‌লা ছেলে—তুই কেমন ক'রে ক'রবি? দুর্গোৎসব কি কম ব্যাপার! অনেক অর্থবল চাই—অনেক লোকবল চাই। শেষ কি একটা ঢলাঢলি ক'রবি?"

"না মা—ঢলাঢলি কেন হ'বে? বছরের মধ্যে একবার বই ত নয়? পা'রব না কেন? তা'র পর মা জগদম্বা ত প্রতিবছরই আসিয়া থাকেন। তাঁকেই আনিতে পারিবে না বলিয়াই ত তুমি কাঁদিয়া আকুল। তাঁ'রই কি আমাদের উপর কোন মায়া নাই? তিনি ত শুনিয়াছি, না ডাকিলেও লোকের বাড়ী যান। তুমি এত ডাকিতেছ, এত কাঁদিতেছ; তিনি আসিবেন না?"

বলিয়াই ছেলে ছুটিয়া চণ্ডীমণ্ডপে গেল। সেখানে চণ্ডীমণ্ডপের দুই বৃহৎ শালকাঠের আড়ার উপর কাঠামখানি রসান ছিল, পাড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিল। খুঁটি বাহিয়া সে আড়ায় উঠিল, কিন্তু আড়ার উপর বসিয়া সে ভারী কাঠাম নাড়িতেও পারিল না। সে ভাবিল, "যদি বা কোন রকমে কাঠাম নাড়াইবার চেষ্টা করি, কাঠাম পড়িয়া যাইবে, পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাইবে।" সুতরাং সে নামিয়া প—
—নামিয়াই সে একছুটে কিশোরীদাদার বাড়ীতে আসিল। কিশোরীদাদা আতিতে সদ্গোপ, বেশ

চওড়া দেহখানি, গায়েও যথেষ্ট বল আছে। সে ব্রাহ্মণঠাকুরকে দাদা বলিত, তাই সে এই বালকের 'কিশোরীদাদা।'

কিশোরীদাদা তখন দোব্‌জা কাঁধে করিয়া এক কলসী আখের গুড় লইয়া বেচিতে যাইতেছে। দশ বারো দিন মেঘ হওয়ায় সে ঘরের বাহির হইতে পারে নাই। হাতে তা'র আজ একটি পয়সাও নাই। সে তাই গুড় বেচিয়া পয়সার সংস্থান করিবে। এখন বামুনদাদাঠাকুর আসিয়া ধরিল—"কিশোরীদাদা, চল, আজ আমাদের বাড়ী কাঠামপূজা।"

কিশোরীদাদা। মা ত পূজা করিতে প্রস্তুত আছেন ?

"মা ত আছেনই, আমিও আছি। কিন্তু তুমি না গেলে হ'বে না—কাঠামই নামান হ'চ্ছে না। তুমি না গেলে পূজাই হ'বে না।"

কিশোরীদাদার আর গুড় বেচিতে যাওয়া হইল না। গুড়ের নাগরীটি ছোট ভাইএর হাতে দিয়া বলিল—"ভাই, তুমিই যাও, যা' হয় তুমিই করিয়া আইস। মা আমায় স্মরণ করিয়াছেন, আমায় যাইতেই হইবে।"

কিশোরীদাদা আসিয়া এক লাফে আড়ার উপরে উঠিলেন, কাঠামের হাতল দুইটি আড়া হইতে উঠাইলেন, ধীরে ধীরে ধীরে কাঠামখানি আড়ার উপর হইতে ঝুলাইয়া দিলেন ; সঙ্গে দুই-গাছা কাছি আনিয়াছিলেন, একটা হাতলের দুইদিকে কাছি বাঁধিয়া কাঠামখানি আস্তে আস্তে নামাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের মেজের উপর শুয়াইয়া দিলেন।

ছেলের তখন ত ভারী আমোদ। ছুটিয়া মাএর কাছে গিয়া সংবাদ দিল—

"মা, কাঠাম নামান হইয়াছে।"

"বলিস্ কি রে ? কে নামাইল ?"

"কেন, কিশোরীদাদা।"

"কিশোরীও বুঝি আসিয়াছে ? তা'কে বাড়ীর ভিতরে ডাক্।"

কিশোরী আসিয়া মাকে গড় করিয়া বলিল—"আমিও তাই ভাবিতেছিলাম—চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক যা'বে ? এত কালের পূজাটা আজ বন্ধ হ'বে। যেমন জোটে, তেমনই করিয়া মাএর পদে জবা ও বিল্বদল দেওয়া হ'বে। তা আপনি ভালই সঙ্কল্প করিয়াছেন। বামুনের বাড়ী, বিশেষ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বাড়ী—চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক যাওয়া উচিত নয়।"

মা। তা বাবা, তোমরাই ভরসা। দেখ, যেন ছেলেটা মায়ের কাছে অপরাধী না হয়।

২

দুপুরবেলা ঢোল বাজিল, নৈবেদ্য আসিল, ধূপ ধুনা পুষ্পপাত্র সব আসিল. ষোড়শোপচারে চণ্ডীর পূজা হইল—কাঠামপূজা শেষ হইয়া গেল।

বৈকালে দাদাঠাকুরের প্রকাণ্ড উঠানে একটি একটি একটি করিয়া অনেকগুলি পাড়ার মেয়ে আসিয়া জুটিল; বুড়ী আছে, আধাবয়সী আছে, যুবতী আছে, বালিকাও আছে। উঠানটি নিত্যই গোবর দেওয়া হয়, ধূলা তাতে বড় একটা হয় না। সকলেই উঠানে বসিল। বিশেষ সেদিন বৃষ্টি হয় নাই। বেশ রৌদ্র হইয়াছিল, খাসা হাওয়া বহিতেছিল। বাহিরে বসাই সকলে পছন্দ করিল। এক জন বৌ গিন্নীকে বলিল—"তা মা, বেশ হয়েছে। আমরা পাড়ার সকলেই প্রতিমা-দর্শন করিতে পাইব। পাড়ায় আরও ত অনেকে আছেন। কিন্তু তাঁরা ত এ কাজ করেন না। তোমার বাড়ীতে পূজা হ'লে, তবু আমরা দেখতে-শুনতে, করতে-কর্মাতে পাব।"

এক জন আধাবয়সী,—গিন্নীবান্নীগোছের—তিনি বলিলেন:—"তোমাদের কর্তাটির ত কাল হ'য়েছে চার-পাঁচ মাস। এর মধ্যে ত তোমাদের আর কিছুই হয় নাই। সংসার চালানোই কষ্ট। তুমি কি সাহসে কাঠামপূজা করিয়া দুর্গোৎসবে ঝাঁপ দিলে?"

ইহার উত্তরে আর এক জন গিন্নীবান্নী বলিয়া উঠিলেন:—"না দিয়েই বা কি করে? চির দিনের পূজা বাদই দেয় কি ক'রে? চণ্ডীমণ্ডপটা ফাঁক দেখিলে প্রাণটা যেন হু হু ক'রে উঠে, তাই গিন্নী যেমন করেই হোক, কাঠামপূজাটা ক'রে মায়ের আসবার পথ ক'রে নিলেন।"

বাড়ীর কর্ত্রী।—আমি ত জানি, কত ধানে কত চাল। পূজা করিতে কি লাগে—কত লোক-জন দরকার—সবই জানি। কর্তা গিয়া অবধিই সংসারে কি অনটন হইয়াছে, তাও দেখিতেছি। কিন্তু কি করিব? পোড়া ছেলে যে ছাড়ে না। আমার চোখে জল দেখে 'মা, তুই কাঁদলি কেন? মা, তুই কাঁদলি কেন?'—এই যে ধরিল, আমার মনের কথাটি বার ক'রে নিলে, তবে ছাড়লে। তার পর যা কিছু করিবার, সেই সব করেছে। কাঠাম নামাইয়াছে, পূজার আয়োজন করিয়াছে, পুষ্পপাত্র সাজাইয়াছে, নৈবেদ্য করিয়াছে, যেমন হোক ষোড়শোপচারে চণ্ডীর পূজাটা করিয়াছে, ব'সে ব'সে একরূপ চণ্ডীর পাঠ করিয়াছে। তৃতীয় প্রহরে চারিটি খেয়ে কুমোর ডাকিতে গিয়াছে।

আর এক জন।—ও মা, সে কি? সে কেমন ক'রে পূজা করলে? তার যে এখনও মন্ত্র হয় নাই।

গিন্নী।—সে কথা ভুলেছিলাম, মা, সে কথা ভুলেছিলাম। তা সে বললে 'চণ্ডীর পূজা সকল ব্রাহ্মণেই করিতে পারে। তবে দুর্গোৎসব মন্ত্র না নিলে হয় না। তা এই পূর্ণিমার দিন ঠাকুরবাড়ী গিয়ে মন্ত্র নিব। বোধনের আগেই আমাদের মন্ত্র নেওয়া হয়ে যাবে।'

আর এক জন।—সে কি? কালাশৌচের বছর—মন্ত্র নেওয়াই হবে কেমন ক'রে, দুর্গোৎসবই না হবে কেমন ক'রে?

গিন্নী।—কর্ত্তা বোধ হয় মনে মনে জানিতেন, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন—'আমার ত একটি বই ছেলে নয়। তা সে যেন ষোলটা মাসিক আর সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পরই সারিয়া ফেলে।' তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, 'বৃষোৎসর্গ না হ'লে প্রেতত্ব-পরিহার হয় না, আর সপিণ্ডীকরণ না হ'লে পিতৃলোকে যাওয়া যায় না।'

আর এক জন।—তাই বুঝি, তোমাদের বাড়ীতে হপ্তাখানেক ধ'রে শ্রাদ্ধ হয়েছিল? আর ঐ দুধের ছেলেটি কত উপোসই করেছে, আর কত কষ্টই পেয়েছে।

আর এক জন।—ছেলেটি যথার্থই ব্রাহ্মণের ছেলে, বাপ-মার উপর বড়ই ভক্তি। যে ঐ বয়সে মায়ের চোখে এক ফোঁটা জল দেখে দুর্গোৎসব করতে যায়, সে যে বাপের জন্য তিন চারি দিন ধরিয়া শ্রাদ্ধ করিবে—আশ্চর্য্য কি?

আর এক জন গিন্নী নথ নাড়িয়া বলিলেন :—'বুঝি না বাপু, মান ষোল দানেরই আশ্রত, সে কি ক'রে এ রকম বৃহৎব্যাপারে হাত দেয়।'

এক যুবতী।—কাজ কি আমাদের সে কথায় বাপু? আগুন খাবে সে-সেই সে কি বলে না?

এক জন বুড়ী বলিয়া উঠিলেন।—কাজ ত খুবই ভাল বটে—ছেলেও উৎসাহ ক'রে লেগেছে, মাও তার সঙ্গে খাট্‌ছে, তবে কি জান' দুর্গাবিপত্তি না হ'লে হয়।"

এই সব কথা কহিতে কহিতে সন্ধ্যা হইল। এক এক করিয়া কাপড় ঝাড়িয়া সকলে উঠিয়া পড়িলেন। গিন্নীরও ঘরে সন্ধ্যা দিবার সময় হইল। তিনি প্রদীপ জ্বালিয়া ঘরে ঘরে দেখাইতেছেন, কিন্তু তাঁহার কানে বাজিতেছে—'দুর্গাবিপত্তি না হ'লেই বাঁচি।'

এমন সময়ে নাচিতে নাচিতে ছেলে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইয়াই বলিল—"মা, শ্যাম কাকার কাছে গিয়াছিলাম। সে কাল সকালেই আসিয়া কাঠামতে খড় জড়াইবে।"

৩

ছেলের ত রোখ চাপিয়াছে। তাহাকে ফিরাইবার যো নাই। গিন্নীর কিন্তু ক্রমে ভাবনা আসিয়া ঢুকিল।—কেমন করিয়া দায় উদ্ধার হইবে, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইতেছেন না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে হইল, এই সময়ে তিনি একবার বার্ষিক আদায় করিতে বাহির হইতেন। কিন্তু কি বার্ষিক, কত বার্ষিক, কোথায় বার্ষিক, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। তাহার কোনও ফর্দ্দও ছিল না।

তিনি বাক্স পেটরা খুঁজিলেন, কিছুই পাইলেন না। যে পুঁথিখানি তিনি পড়িতেন, তাহার প্রতি পাতা উল্টাইয়া উল্টাইয়া দেখিলেন, ফর্দ্দ ত পাওয়া গেল না। তখন তাঁহার মনে হইল, পাশের গাঁয়ে স্বরূপ দাস বলিয়া এক জন সদ্গোপ অনেকবার বার্ষিক আদায় করিবার সময় তাঁহার তল্পীদার হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াই ছেলেকে স্বরূপ দাসের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আসিলে তাহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কর্ত্তা কোথায় কোথায় বার্ষিক পাইতেন, জান কি?" সে বলিল, "কলিকাতায় গেলে আমি সেই সব বাড়ী চিনাইয়া দিতে পারি, কিন্তু নাম ত কাহারও জানি না। বাগবাজারে দুই ঘর, শোভাবাজারে এক ঘর, হোগলকুঁড়েয় দুই ঘর, তা'র পর যোড়াসাঁকোয় দুই ঘর, পাথুরেঘাটায় এক ঘর, বৌবাজারে এক ঘর ও হাটখোলাতে এক ঘর। হাটখোলার দত্তেরা তাঁহাকে বড় ভক্তি করিত, তিনি সেই বাড়ী অতিথি হইতেন; যে কয় দিন থাকিতেন, তাঁহারা সিধা বাঁটিয়া দিতেন, সিধায় আমাদের দু'জনের কোন জিনিসেরই অকুলান হইত না। আমি সবই করিয়া দিতাম, তিনি কেবল চড়াইয়া নামাইয়া লইতেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৫০টি টাকা আদায় হইত।"

৫০টি টাকা আদায় হইতে পারে শুনিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল। ছেলেরও মহাস্ফূর্ত্তি। সে বলিল, "স্বরূপদাদা, তুমি যদি সঙ্গে যাও, ত আমি বার্ষিক আদায় করিয়া আনিতে পারি।"

স্বরূপদাদা।—আমি বুড়া হইয়াছি, আমার যাইতে দেরী হইবে। কিন্তু আমি না গেলেও তোমায় ত কেহ বাড়ী চিনাইয়া দিতে পারিবে না। কর্ত্তার অনেক খেয়েছি। তুমি বলিলে না গিয়াও ত থাকিতে পারি না।

গিন্নী।—তুমি বুড়া হইয়াছ, আস্তে আস্তে যাইবে। আর ঐ বা কোন্ জোয়ান! এও ত বালক। তোমরা দুই জনেই আস্তে আস্তে যাইবে, রাস্তায় তোমাদের মিল হইবে ভাল। তাহা হইলে তোমরা এ পক্ষের প্রতিপদেই যাত্রা করিবে। কেন না, পূর্ণিমার দিন ছেলেটাকে আবার মন্ত্র লইতে হইবে।

মাঝে যে কয়টা দিন ছিল, মা ও ছেলে দুই জনেই যথাসাধ্য পূজার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; ধান ভানিয়া চাল তৈয়ারি করিতে আরম্ভ করিলেন, ডাল কড়াই ভাঙ্গাইতে লাগিলেন, বড়ী দিতে লাগিলেন, সব গাছ ঝুড়িয়া নারিকেল পাড়াইলেন, বাগদেগুলিকে কাটিয়া জ্বালানি কাঠ করিলেন, কাটীগুলি ঝাঁটার জন্য রাখিলেন, পাতাগুলি জ্বাল দিবার জন্য আঁটি বাঁধিয়া রাখিলেন, নারিকেলের ছোবড়াগুলিও জ্বালানি হইবে—বিশেষ লোকজনের তামাক খা'বার সময় বড়ই দরকারে লাগিবে, নারিকেলগুলি কুরিয়া, তাহা হইতে দুধ বাহির করিয়া, কলসী পূরিয়া রাখিলেন—সে দুধ জ্বাল দিয়া তেল হইবে, নারিকেলকোরাগুলি কতক গুড় দিয়া নারিকেল-নাড়ু হইল; কতক চিনি দিয়া পাক করিয়া রসকরা হইল।

খিড়কীর বাগানে যে সব তরাতরকারীর গাছ ছিল, সেগুলি বেশ করিয়া নিড়াইয়া দেওয়া হইল, ঘাস মারিয়া দেওয়া হইল, মাচাগুলি ভাল করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল, লাউ, কুমড়া, শশা, বরবটী, বেগুনগাছগুলির বেশ পাট করিয়া দেওয়া হইল, যেন যথাসময়ে সে সকল পূজায় লাগিতে পারে। কিন্তু গিন্নীর সকলের উপর এক কাজ, মাকে ডাকা—'মা, লজ্জা রক্ষা ক'রো।'

ব্রতপক্ষের প্রতিপদের দিন ছেলে ও স্বরূপদাদা বার্ষিক আদায়ে বাহির হইল। দশ বছরের ছেলে, কখনও বাড়ীর বাহির হয় নাই, তাহাকে পাঠাইয়া—কোথায় যে পাঠাইতেছেন, তাহারও ঠিক নাই—গৃহিণী অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিলেন, অদৃষ্টকে ধিক্কার দিলেন, তার পর মনে মনে মা জগদম্বার হাতে ছেলেটিকে সঁপিয়া দিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

ভোরে যাত্রা করিয়া স্বরূপদাদা ও ছেলেটি পাঁচ ক্রোশ হাঁটিয়া দুপুরবেলায় স্বরূপদাদার এক কুটুম্ববাড়ীতে উপস্থিত হইল। স্বরূপদাদা কুটুম্বের বাড়ীতেই খাইলেন। ছেলেটি সদেগাপদের গোয়ালে এককোণে সিদ্ধপক বাঁধিয়া খাইল। সদেগাপেরা দুধ ও গুড় দিল। বেলা দুই তিনটার সময়ে চানকের পাকা রাস্তায় পড়িয়া সন্ধ্যার কিছু পরেই তাঁহারা হাটখোলার দত্তদের অতিথি-শালায় উপস্থিত হইল। দশবছরের এক ব্রাহ্মণের ছেলে বার্ষিক সাধিতে আসিয়া অতিথি হইয়াছে শুনিয়া বাড়ীর বড় কর্ত্তা ছেলেটিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং তাহার পরিচয় লইলেন। ছেলে বলিল, তাহার নাম মাণিক্যচন্দ্র দেবশর্ম্মা, পিতার নাম ঠাকুর নবকিশোর শিরোমণি। নিবাস নোনাচন্দনপুকুর।

কর্ত্তা শুনিয়াই বাড়ীর ভিতর খবর দিলেন—"নোনাচন্দনপুকুরের নবকিশোর শিরোমণির কাল হইয়াছে। তাহার দশ বছরের ছেলে বার্ষিক সাধিতে আসিয়া আমার বাড়ীতে অতিথি হইয়াছে।" মেয়েরা ছেলেটিকে বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং যথেষ্ট আদর করিলেন। সকলেই ছেলেটিকে কিছু মিষ্টান্ন খাওয়াইবার জন্য চেষ্টা করিল; কিন্তু সে কিছুতেই খাইল না; কেন না, তাহার তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। সে মিষ্টান্ন অতিথিশালায় পাঠাইয়া দিতে বলিল। ছেলেটি অতিথিশালায় যাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিল, ঠাকুরদেবতাদের নমস্কার করিল, পরে স্বপাক চড়াইয়া দিল, এবং নিজে খাইয়া স্বরূপদাদাকে প্রসাদ দিল।

৪

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়াই ছেলেটি স্বরূপকে ডাকিয়া তুলিল, গঙ্গাস্নান করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করিল, পরে স্বরূপদাদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বার্ষিক আদায়ের জন্য প্রথম কোথায় যাওয়া যায়?" স্বরূপদাদা বলিল, "বাগবাজারে আমাদের এক স্বজাতি আছেন, তাঁহারা যাওয়ামাত্রেই বার্ষিকের টাকাটি দিয়া

দেওয়ানজীর মেজাজ একটু কড়া, বিশেষ বার্ষিক দিবার সময় মেজাজ তাঁর আরও কড়া হইয়া যায়। এ কথা বাড়ীর কর্ত্তা বেশ জানেন। তাই তিনি সর্ব্বদা কান রাখেন—দেওয়ানজী কি করেন। উহারা দুই জন যখন গেটের বাহির হইয়া যায়, তখন কর্ত্তা তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং উহাদের সব খবর শুনিলেন, শুনিয়া ছেলেটিকে সঙ্গে করিয়া নিজে দেওয়ানখানায় আসিলেন ও বলিলেন,"দেওয়ানজী, এই দুধের ছেলেকে কেন তুমি মিছামিছি কষ্ট দিতেছ? দুইটা টাকা বই ত নয়, কেন মিছে ফিরাইতেছ? তুমি মনে করিতেছ, ও মিছা কথা কহিতেছে। এত অল্প বয়সে মিছা কথা কয় না, ওরা এখনও পাকে নাই।"

দেওয়ানজী কি করিবেন, অগত্যা একটি টাকা বাক্স হইতে বাহির করিয়া ছেলেটির হাতে দিলেন। কর্ত্তা তখন একটু সরিয়া গিয়াছেন। দেওয়ানজী তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন—"পাকে নাই, ঝিঁকুড় হইয়া গিয়াছে।"

অল্পক্ষণের মধ্যে দুই জায়গায় বার্ষিক আদায় হওয়ায়, তাহাদের দুই জনেরই একটু সাহস হইল। তাহারা শোভাবাজারে রাজবাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাড়ীর অনেক সরিক। অনেকেই বৃত্তি-বার্ষিক দিতে পারেন না, অনেকে আবার দেনও না। যাঁহারা দেন, তাঁহাদের কর্ত্তা মেজরাজা। রাজা নবকৃষ্ণের লেনে ঢুকিয়াই মাণিক দেখিল, উত্তরদিকে পাঁচিল, এক বাগান, ভিতরে একটা মস্ত বাড়ী, একটা গেট। দক্ষিণদিকে সারি সারি দোতলা ঘর, আর মেলা গলি। তাহারই একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া একটা অন্ধকার একতালা ঘরে দপ্তরখানায় উপস্থিত হইল। অনেকক্ষণ বসিয়া থাকার পর দেওয়ানজী মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও হে বাপু?"—"আজ্ঞে, আমার বাবার কিছু বার্ষিক আছে।" "কি নাম? কোন্ গ্রাম?" দেওয়ানজী ফর্দ্দ খুলিয়া দেখিলেন, নাম ও গ্রাম ঠিক; বলিলেন, "গতবৎসর সর্ব্বকিশোর শিরোমণি মহাশয় নিজে আসিয়া বার্ষিক লইয়া গিয়াছেন, তাঁহার সই আছে, তুমি যে বাপু তাঁহার পুত্র, তার প্রমাণ?" "আজ্ঞা, বাবার পুরাণ তল্পীদার সঙ্গে আসিয়াছে। একে আপনি আরও অনেকবার দেখিয়াছেন, এ বাবার সঙ্গে বরাবরই আসিত।"

দেওয়ানজী বলিলেন—"তা হ'বেও। কিন্তু বাবু, মেজরাজা না বলিলে আমি তোমাকে বার্ষিক দিতে পারিব না। তুমি পার ত তাঁহার কাছে যাও। তিনি এই উপরঘরে আছেন।" মাণিক উপরে উঠিয়াই প্রথমেই মেজরাজার নজরে পড়িল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে আসিতে বলিলেন। কিন্তু সে পরিষ্কার ফরাসের উপর ময়লা পা কেমন করিয়া দিবে—একটু চিন্তিত হইল। রাজা বুঝিলেন ও তাহাকে আবার ডাকিলেন। তখন সে ভরসা করিয়া গিয়া রাজার কাছে বসিল।

কাছে গিয়া দেখিল, রাজার পা দু'খানি সরু সরু, হাত দুখানিও সরু সরু, পেটটি খুব মোটা,

আর মুখখানি খুব বড়। রংটি তাঁর ময়লা বলিলেও হয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিলেও হয়। ছেলেটি কাছে আসিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিবাস?" সে বলিল—"সোনাচাঁদপুকুর।" রাজা "কে? নবকিশোর শিরোমণির পুত্র? তিনি আসেন নি?" ছেলে—"তাঁর স্বর্গলাভ হইয়াছে।" রাজা "আঁা, তাঁর বয়স আর কত হয়েছিল, বিয়াল্লিশের বেশী হবে না।" ছেলে "আজ্ঞা হাঁ, এই বিয়াল্লিশই হয়েছিল।" রাজা—"কবে মারা গেলেন?" ছেলে—"মহালয়ার সংক্রান্তির দিন।" রাজা "হা হা হা, তিনি বড় ভাললোক ছিলেন। আমার এখানে সর্বদাই পায়ের ধুলা দিতেন। এখন—" ছেলে "এখন আর কি? জন্মাষ্টমীর দিন কাঠাম পূজা হ'ত। এবার পূজা হবার কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া জন্মাষ্টমীর দিন মা কাঁদিতেছিলেন, তাই আমি কাঠামটা বার ক'রে ফেলেছি, এখন আপনাদের দ্বারে এসেছি।" রাজা—"অমন কথা ব'ল না বাবা। তোমাদেরই ঘর, তোমাদেরই দুয়ার, আসবে বই কি বাবা—তা বার্ষিক পেয়েছ?" ছেলে—"আজ্ঞা, দেওয়ানজী বলিলেন, 'আপনার হুকুম ভিন্ন তিনি আমার নাম পত্তন করিতে পারেন না।'"

এমন সময় এক জন ভদ্রলোক রাজার ঘরে আসিলেন। তাহার আকার প্রকার, পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়াই মনে হইল। তিনি আসিবামাত্রই রাজা বলিলেন—"তুমি আসিয়াছ, বেশ হইয়াছে। ঐ সব কাগজ কলম—দেওয়ানজীকে একটু হুকুম লিখিয়া দাও ত? লিখ—'মাণিকচন্দ্র দেবশর্মা তোমার নিকট যাইতেছেন, ইঁহার পিতা নবকিশোর শিরোমণি। যে বার্ষিক ছিল, ইঁহাকে দিয়া দাও',—তুমি এইটুকু লইয়া দেওয়ানজীর কাছে যাও, তিনি তোমাকে বার্ষিক দিয়া দিবেন। তুমি যেরূপে দুর্গোৎসব করিতেছ, শুনিয়া সুখী হইলাম।" পত্র দেখিয়াই দেওয়ানজী মাথায় ছোঁয়াইয়া ২২৷৵১০ বালকটির হাতে দিয়া বলিলেন, "একটি সই কর। আর তোমার সেজ রাজার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে না।"

উহারা ফিরিয়া হাটখোলায় আসিল। সে দিন বৈকালবেলা বৌবাজারে গিয়া দেখিল, যাহারা বার্ষিক দিত, তাহারা কেহই সেখানে নাই। বাড়ীটি ফিরিঙ্গিরা কিনিয়াছে। বাড়ী বিক্রয় হওয়ার পরে তারা যে কে কোথায় গিয়াছে—কেহই জানে না। জোড়াকুঁড়ে গিয়া শুনিল, বাবুদের জাল তালুকখানি অষ্টমে নীলাম হইয়া গিয়াছে। জগদ্ধাত্রীপূজার পর আসিলে কিছু না কিছু পাওয়া যেতে পারে। যোড়াসাঁকোতে যাহাদের বাড়ী স্বরূপদাদা লইয়া গেল, তাহাদের ঠাট সব ঠিক বজায় আছে, কিন্তু ভিতরে কিছু নাই। স্বরূপদাদা অনেক পীড়াপীড়ি করায় দেওয়ানজী পাঁচ টাকার মধ্যে তিনটি টাকা দিয়া দিলেন, বলিলেন, "আর টাকার আশা নাই। তবে রাসপূর্ণিমার সময় এস, যদি কিছু দিতে পারি।"

তাহারা হাটখোলায় ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত ব্যাপার কর্তাকে খুলিয়া বলিল। তিনি সর্বা

শিরোমণির যে বার্ষিক ছিল, তাহা ত দিয়াই দিলেন, উপরন্তু গিন্নীরাও পূজার জন্ত সাতযোড়া লালপাড় ধুতি দিলেন।

এত টাকা আর কাপড় লইয়া হাঁটিয়া যাওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় ভাবিয়া, উহারা দুই জনেই হাটখোলার ঘাটে এক গহনার নৌকায় উঠিল ও পলতার ঘাটে নামিয়া চন্দনপুকুর গেল।

৫

ছেলে যে বার্ষিক সাধিয়া আনিবে, মা ত সে ভরসা করেন নাই। সুতরাং সে যাহা আনিয়াছে, তাহাতেই তাঁহার মহা আনন্দ। সে যে এক পয়সা আনিতে পারিবে, তা ত তিনি ভাবেন নাই। সে ৩০৲।৪০৲ টাকা আনিয়াছে! তিনি মনে করিলেন—এই ত মা জগদম্বার প্রথম অনুগ্রহ।

ব্রতপক্ষের পূর্ণিমার দিন মাণিক ত গুরুর বাড়ী গিয়া মন্ত্র লইয়া আসিল। গুরুদেব তাহার প্রতি সদয় হইয়া আপন এক শিষ্যকে তাহার সহিত পাঠাইয়া দিয়াছেন, সে মাণিককে শুধু যে তান্ত্রিক সন্ধ্যা-বন্দনাদির উপদেশ দিবে, তাহা নহে, দুর্গোৎসব ও তান্ত্রিক পূজাগুলি কিরূপে করিতে হয়, তাহাও শিখাইয়া দিবে। এ ছেলেটিরও বয়স বেশী নয়, ১৮।১৯ হইবে, লেখাপড়ায় বড় আসক্তি নাই, তবে পূজাপাঠে খুব ভাল। দুইটি ছেলে যখন গুরুর বাড়ী হইতে বাড়ী আসিল, মা ভাবিলেন, যেন মণিকাঞ্চনযোগ হইল। দুই জনে সমস্ত দিন দুর্গাপূজার পদ্ধতি পড়ে। পূজাপদ্ধতি শিখে ও শিখায়। কখনও হরিশ পুথি ধরে, মাণিক পূজা করে; কখনও বা মাণিক পুথি ধরে, হরিশ পূজা করে। এই-রূপে তাহারা নবম্যাদি কল্প আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই পূজাপাঠ বেশ আয়ত্ত করিয়া লইল। দেশে আর লোক নাই, যাহাকে জিজ্ঞাসা করে। জিজ্ঞাসা করিতে গেলে, ৪।৫ ক্রোশ দূরে যাইতে হয়। তথাপি একবার গিয়া গুরুদেবের কাছে তাহারা দেখাইয়া আসিল, কিরূপ শিখিয়াছে। তিনিও বলিলেন, "বেশ শিখিয়াছ।"

আজ অপর পক্ষের নবমী। আজ বেলতলায় দেবীর বোধন। দেবতারা সকলেই 'শয়নে'র সময় নিদ্রা যান। দেবীও নিদ্রা যাইতেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্রের বড় দরকার হইল তাঁহাকে জাগান —নহিলে রাবণবধ হয় না। সেই অবধি অকালে দেবীর বোধন চলিয়া আসিতেছে। নবমী হইতে এই বোধন আরম্ভ হয়। পূজার সপ্তমীর দিন তিনি জাগিয়া উঠেন। আজ বোধন। হরিশ ও মাণিক পূজা শিখিয়া ফেলিয়াছে। দুর্গাপ্রতিমার মুখ লাগান হইয়াছে। আজ খড়ি দিবার দিন।

আজ শিরোমণি মহাশয়ের বাড়ীতে একটু মত্ততার ভাব আসিয়া গিয়াছে। প্রথম মত্ত মা, তার পর মত্ত ছেলে, তার পর হরিশ, তার পর কিশোর দাদা, তার পর স্বরূপদাদা, তার পর মত্ত শ্যাম কাকা। বোধ-নের বাজনা বাজিল। বাজনদারেরা চিরকাল চাকরাণ ভুঁই খায়, তাদের না বাজাইয়া রক্ষা নাই। এই এক মাসের সব ধ্যান-ধারণা, পূজা-পাঠ, উত্তম-উৎসাহ,—সব আজ সফল হইতে চলিল। আজ দেবীর

অপরিচিত বাপ

বোধন। তাঁহাকে তোষাইতে হইবে। জাগিয়া উঠিলেই তিনি সকলের আগে এখানে আসিবেন। কেন না, এত কাতরভাবে তাঁহাকে আর কেহ ডাকে নাই। নবমীর বোধন হইতেই রোজ একরূপ করিয়া চণ্ডীপাঠ হইত; হয় হরিশ, নয় মাণিক পাঠ করিত। তাহাদের উচ্চারণ সকল সময় শুদ্ধ হইত, তা নয়; কিন্তু উচ্চারণ শুদ্ধ করিয়া পড়া ত ছোট কথা। তাহারা যখন ভক্তিগদগদস্বরে পাঠ করিত, তখন লোকের মন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া যাইত।

ক্রমে দুর্গার গায়ে রঙ উঠিল, রঙ শুকাইল, চালচিত্রে ঘরবাড়ী, গাছপালা ক্রমে যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন মহাদেব সত্য সত্যই ষাঁড়ের উপর বসিয়া বিবাহ করিতে যাইতেছেন। ক্রমে ষষ্ঠীর দিন আসিয়া উপস্থিত। মায়ের মুখে গর্জ্জন-তেল মাখাইয়া দেওয়া হইল, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মুখেও দেওয়া হইল। সমস্ত প্রতিমা বেড়িয়া রাংতার সাজ দেওয়া হইল, প্রত্যেক সাজের মাথায় এক একটি পাখী বসাইয়া দেওয়া হইল। প্রতিমাকে কাপড় পরান হইল। মায়ের মাথায়, লক্ষ্মী-সরস্বতীর মাথায় মুকুট ঝক্‌ঝক্ করিতে লাগিল; হাতে পায় নানারূপ গহনা পরান হইল—কত অলঙ্কার দিতে হইবে, ভক্তই জানেন। যত দাও, যা দাও, সব সাজিয়া যাইবে; কিছু দিতে না পার, তথাপি সাজিবে ভাল। সমস্ত জগদ্ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বিভূতি, কি সামান্য রাঙের গহনা দিয়া তাঁহার শোভা বৃদ্ধি করিব? যে পুরাণো জিনিস ভালবাসে, সে মাকে পুরাণো গহনা দিয়া সাজায়, নবরত্ন দশ নর হার গলায় দেয়, আর সব নরের মাঝখান দিয়া একটা ধুক্‌ধুকি ঝুলাইয়া দেয়। যে নূতন ভালবাসে, সে ইয়ারিং দেয়, চেলী দেয়, চুড়ী দেয়। কেহ বা বাউটি খুটে সাজায়, কেহ বা বাউড়ি খুটে সাজায়। যে যতই সাজাক্, ভক্তিই প্রধান সাজ। যেখানে ভক্তি নাই, যত সাজেই সাজাও, ফাঁকা ফাঁকা দেখায়। বোধ হয়, সব আছে, কিন্তু কি যেন নাই। ভক্তি থাকিলে ঠিক দেখা যায়, কিছুই নাই, তবু যেন সবই আছে।

সকাল সন্ধ্যায় স্তব্ধ হইয়া বাড়ীর কয় জন লোক প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সেই দিকেই চাহিয়া থাকে, আর তাহাদের চক্ষু দিয়া দরদর ধারায় জল বহিতে থাকে। মায়ের এখন আর সে ভয় নাই। পাছে দুর্গাবিপত্তি হয়, সে ভয় নাই; পাছে লজ্জা পাই, সে ভয় নাই; পাছে অপরাধী হই, সে ভয় নাই। সকলেই এখন বীরের মত আপন আপন কার্য্যে ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন।

ক্রমে পঞ্চমীর পূর্ব্বেই গ্রামে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, নবকিশোর শিরোমণির ছেলে প্রতিমা আনিয়াছে, মা তাহাতে অধিষ্ঠান করিবেন। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে শিরোমণির বাড়ীর দিকে লোক সব ঝুঁকিয়া পড়িল। যাহার যে ভাল জিনিসটি ছিল, তাহারা সব আনিয়া পূজার জন্য যোগাইতে লাগিল। মা আজ রান্নায় শতহস্ত হইলেন। ছেলের শরীরে আজ দশহস্তীর বল। হরিশের সরস্বতী স্বয়ং অধিষ্ঠান করিলেন। ষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী অষ্টমী কেবল দীয়তাং ভুজ্যতাং চলিতে লাগিল। কেহ অভুক্ত রহিল না, ভোজনে কাহারও অতৃপ্তি হইল না। সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা অমৃত পরিবেশন করিতেছেন। সকলে আজ অমৃতভোজন করিতেছে।

অষ্টমী যায়, নবমী আসে; মহাসন্ধ্যায় মহাসন্ধিস্থল, মহাসন্ধির পূজা। আজ স… নৈবেদ্য বল, বস্ত্র বল, পানীয় বল, ভোগ বল, সব বৃহদ্ব্যাপার। আজ রাশি রাশি। আজ শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর, ঢাক, ঢোল, কাঁসি—সব উদ্দাম শব্দ তুলিয়াছে। হরিশ অ…

মাণিককে পুথি ধরিতেও বলে নাই। মাণিক হরিশের পিছনে দাঁড়াইয়া দুই হাতে দুই চামর ব্যজন করিতেছে, আর ধূপ-ধুনার ধুঁয়া মায়ের মুখের দিকে লাগাইয়া দিতেছে। গর্জ্জন-তেলের উপর গরম ধোঁয়া লাগিয়া শিশিরবিন্দু জমিতেছে, বোধ হইতেছে, মা সত্য সত্যই ঘামিতেছেন। পুঞ্জীকৃত ধূমরাশির মধ্যে মায়ের প্রতিমা যেন নড়িতেছে। আরতি শেষ হইল। হরিশ ঘণ্টা ফেলিয়া মাটীতে প্রণাম করিল। উপস্থিত সমস্ত লোক দণ্ডবৎ ভূতলে পড়িল। মা সকলের আগে উঠিলেন, দুর্গার মুখের কাছে হাত নিয়া বলিলেন, "এমনি ক'রে মা বছর বছর আসিস্।"

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

ঝরার-আনন্দ

আর তো আমায় ফুটিতে হবে না,
ঘুরিতে হবে না আর,
ঝ'রে গেছি আমি, পরিমল গেছে,
গিয়াছে সকল ভার।
যে আমায় হেন মুক্তি দিয়েছে,
ঝরায়ে দিয়েছে ভূমে,
শত জনমের প্রণাম আমার
তার পায়ে থাক্ জমে॥

শ্রীলীলা দেবী।

কণ্ঠীবদল

গোবর্দ্ধন দাসের মেয়ে তুলসী উনিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া যখন কণ্ঠীবদল দ্বারা নিজের ভারটা বিপত্নীক ছিদাম দাসের উপর অর্পণ করিয়াছিল, তখন সে জানিত না যে, ছিদাম দাস বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বছরখানেক পরেই নিজের তিন বছরের ছেলের ভার তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে ইহলোক হইতে পলায়ন করিবে। সুতরাং ছিদামের এই আকস্মিক প্রস্থানে তুলসী তাহার শোকে যতটা কাতর না হইল, তদপেক্ষা অধিক কাতর হইল তাহার প্রদত্ত ভারের গুরুত্ব অনুভব করিয়া। ছিদাম নাম গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইত; মৃত্যুকালে সে যে সাড়ে সাত টাকা রাখিয়া গেল, তাহা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেই খরচ হইয়া গেল। সুতরাং তাহার শ্রাদ্ধকার্য্য শেষ করিয়া, দুই চারখানা পিতল কাঁসার বাসন, একটা ভাঙ্গা টিনের বাক্স, একটা একতারা, আর গুপীকে লইয়া তুলসী বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল।

বাপের বাড়ীতেও কেহ ছিল না; শুধু বাপের ভিটার উপর একখানা জীর্ণ ঘর ছিল। তাহাও সংস্কারাভাবে পতনোন্মুখ। তুলসী তাহারই ভিতর মাথা গুঁজিয়া আশ্রয় লইল। কিন্তু দিন যে কিরূপে চলিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না।

বাপের জ্ঞাতি খুড়া লোচন দাস বলিলেন, "আবার কণ্ঠীবদলের চেষ্টা দেখ্ তুলসী!"

তুলসী বলিল, "ছেলেটার কি হবে?"

লোচন বলিলেন, "ছেলেটাকে বিলিয়ে দে।"

ম্লানমুখে তুলসী উত্তর করিল, "নেবে কে?"

লোচন বলিলেন, "কে আর নেবে? সোনাপুরের আখড়ায় দিয়ে আয়।"

তুলসী নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল। লোচন তাহার মনের ভাব অনুমান করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ভেবে আর কি কর্‌বি তুলসী, সকলই শ্রীহরির ইচ্ছা। আর পরের ছেলে বৈ তো নয়।"

তুলসী ছল-ছল-চোখে মৃদুস্বরে বলিল, "আচ্ছা, দেখি।"

লোচন বলিলেন, "বেশ, ভেবেই দেখ্। পুব পাড়ার পরাণে ছোঁড়া আমাকে ধরেছে। কিন্তু ছেলেটার ভার তো সে নিতে পারে না। আর পরের ছেলের ভার নেবেই বা কেন?"

তুলসী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। লোচন মস্তকসঞ্চালন করিয়া সহানুভূতির স্বরে বলিলেন, "প্রভুর ইচ্ছা কেউ খণ্ডন কর্‌তে পারে না তুলসী। আর অন্যমত করিস্ না। ছেলেটাকে নিজে রেখে আস্‌তে না পারিস্, আমাকে বলিস্, আমি গিয়ে রেখে আস্‌বো। গোবর্দ্ধনের মেয়ে তুই, তোর একটা উপায় আমাকে তো কর্‌তে হবে। পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তুই যে কষ্ট পাবি, সেটা কি আমি দেখ্‌তে পারি? হরি দীনবন্ধু!"

তুলসীকে ভাবিয়া দেখিবার অবসর দিয়া লোচন শ্রীহরির মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। তুলসী স্তব্ধভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল।

খানিক ভাবিয়া তুলসী ডাকিল, "গুপে!"

উঠানের এক পাশে কাদা, ভাঁড়, খোলা লইয়া গুপী খেলা করিতেছিল। তুলসীর আহ্বানে সে ফিরিয়া চাহিল। তুলসী ডাকিল, "এ দিকে আয়।"

গুপী খেলা ফেলিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া তুলসীর সম্মুখে দাঁড়াইল। তুলসী তাহার মুখের উপর রুক্ষ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গায়ে এত কাদা মেখেছিস্ কেন?"

আপনার কর্দ্দমরঞ্জিত দেহের উপর একবার দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া গুপী যেন শঙ্কিতকণ্ঠে উত্তর দিল, "কাদা।"

রুক্ষস্বরে তুলসী বলিল, "হাঁ কাদা, কাদা মেখে যে ভূত সেজেছিস্।"

গুপী দৃষ্টি নত করিয়া যেন ভয়ে স্বীয় কর্দ্দমাক্ত হস্ত দ্বারা অঙ্গের কাদা ধীরে ধীরে পরিষ্কার করিতে লাগিল। তুলসী বলিল, "সোনাপুরের আখড়ায় গিয়ে থাক্‌বি?"

গুপী আখড়া জিনিসটা কি, তাহা না বুঝিলেও সম্মতিসূচক মস্তকসঞ্চালন করিল। তুলসী বলিল, "তোকে একা থাক্‌তে হবে। আমি সেখানে যাব না।"

গুপী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আমি দাব না, টুসী মা।"

ছিদাম স্ত্রীকে তুলসী বলিয়া ডাকিত। তাহা শুনিয়া গুপী তাহাকে টুসী মা বলিত। তুলসী তাহার উত্তর শুনিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "যাবি না তো এখানে কি খাবি?"

গুপী উত্তর করিল, "হাব (খাব)।"

তুলসীর হাসি আসিল। তাহা চাপিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হাবি? আমার মাথা?"

গুপী মাথা নাড়িয়া ইহাতে আপনার সম্মতি জানাইল। তুলসী মুখখানাকে গম্ভীর করিয়া বলিল, "তা খাবি বৈ কি, তোর বাবা আমার মাথাটা একবার খেয়ে গিয়েছে, এবার তুই খাবি। আমার আর ভাবনা কি?"

ভাবনা-চিন্তার কথা গুপী বুঝিল না, সে শুধু টুসী মার মুখভাবে এবং স্বরে ক্রোধের লক্ষণ অনুভব করিয়া তুলসীর মুখের উপর সকাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে দৃষ্টিতে তুলসীর মুখের গাম্ভীর্যটা অপহৃত হইল, এবং তাহার স্থলে কাতরতার ছায়া ফুটিয়া উঠিল। সে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া নৈরাশ্যজড়িতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু কোনও উপায় নাই যে গুপী, তোকেই কি খাওয়াব, আমিই বা কি খাব? কে আমাদের খেতে দেবে?"

টুসী মার স্বরে কোমলতার আভাস পাইয়া গুপীর যেন সাহস হইল। সে ঈষৎ প্রফুল্লকণ্ঠে বলিল, "কেতে দেবে।"

তুলসী বলিল, "কে খেতে দেবে গুপী! ভগবান্ ছাড়া আমাদের দেবার যে আর কেউ নাই।"

ক্ষুদ্র মস্তক হেলাইয়া গুপী বলিল, "দেবে টুসী মা।"

বালকের এই অর্থহীন উক্তির মধ্যে তুলসী যেন বিশ্বাসের নির্ভরতা দেখিতে পাইল। সে উৎফুল্ল-

স্বরে বলিয়া উঠিল, "ঠিক বলেছিস্ গুপী, অসহায়ের সহায় ভগবান্। 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।' না গুপী, তোকে কোথাও যেতে দেব না। কেমন ?"

তুলসীর মুখে চোখে স্নেহের কোমলতা ফুটিয়া উঠিল। গুপী এবার আনন্দোৎফুল্লকণ্ঠে "টুসী মা !" বলিয়া তুলসীকে জড়াইয়া ধরিতে গেল। কিন্তু তাহার হাতের কাদা কাপড়ে লাগিবামাত্র তুলসী হঠাৎ যেন কঠিন হইয়া উঠিল, এবং তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বিরক্তির সহিত বলিল, "আঃ, ফরসা কাপড়খানায় কাদা লাগিয়ে দিলে। হতচ্ছাড়া ছেলে !" বলিয়া তুলসী তাহার মুখের উপর সরোষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেই গুপী ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল, তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখখানা মুহূর্তে কালী হইয়া গেল। তুলসী কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "দেখ্ দেখি, কাপড়খানা ময়লা ক'রে দিলি ?"

ভীতিরুদ্ধস্বরে গুপী বলিল, "আ দেব না টুসী মা।"

তাহার চোখ দুইটা সজল হইয়া আসিল। তুলসী কঠোরস্বরে বলিল, "দিবি না ?"

"না টুসী মা, না।" বলিয়াই গুপী কাঁদিয়া উঠিল। তুলসী তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে টানিয়া আনিল, এবং তাহাকে সবলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া তাহাকে চুম্বন করিতে লাগিল।

মাসখানেকের মধ্যে এক এক করিয়া যখন অনেকগুলি তৈজস বাঁধা পড়িল, তখন তুলসী ভবিষ্যতের চিন্তায় একটু অধীর হইয়া পড়িল। একটা উপায় না করিলে এমন করিয়া থালা, ঘটী বেচিয়া যে বেশী দিন চলিবে না, ইহা বুঝিতে পারিল বটে, কিন্তু সেই উপায়টা যে কি, তাহাই স্থির করিতে পারিল না। পুনরায় কণ্ঠীবদলে তেমন ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পেটের দায়ে তাহাতে মত দিতে হইল। তবে মত দিলেও দায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইল না। তাহার ভার অনেকেই লইতে প্রস্তুত, কিন্তু ছেলেটার ভার লইতে কেহই রাজি নহে। অথচ ছেলেটাকেও ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। আখড়ায় মা-বাপ-মরা ছেলেকে মানুষ করা হয় বটে, কিন্তু সেখানে যে অযত্নে অনাদরে ছেলেকে মানুষ হইতে হয়, তাহা জানিতে তুলসীর বাকী ছিল না, সুতরাং লোচন দাদার অনুরোধ ও উপদেশ সত্ত্বেও গুপীকে সেখানে রাখিতে তাহার প্রাণটা কেমন করিতে লাগিল।

এ দিকে পরাণ বৈরাগী আশা পাইয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে তাড়া দিতে লাগিল। তাহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ না করিলেও তুলসী কিন্তু পাকা কথা দিতে পারিল না। ছেলেটার একটা উপায় না করিয়া কিরূপে নিজের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করে ?

পরাণ কিন্তু সংশয়ে থাকিতে চায় না। সে একদিন আসিয়া তুলসীকে পাকা কথা দিবার জন্য জেদ করিতে লাগিল। তুলসী পাকা কথা দিতে পারিল না ; বলিল, "আর দিন কতক থাক্ না বৈরাগী।"

এই আশ্বাসে তৃপ্ত না হইয়া পরাণ বলিল, "দিন আমার পক্ষে যুগ হয়ে পড়েছে যে।"

তাহার মুখের উপর সহসা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত তুলসী বলিল, "ভয় নাই বৈরাগী, আমি তোমাকে মিছে আশা দিচ্ছি না।"

পরাণ বলিল, "যখন মিছে আশা দিচ্ছ না, তখন মিছে আজকাল ক'রে লাভ কি?"

তুল। লাভ কিছুই নাই।

পরা। লাভ যখন কিছুই নাই, তখন আর আমি দেরী কত্তে পারি না।

তুল। দেরী কর্‌তে আমিও বলি না। তবে—

পরা। তবে আর কি কর্‌তে হবে বল।

তুল। বলেছি তো, ছেলেটার ভার নাও।

পরাণ মাথা নীচু করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "আমিও তো বলেছি তুলসী, পরের ছেলের ভার নেবার ক্ষমতা আমার নাই।"

তুলসী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, "কিন্তু মনে কর, যদি আমার নিজেরই একটা ছেলে থাক্‌তো?"

মস্তক আন্দোলন করিতে করিতে পরাণ বলিল, "সে আলাদা কথা। কিন্তু মাথায় মোট ক'রে আমি ছিদেম দাসের ছেলেকে খাওয়াতে পার্‌বো না।"

ঈষৎ রাগতভাবে তুলসী বলিল, "না পার, না পার্‌বে। আমি সে জন্য তোমার পায়ে ধর্‌তে যাচ্ছি না।"

ম্লান-মুখে পরাণ বলিল, "রাগ ক'রো না তুলসী, আমার অবস্থা তো জান।"

তুলসী বলিল, "একটা তিন বছরের ছেলেকে খেতে দেবার সঙ্গতি যার নাই, তার আবার কণ্ঠীবদলের সাধ কেন?"

তাহার ক্রোধরঞ্জিত মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া পরাণ দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত বলিল, "বামনেরও চাঁদ ধর্‌তে সাধ হয় তুলসী।"

তুলসী মুখ ফিরাইয়া নীরব রহিল। পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বিষাদগম্ভীরস্বরে বলিল, "তা হ'লে এই কথাই ঠিক?"

"কোন্ কথা?"

"ছেলেটার ভার না নিলে—"

কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই পরাণ উৎসুকদৃষ্টিতে তুলসীর মুখের দিকে চাহিল। তুলসী কোনও উত্তর দিল না। পরাণ আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

গুপী আসিয়া বলিল, "কি হবে টুসী মা?"

"আমার মাথা।" বলিয়া তুলসী দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘরের ভিতর ঢুকিল।

সে দিন ঘরে চাল ছিল না, পয়সাও নাই। তুলসী ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিল। তার পর একটা বড় ঘটী লইয়া বেণে-বোয়ের নিকট উপস্থিত হইল। বেণে-বৌ এক জন ক্ষুদ্র মহাজন। ঘটী-বাটি বা সোনা রূপার ছোটখাট জিনিস রাখিয়া অল্পস্বল্প টাকা দিতে পারিত। তুলসী ঘটীটা রাখিয়া আট আনা

চাহিলে বেনে-বৌ ঘটীটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া তাহার ওজন অনুমানে স্থির করিয়া লইয়া বলিল, "আট আনা দিতে পারি না বাছা, পেতল-কাঁসার আজকাল কি দর আছে? বড় জোর চার আনা দিতে পারি।"

তুলসী বলিল, "কিন্তু চার আনা দিলে চলবে না তো মাসী, চার আনার চালই কিনতে হবে। তার পর তেল-নুন আছে।"

মাসী যেন বিরক্তির সহিত বলিল, "তোমার চলবে কি না, তা দেখবার দরকার তো আমার নাই। আর তোমার যদি ছাড়াবার আশা থাক্‌তো, তা হলেও না হয় আর দু'গণ্ডা পয়সা দিতে পারতাম। কিন্তু তুমি তো আর নিতে পারবে না, কাঁসারী ডেকে আমাকে এম্নিব আধামূলে ধ'রে দিতে হবে।"

তুলসী মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল। বেনে বৌ বলিল, "তুমি যখন ধরেছ তখন আর চারটে পয়সা ধ'রে দিচ্ছি। কিন্তু বাছা, আর এ সব পেতল কাঁসা আমার কাছে এনো না, তা ব'লে রাখ্‌ছি। সোনারূপা থাকে তো এস।"

তুলসীর ইচ্ছা হইল, মাসীর হাত হইতে ঘটীটা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া যায়। শুধু নিজের জন্য হইলে বোধ হয় তাহাই করিত। কিন্তু ছেলেটা আছে যে। গ্রামে আর এমন মহাজন নাই যে, ঘটী বাটী রাখিয়া পয়সা দেয়। অগত্যা বেনে বৌয়ের কথাগুলা নিঃশব্দে মাথা পাতিয়া লইতে হইল, এবং আড়াই টাকা দামের ঘটীটা রাখিয়া পাঁচ আনা পয়সা লইয়া তুলসী বাড়ী চলিল।

রাস্তায় যাইতে যাইতে অপমানসূচক কথাগুলাকে মনে মনে আন্দোলন করিয়া তুলসী হঠাৎ একটা দৃঢ় সংকল্পে মন বাঁধিল, এবং ঘরে না গিয়া লোচন দাসের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, "গুপীকে কাল আখড়ায় রেখে আসবে দাদামশায়?"

লোচন আপনার ক্ষীণ দৃষ্টিটাকে যতটা পারিলেন, সতেজ করিয়া লইয়া তুলসীর মুখের উপর স্থাপন করিলেন, কিন্তু সেখানে সংকল্পের দৃঢ়তা ছাড়া ইতস্ততঃ-ভাবের কোনও লক্ষণই দেখিতে পাইলেন না। বৃদ্ধ তখন দন্তহীন মুখে মৃদু হাসির লহর তুলিয়া হর্ষপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "স্বচ্ছন্দে রেখে আসবো। তুই কি আমার পর তুলসী? তোকে তো আমি আগেই বলেছিলাম। যাক্‌, শ্রীহরির ইচ্ছায় যখন তোর মতিগতি ফিরেছে, তখন—কাল একটু কাজ ছিল, তা "

বাধা দিয়া তুলসী বলিল, "থাক্‌ কাজ, কালই রেখে আসতে হবে।"

লোচন বলিলেন, "আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। সকালে স্নান-আহ্নিক সেরে—বেশী দূর তো নয়, রেখে এসে খাওয়া দাওয়া করবো।"

তুলসী আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

৩

সে দিন তুলসী অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঘুমাইতে পারিল না। প্রায় দেড় বৎসর কাল ছেলেটা তাহার কাছে আছে, কিন্তু কাল আর সে থাকিবে না। কাল হইতে তুলসী স্বাধীন। এই ছেলেটা বয়সে ছোট হইলেও

তাহাকে যে একটা অধীনতার পাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কাল হইতে সে বন্ধন আর থাকিবে না, সে যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারিবে। গুপী যে কেবল তাহার কষ্টাবদলের পথেই প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা নহে; ইহার জন্য ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাহাকে অনেক কাজ করিতে হইত। ঘরে চাল নাই; তুলসী ভাবিল, দূর হউক, আর কাহারও দরজায় ধার করিতে যাইব না, কোনরূপে দিন কাটিয়া যাইবে। কিন্তু গুপী তাহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তাকে শিথিল করিয়া দিত। সে আসিয়া ম্লানমুখে ক্ষুধার তাড়না জানাইলে তুলসী আর স্থির থাকিতে পারিত না, আধসের চাউলের জন্য তাহাকে পরের দ্বারে গিয়া হীনতা স্বীকার করিতে হইত। হতভাগা ছেলে মাকে খাইয়াছে, বাপকে খাইয়াছে, তথাপি তাহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই, সকালে বিছানা হইতে উঠিয়াই বলিত, "কি হাব (খাব) টুগী মা ?" অগত্যা তুলসীকে তাহার সকালের খাবার যোগাড় করিয়া রাখিতে হইত। না রাখিলে তাহার ক্রন্দনের জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িতে হইত। এই ছেলেটাই তো যত আপদ্। দূর হউক, কাল ইহাকে বিদায় করিতে পারিলে আর কোনও ঝঞ্ঝাট থাকিবে না। তখন তুলসী কষ্টাবদল করুক বা না করুক, কোনরূপে আপনার পেটটা চালাইতে পারিবে। না পারে, উপবাস দিয়া মরিলেও তো কোনও ক্ষতি নাই।

পাশে শুইয়া গুপী অকাতরে ঘুমাইতেছিল; হঠাৎ সে বোধ হয় স্বপ্ন দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তুলসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, এবং তাহার গায়ে আস্তে আস্তে হাত চাপড়াইয়া পুনরায় ঘুম পাড়াইল। ইহাও কি কম যন্ত্রণা! রাত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইবারও যো নাই। সেবার সর্দিজ্বরে তিনদিন কি ভোগটাই না ভুগিতে হইয়াছিল! তিন রাত চোখে-পাতায় হয় নাই। কাল হইতে তুলসী নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু কাল যদি ছেলেটা স্বপ্ন দেখিয়া এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠে, কে তাহাকে ভুলাইয়া ঘুম পাড়াইবে ? ঘুম ভাঙ্গিলে যখন বিছানা হাতড়াইবে, টুগী মা, টুগী মা বলিয়া কাঁদিতে থাকিবে, তখন ?—তুলসী তাড়াতাড়ি আলোটা নিবাইয়া দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া পড়িল।

সকালে উঠিয়া তুলসী তাড়াতাড়ি রান্না চাপাইয়া দিল। এক মুঠা না খাওয়াইয়া কি পাঠান যায় ? গুপী ডাল মাখিয়া ভাত খাইতে ভালবাসিত, কিন্তু সব দিন ডাল জুটিত না। আজ তুলসী এক পয়সার মসুর ডাল আনিয়া চড়াইয়া দিল। গুপী উনানের পাশে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দা (ডাল) কি অবে (হবে) টুগী মা ?"

তুলসী বলিল,"তুই খাবি।"

"আমি হাব ?"

"হাঁ।"

"আমি দা হাব, আমি দা হাব"। বলিয়া গুপী আনন্দে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল। তুলসী তাহার দিকে রোষপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বলিল, "হতভাগা ছেলে। যেন কক্ষনো খেতে পায় না।"

গুপীর আনন্দোৎফুল্ল মুখখানি ম্লান হইয়া গেল।

তুলসী উঠানের এক পাশে কয়েকটা বেগুন গাছ পুঁতিয়াছিল; তাহাদের একটা গাছে একটিমাত্র বেগুন হইয়াছিল। তুলসী সেটিকে তুলিয়া ভাজিয়া দিল। এক পয়সার মাছ কিনিবার জন্য অনেক চেষ্টা

কলঙ্ক-ভঞ্জন
চিত্রকর শ্রীযুক্ত রামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে
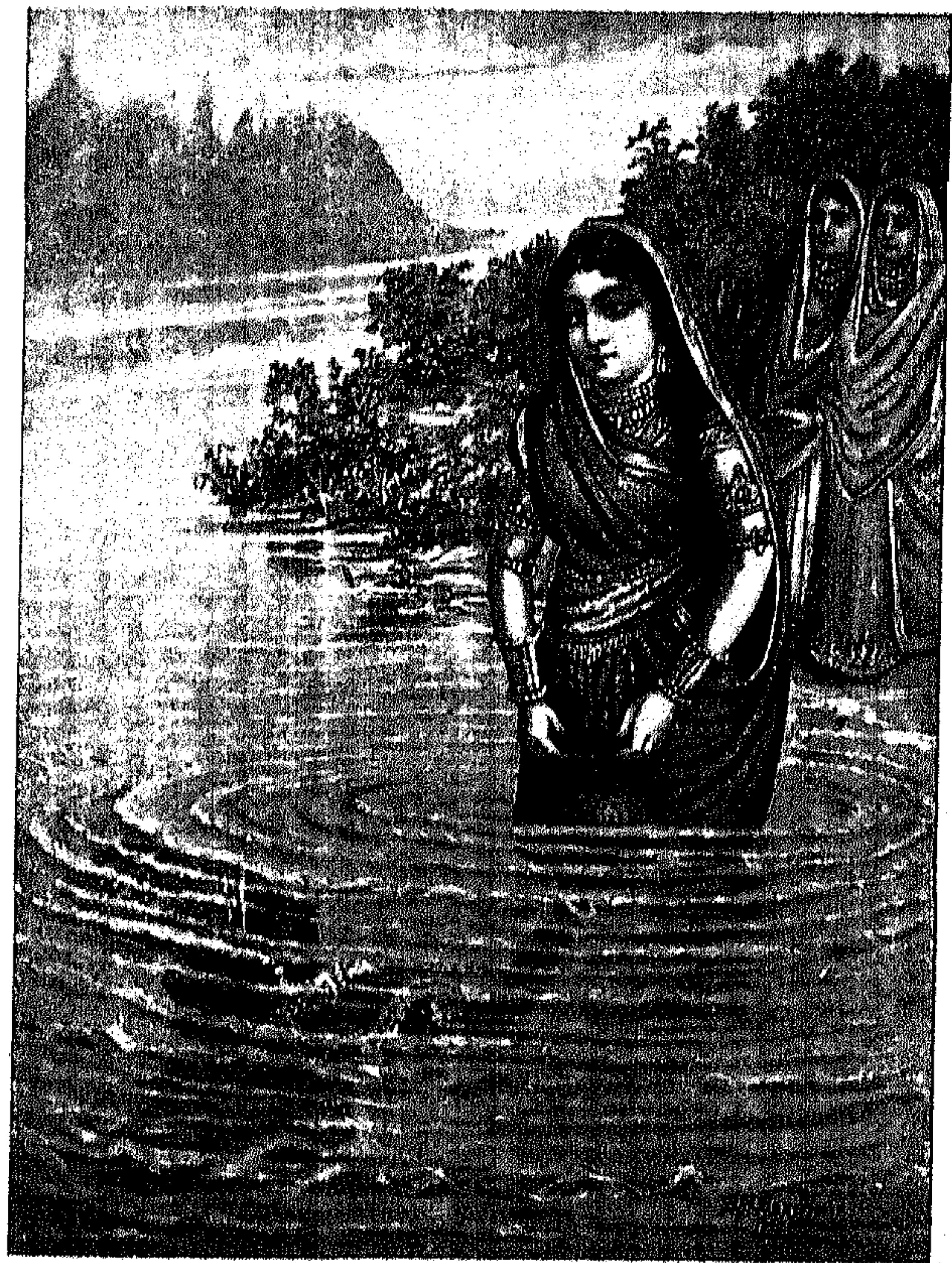
করিল, কিন্তু মাছ কোথাও পাইল না। মেজো গোয়ালিনী দুধ লইয়া যাইতেছিল, তাহার নিকট হইতে দুই পয়সার দুধ কিনিয়া লইল।

রন্ধন শেষ হইল। তুলসী গুপীকে তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিল; তাহার মাথা আঁচড়াইয়া কপালে খয়েরের টিপ, নাকে একটি তিলক পরাইয়া দিল। তার পর তাহাকে খাওয়াইতে বসিল। ইদানীং গুপী নিজের হাতেই খাইত, আজ তুলসী তাহাকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইয়া দিতে লাগিল। তাহার মুখে ভাত তুলিয়া দিতে দিতে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "ডাল কেমন হয়েছে রে গুপী?"

মাথা নাড়িয়া গুপী উত্তর করিল, "বদ (বড্ড) মিত্তি (মিষ্টি) টুসী মা।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তুলসী বলিল, "হ্যাঁ দেখ্ গুপী, ও বাড়ীর দাদামশাই আজ ঠাকুর দেখ্তে যাবে, তুই যাবি?"

গুপী বলিল, "দাব (যাব), টুমি দাবে?"

তুলসী বলিল, "আমি কোথায় যাব রে? আমাকে কি সেখানে যেতে আছে? তুই দাদামশায়ের সঙ্গে যাবি।"

গুপী বলিল, "দাদামত্তাইর গদে (সঙ্গে) দাব?"

তুলসী বলিল, "হাঁ, কাপড় প'রে দাদামশায়ের সঙ্গে যাবি।"

আহ্লাদে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গুপী বলিল, "ওহো, পাপড় (কাপড়) প'দে (প'রে) তাকু (ঠাকুর) দাব।"

হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া তুলসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "টুমি কাদবে (কাঁদবে) না টুসী মা?"

তুলসীর চোখ দুটো সজল হইয়া আসিল; সে ধরা-গলায় উত্তর করিল, "না। তুই এখন খেয়ে নে।"

লোচন আসিয়া ডাকিলেন, "কৈ তুলসী, হয়েছে? বেলাও অনেকটা হয়ে গেল।"

ব্যস্তভাবে তুলসী বলিল, "এই যে হ'য়েছে। তা আজ যদি বেলা—"

লোচন বলিলেন, "তা হোক্, কা'ল আবার কাজ আছে।"

গুপীকে খাওয়াইয়া ধোয়াইয়া তুলসী তাহাকে একখানি কাপড় পরাইয়া দিল। তাহার খেলার ঝাঁজ, মাটীর পুতুল সব একখানা নেকড়ায় বাঁধিল। লোচন তাড়া দিয়া বলিলেন, "আর দেরী করিস্ নে তুলসী।"

তুলসী তাড়াতাড়ি দুধটুকু গরম করিয়া গুপীকে খাওয়াইয়া দিল। তার পর তাহার কপালে একটি গোবরের টিপ্ দিয়া তাহাকে কোলে লইয়া মাথার চুলগুলা পরিষ্কার করিয়া দিতে দিতে বলিল, "কাঁদিস্ নে গুপী, লক্ষ্মী ছেলে!"

ঘাড় দোলাইয়া গুপী বলিল, "না টুসী মা, কাঁদব না। তাকু দেকে আবব (আসব)।"

তুলসী তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া দিল। লোচন তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিয়া শ্রীহরি স্মরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইলেন। গুপী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "টুমি কাদবে না টুসী মা?"

তুলসী কোনও উত্তর দিল না। সে কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গুপী দুই পদ অগ্রসর হইয়া আবার পিছনে ফিরিয়া ডাকিল, "টুসী মা!"

লোচন তাহাকে ধমক দিয়া হাত চাপিয়া বলিলেন, "আয়, আয়।"

আবার কয়েকপদ গিয়া গুপী দাঁড়াইয়া পড়িল; ডাকিল, "টুসী মা!"

তুলসী মুখটা পিছনদিকে ফিরাইয়া লইল। লোচন গুপীর হাত টানিয়া অগ্রসর হইল। গুপী আর একবার উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, "টুসী মা!"

লোচন তাহাকে জোরে একটা ধমক দিলেন।

হঠাৎ তুলসী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে গুপীকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না গো না; আমি যেতে দেব না।"

গুপী অবাক্ হইয়া তুলসীর মুখের দিকে চাহিল। লোচন গম্ভীরস্বরে ডাকিলেন, "তুলসী!"

তুলসী কাঁদিয়া বলিল, "তোমার পায়ে পড়ি দাদামশায়, ও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।"

ঠাকুর দেখার সঙ্গে এই কান্নার কি সম্পর্ক, তাহা না বুঝিলেও, তুলসীকে কাঁদিতে দেখিয়া গুপীর চোখ দুইটা ছল-ছল করিতে লাগিল। সে দুই হাতে তুলসীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পজড়িতকণ্ঠে বলিল, "আমি যাব না টুসী মা, আমি যাব না।"

তুলসী তাহাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া ছুটিয়া পলাইল, এবং ঘরে ঢুকিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বাহিরে থাকিলে পাছে কেহ জোর করিয়া গুপীকে লইয়া যায়।

তুলসীর কাণ্ড দেখিয়া লোচন কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন; তার পর তুলসী হইতে তাহার পিতা গোবর্দ্ধন দাস পর্য্যন্ত সকলের দুষ্প্রবৃত্তি কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

৪

লোচন দাসের প্রমুখাৎ তুলসীর সংকল্প অবগত হইয়া পরাণ সকালেই তুলসীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু কার্য্যবশতঃ গ্রামান্তরে যাইবার প্রয়োজন থাকায় দিনমানে সাক্ষাৎ করিতে পারিল না; সন্ধ্যার পরই তুলসীর সহিত দেখা করিতে আসিল। উঠানে আসিয়া ডাকিল, "তুলসী!"

তুলসী অন্ধকারে দাবার উপর বসিয়া, অতঃপর কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল। ডাক শুনিয়া সচকিতে উত্তর দিল, "কে গা?"

পরাণ বলিল, "চিন্‌তে পারো না? আমি পরাণ।"

ঈষৎ কর্কশ-কণ্ঠে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

পরাণ দাবার উপর উঠিয়া হাস্যতরলকণ্ঠে বলিল, "মালসা ভোগটা কবে হবে, তাই জান্‌তে এলাম।"

তুলসী বলিল, "এটা তো ছাদবাড়ী নয় বৈরাগীঠাকুর, এখানে কিসের মালসা ভোগ খাবে?"

পরাণ বলিল, "শত্রুর ছাদবাড়ী হোক, এখানে যে মোচ্ছবের মালসা ভোগ হবে।"

বলিয়া পরাণ একটু হাসিল। তুলসী উঠিয়া নীরবে একখানা আসন তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিল। পরাণ আসনখানা পাতিয়া তাহাতে বসিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আজ তোমার মনটা ভাল নাই, না তুলসী?"

তুলসী কোনও উত্তর দিল না। পরাণ গম্ভীরভাবে বলিল, "তা হতেই পারে, মানুষ কিনা তো। তবে কি জান, সংসারে কেউ কারো নয়, এই যে দেহ, এটাও আপন নয়।" বলিয়া পরাণ গুণ্-গুণ্ করিয়া গান ধরিল—

"এই যে কলেবর জেনো পরের ঘর,
ভাড়া দিয়ে আছ ভাড়াটিয়া ঘরে।"

এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে খুকী ডাকিল, "তুমী মা !"

অন্ধকারে ভূতের আনুনাসিক স্বর শুনিয়া মানুষ যেমন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে, পরাণ তেমনই চমকিয়া উঠিল। তুলসী দরজার কাছে গিয়া ঘরের ভিতর মুখ বাড়াইয়া বলিল, "ভয় কি ? এই যে আমি। ঘুমোও।" পরাণ কিয়ৎক্ষণ হতভম্বের ন্যায় বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ না মেয়েটিকে আখড়ায় রেখে আসবার কথা ছিল ?"

তুলসী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হুঁ।"

পরাণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তা আজ বুঝি নিয়ে যাবার সুবিধা হ'লো না ?"

তুলসী উত্তর করিল, "হুঁ।"

একটু ভাবিয়া পরাণ বলিল, "আজ না হ'লো, আর একদিন রেখে এলেই চল্‌বে। লোচন খুড়োর সুবিধা না হয়, আমি এক দৌড়ে যাব, তার আর কি। তোমার যদি উপকার হয়, বুঝ্‌লে কি না, আমি না হয় একটু বেগারই দিলাম। আর তোমার বেগারের তরেই তো—বুঝ্‌লে কি না।"

পরাণ হিহি করিয়া হাসিয়া উঠিল; কিন্তু তাহার এই পরিহাসে তুলসীর মুখটা যে ভ্রূকুটী-ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, অন্ধকার প্রযুক্ত পরাণ তাহা দেখিতে পাইল না। সে হাসি থামাইয়া গুন্‌গুন্‌ করিয়া গাহিল—

"তোমারি তরে আমি দলের বাধা বই,
আর কিছু জানিনে রাই, আমি তোমা বই।"

তুলসী বলিল, "আমার একটু উপকার কর্‌তে পার বৈরাগি ?"

পরাণ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "খুব পারি, কি কর্‌তে হবে বল।"

তুলসী বলিল, "আমাকে গোটাকতক গান শিখিয়ে দিতে পার ?"

বিস্ময়ের সহিত পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "গান ? গান শিখে কি হবে ?"

তুলসী বলিল, "গান গেয়ে ভিক্ষা কর্‌লে বেশ ভিক্ষা পাওয়া যায়।"

অন্ধকারে আপনার বিস্ফারিত দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণভাবে তুলসীর মুখের দিকে নিক্ষেপ করিয়া পরাণ বলিল, "তুমি গান গেয়ে ভিক্ষা কর্‌বে তুলসী ?"

"বোষ্টমের মেয়ে, দোষ কি ?"

"দরকারই বা কি ?"

"পেট চলে না।"

"সে ভার তো আমার।"

"সে যখন তুমি ভার নেবে। তার আগে তো পেট চুপ ক'রে থাক্‌বে না ?"

"সে আর ক'দিন ? বল তো আমিই—"

"এমন অন্যায় কথা আমি বল্‌তে চাই না। তার চেয়ে তুমি আমাকে দু'টো গান শিখিয়ে দাও। বেশ ভাল দেহতত্ত্বের গান।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া পরাণ বলিল, "কিন্তু তুমি ভিক্ষা করতে পারবে ?"

তুলসী বলিল, "পারবো না কেন ? এই যে কত বোষ্টমের মেয়ে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়।"

সহাস্যে পরাণ বলিল, "তাদের কথা ছেড়ে দাও। তার চেয়ে যে ক'দিন না কষ্টীবদল হয়, সে কয় দিন আমিই—"

বাধা দিয়া তুলসী বলিল, "তুমি ক'দিন দেবে ? যদি ছ' মাস না হয় ?"

"আমি ছ' মাস যোগাব।"

"ছ' মাস ?'

"দেব।"

"এক বছর ?"

"একটা বছর আর কি বেশী দিন!"

"কিন্তু লোকে কি বলবে ?"

"একটা কথা ঠিক হয়ে থাকলে কেউ কিছু বলবে না।"

একটু ভাবিয়া তুলসী বলিল, "আমিই বা শুধু শুধু তোমার দান নিতে যাব কেন ?"

পরাণ বলিল, "শুধু কেন, ছ'দিন পরে তো তুমি সুদে আসলে সব ফিরিয়ে দেবে।"

ঈষৎ রুক্ষস্বরে তুলসী বলিল, "সে পরের কথা ছেড়ে দাও। ছ' মাস পরে যদি আমি ম'রে যাই, তোমার কাছে তো ঋণী হ'য়ে থাকব ?"

এ কথার উত্তর পরাণ দিতে পারিল না। তুলসী বলিল, "এখন তুমি আমাকে গান শেখাবে কি না বল।"

"আচ্ছা, কাল এসে শেখাব" বলিয়া পরাণ একটু বিমর্যভাবে উঠিয়া গেল। তুলসী সেই অন্ধকার দাবার উপর একা বসিয়া রহিল। ঘরের সামনে তেঁতুলগাছটা ঠিক একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত দাঁড়াইয়াছিল, তাহার মাথার উপর জোনাকীগুলা তাহার অনন্ত চক্ষুর মতই দেখাইতেছিল। বাতাসে ডালগুলা সন্‌-সন্‌ শব্দ করিতেছিল। তুলসীতলার প্রদীপটা তখন নিবিয়া গিয়াছিল। আকাশে নক্ষত্র জ্বলিতেছিল। হঠাৎ একটা নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। তুলসী সাত ভূতের, সাত পুকুরের নাম মনে মনে বলিতে লাগিল। ঘরের পিছনে বাঁশঝাড়ের ভিতর শৃগাল চীৎকার করিয়া উঠিল; তুলসী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিল।

৫

তুলসীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া পরাণ যখন লোচনের নিকট উপস্থিত হইল, লোচন তখন সবেমাত্র নাম-জপ শেষ করিয়া হুঁকা-কলিকা লইয়া বসিয়াছেন। পরাণের মুখে সকল কথা শুনিয়া তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কি জান পরাণ, 'রমণীর পাপ মন কাচের বাসন।' ওরা জগতে অতি জঘন্য জীব। এই জন্যই শাস্ত্রে ওদের এত নিন্দা ক'রে গেছে। আমি তো ওদের আন্তরিক ঘৃণা করি।"

কিন্তু তিনি ঘৃণা করিলেও পরাণ কিছুতেই তুলসীকে ঘৃণা করিতে পারিল না; বরং এই পাপমনা জঘন্য জীবটিকে পাইবার জন্য সে যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন লোচন তাহাকে আশ্বাস

দিয়া বলিলেন, "তুমি উতলা হয়ো না ; শ্রীহরির ইচ্ছায় কি না হয় ? তাঁর ইচ্ছায় পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে, আর একটা মেয়েমানুষ বশে আসবে না ?"

তিনি পুনরায় চেষ্টা করিতে প্রতিশ্রুত হইলে পরাণ আশ্বস্ত হইয়া বিদায় লইল।

লোচনের এই চেষ্টার মধ্যে শুধু যে পরাণেরই স্বার্থ ছিল,তাহা নহে ; তাঁহার নিজেরও একটু স্বার্থ ছিল। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের কণ্ঠীবদলের বৈষ্ণবী ব্যতীত চতুর্থ পক্ষের একটি সেবাদাসী ছিল। কিন্তু তৃতীয় পক্ষের ভয়ে সেটিকে ঘরে আনিতে সাহস করেন নাই, সোনাপুরের আখড়াতেই রাখিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবৃত্তির বশীভূত অসংখ্য বৈষ্ণবমণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষতঃ আখড়ার অধিকারী চরণদাস বাবাজীর সান্নিধ্যে এই যৌবনসম্পন্না সেবাদাসীটিকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছিলেন না, তাহার জন্য একটি স্বতন্ত্র নিভৃত স্থানের অন্বেষণ করিতেছিলেন। শ্রীহরির কৃপায় স্থান মিলিল। গোবর্দ্ধনের প'ড়ো ঘরটা তাহার বাসের জন্য মনোনীত হইল। ঘরটা একটু আধটু মেরামত করাইয়া লইলেই চলিবে, আর চারিপাশে প্রাচীরের পরিবর্ত্তে কাঁটাগাছের বেড়া দিলেই কায়দামত হইবে।

সব স্থির, এমন সময় অভাগী তুলসী ছিদাম দাসের ছেলেটাকে লইয়া উপস্থিত হইল। লোচন বড়ই বিরক্ত এবং চিন্তিত হইলেন। এই চিন্তার ফলে পরাণ তুলসীর সহিত কণ্ঠীবদল করিতে আত্মহারা হইল, এবং সে ঘটকবিদায়-স্বরূপ ঘরখানার মেরামতের খরচ দিবার ভার গ্রহণ করিল।

লোচন ভাবিলেন, ঈশ্বর যা করেন,মঙ্গলের জন্য। কণ্ঠীবদল হইলেই তুলসী পরাণের ঘরে চলিয়া যাইবে ; তিনি তখন অবাধে সেবাদাসীকে আনিয়া এই ঘরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন। ইহার উপর গৃহ-সংস্কারের খরচটাও লাগিবে না। প্রভুর কৃপাস্মরণে লোচনের চক্ষু ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু একটা পরের ছেলে লইয়া তুলসী যে এত গোল বাধাইবে, ইহা তিনি ভাবেন নাই। হায়, মানুষের কি পাপ মন ! একটা পরের ছেলের জন্য এত অনর্থপাত ! লোচন ব্যথিত হৃদয়ে তুলসীর বিরুদ্ধে শ্রীহরির নিকট অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

একবার ভাবিলেন, নিজেই না হয় ছেলেটার ভার লইবেন। দুই:বৎসর পরে সে ত গরু-বাছুরটাও দেখিতে পারিবে। কিন্তু বৈষ্ণবী নিজের দুই তিনটি ছেলে-মেয়ে লইয়া এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহার উপর একটা পরের ছেলের ভার লইয়া স্বামীর ভবিষ্যৎ সুবিধার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইল না। তখন লোচন পরাণকে অনেক বুঝাইলেন, এইটুকু ছেলে, একটা প্রবল জ্বর, একটা ভড়্কা আসিয়া অনায়াসেই ইহার ভার হাল্‌কা করিয়া দিতে পারে। পরাণ কিন্তু কিছুতেই বুঝিল না ; কবে ছিদাম দাস পাঁচ জনের সাক্ষাতে তাহার মাতার কুৎসা কীর্ত্তন করিয়াছিল, সেই রাগে সে ছিদামের ছেলেকে প্রতিপালন করিতে চাহিল না। তুলসী তাহাকে আখড়ায় পাঠাইতেও নারাজ। বিষম চিন্তা-স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে লোচন প্রাণপণে দয়াময় শ্রীমধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন।

পরদিন:লোচন তুলসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই নাকি ভিক্ষা করবি তুলসী ?"

যদিও এ সম্বন্ধে তুলসীর দ্বিধা ছিল, তথাপি সে আপনার সংকল্পের দৃঢ়তা জানাইয়া উত্তর করিল, "কাজেই।"

বিষাদগম্ভীরকণ্ঠে লোচন বলিলেন, "কিন্তু আমাদের বংশে কেউ কখনও যে এমন কাজ করে নাই তুলসী ?"

তুলসী একটু চড়া গলায় উত্তর দিল, "আমার মত অবস্থায় কেউ কখন পড়েনি।"

মস্তকসঞ্চালন পূর্ব্বক লোচন বলিলেন, "অবস্থা তোর এমন কি মন্দ বল্, শুধু পরের ছেলেটাকে জড়িয়েই তো যত গোলযোগ।"

তুলসী বলিল, "গোলযোগ যখন আমি বাধিয়েছি, তখন আমাকেই তার নিষ্পত্তি কর্‌তে হবে।"

একটু ভাবিয়া লোচন বলিলেন, "কিন্তু তুই কি মনে করিস্, ছিদাম দাসের ছেলে বড় হয়ে এর পর তোকে ভাত দেবে ?"

তুলসী বলিল, "আজকাল নিজের ছেলেই মাকে ভাত দিতে চায় না, ও তো পরের ছেলে।"

লোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ওকে মানুষ ক'রে তোর লাভ ?"

ঈষৎ হাসিয়া তুলসী বলিল, "লাভের মধ্যে কর্ম্মভোগ।"

"এমন কাজে কর্ম্মভোগের দরকার কি ?"

"দরকার এই যে, আমি মেয়েমানুষ।"

এবার লোচনকে নিরুত্তর হইতে হইল। তিনি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "কিন্তু তোর কি ভিক্ষায় যাবার বয়স তুলসী ?"

তুলসী বলিল, "ভিখারীর বয়সের বিচার নাই। থাক্‌লেও এই বয়সে বেশী ভিক্ষা মিলে।"

বলিয়া তুলসী মৃদু হাস্যের সহিত অপাঙ্গভঙ্গী করিল। লোচন শ্রীহরি স্মরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু ভিক্ষা করিয়া খাইব, এই প্রতিজ্ঞা করা যত সহজ, ভিক্ষা করা তত সহজ নয়, ইহা তুলসী সেই দিন বুঝিতে পারিল—যে দিন প্রথম ভিক্ষায় বাহির হইল। সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে দক্ষিণ-পাড়ার বেচারাম ঘোষের বাড়ীর দরজায় গিয়া নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইল। বেচারামের মা তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "তুলসী যে ? এ দিকে কি মনে ক'রে ?"

প্রাণপণ চেষ্টাতেও তুলসী মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না যে, সে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছে। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এইদিকে এসেছি—"

বেচারামের মা তাহাকে আদর করিয়া বসাইল। ক্রমে বেচারামের স্ত্রী, মেয়ে প্রভৃতি আসিয়া জুটিল, এবং তুলসী পুনরায় নিকা করিবে কি না, এক্ষণে সে কিরূপে দিনপাত করিতেছে, তাহাদের জাতিতে কত-বার নিকা করিতে পারে, ইত্যাদি বিবিধ প্রশ্নে তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তুলসী কোনরূপে সংক্ষেপে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িল, এবং একেবারে নিজের ঘরে আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

সন্ধ্যার সময় পরাণ পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতিমত গান শিখাইতে আসিল। সে দুই তিনটা গান গাহিবার পর তুলসী বলিল, "আমি গান শিখিতে পারি, কিন্তু এমন সুর ক'রে তো গাইতে পার্‌বো না।"

পরাণ হাসিয়া বলিল, "সুর না হ'লে গানই হয় না।"

তুলসী বলিল, "তবে গানে কাজ নাই, শুধু 'জয় রাধে' ব'লে ভিক্ষা কর্‌বো।"

গ্রামে ভিক্ষা করা সুবিধাজনক নহে দেখিয়া তুলসী সে দিন পার্শ্ববর্তী গ্রামে গেল। কিন্তু গ্রামে ঢুকিতেই যুবকগণের কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টি তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় আসিয়া যখন তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল, তখন সে লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িল। কিন্তু আজ সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং বক্ষকণ্ঠে লজ্জাটাকে কথঞ্চিৎ দমন করিয়া সে একটা বাড়ীর দরজায় গিয়া সঙ্কোচবিজড়িত কণ্ঠে বলিল, "জয় রাধে!"

জনৈক যুবক তাহার সম্মুখীন হইয়া হাসিয়া বলিল, "কে বাবা, হরিদাসী বৈষ্ণবী নাকি?"—বলিয়া সে নিজেই গান ধরিল—

"শ্রীমুখপঙ্কজ দেখবো ব'লে হে!"

তুলসী সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইল, এবং ভিক্ষাবৃত্তির মুখে অগ্নিসংযোগের ব্যবস্থা করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে ঘরে ফিরিয়া আসিল।

"আমি হাব (খাব) টুসী মা?"

তীব্রকণ্ঠে তুলসী বলিল, "কি খাবি? ছাই?"

গুপী মস্তকসঞ্চালনে সম্মতি জানাইয়া বলিল, "তাই (ছাই) হাব, আমি তাই (ছাই) হাব।"

ক্রোধরুদ্ধকণ্ঠে তুলসী বলিল,"তার চেয়ে আমার মাথাটা খেয়ে ফেল্ না কেন, সব আপদ্ চুকে যাক্।"

তুলসী যে দুঃখে নিজের মাথাটা খাইতে বলিল, গুপী সে দুঃখ বুঝিতে পারিল না; শুধু টুসীমার ক্রোধ-বিস্ফারিত দৃষ্টিটা দেখিয়া ভীত হইল; ম্লানমুখে ঘাড়-মুখ নাড়িয়া কাঁদ-কাঁদ-স্বরে বলিল, "না টুসী মা, আমি তাই হাব, আমি তাই হাব।"

তুলসীর আর সহ্য হইল না; "সর্বনেশে ছেলে!" বলিয়া গুপীর পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিল। গুপী চীৎকার করিল না, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তুলসীর মুখের উপর সকাতরদৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিতে লাগিল, "হাব না টুসী মা, আমি তাই হাব না টুসী মা।"

তুলসী দাঁতে দাঁত চাপিয়া তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানার দিকে চাহিয়া রহিল; চাহিতে চাহিতে তাহার ক্রোধরুক্ষ দৃষ্টিটা সজল হইয়া আসিল; ক্রমে চোখের কোল বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু টপ্-টপ্ করিয়া গড়াইয়া পড়িল। তুলসী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে যতটা সম্ভব রুক্ষতা আনিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "চুপ্ কর্ হতভাগা ছেলে!"

বলিয়া সে পুনরায় চড় তুলিল। গুপী ভয়ে দুই পা পিছনে হটিয়া গিয়া ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে বলিল, "আমি হাব না, ও টুসী মা, আমি হাব না।"

তুলসী দাঁড়াইয়া ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। হঠাৎ সে গুপীর পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটীর উপর জোরে মাথা কুটিতে কুটিতে বলিল, "তোকে খেতেই হবে গুপে, আমার মাথা তোকে খেতেই হবে।"

"তুলসী!"

তুলসী চমকিতভাবে চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে পরাণ। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিল। ব্যাপারটা কি বুঝিলেও, পরাণ সে দিকে যেন লক্ষ্য না করিয়াই দাবার উপর উঠিয়া বসিল, এবং ধীরে গম্ভীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তা হ'লে ভিক্ষাই কি ঠিক হ'লো তুলসী?"

তুলসী সে প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না, শুধু পরাণের দিকে একটা তীব্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল। পরাণের হাতে একটা পুঁটুলী ছিল; সেইটা এক পাশে রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, "তা হ'লে আজকার ভিক্ষাটা আমিই দিলাম। কাল তখন অপরের দরজায় যাবে।" বলিয়া পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং তুলসীর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আস্তে আস্তে উঠানে নামিল।

তুলসী এতক্ষণ স্থির নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। এক্ষণে সে হঠাৎ ফিরিয়া পরাণকে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

পরাণ ফিরিয়া দাঁড়াইল। তুলসী বলিল, "এক কাজ করতে পারবে?"

পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ বল।"

তুলসী বলিল, "ছেলেটাকে আখড়ায় রেখে আসতে পারবে?"

পরাণের দৃষ্টি বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। কঠোরস্বরে তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "পারবে?"

পরাণ ঘাড়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "তা পারবো না কেন? কিন্তু—"

দৃঢ়স্বরে তুলসী বলিল, "তবে নিয়ে যাও, রেখে এস।"

সঙ্কুচিতভাবে পরাণ বলিল, "আজই?"

তুলসী বলিল, "এখনি। নিয়ে যাও।"

সে গুপীর হাত ধরিয়া টানিয়া পরাণের সম্মুখে আনিল। পরাণ তাহার একটা হাত ধরিয়া তুলসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু তুলসী—"

গর্জ্জন করিয়া তুলসী বলিল, "আমি মেয়েমানুষ যা পারি, তুমি পুরুষ হয়ে তা পার না? ছি!"

বলিয়া সে তীব্র ভ্রূকুটী করিল। পরাণ আর কিছু বলিল না, নতমস্তকে গুপীকে কোলে তুলিয়া লইয়া নীরবে অগ্রসর হইল। কয়েক পদ যাইতেই গুপী কাঁদিয়া উঠিল; তুলসীর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি যাব না টুসী মা।"

তুলসী মুখ ফিরাইয়া দাবায় গিয়া উঠিল, এবং খুঁটীটা শক্ত করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গুপী ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাব না, ও টুসী মা, আমি যাব না।"

তুলসী প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নীরব নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পরাণ কিছু দূর গিয়া একবার পিছনে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু তুলসীর মুখে কঠোর ভ্রূকুটী ভিন্ন আর কিছু দেখিতে না পাইয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে তাহারা অদৃশ্য হইল, শুধু দূর হইতে বাতাসে গুপীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল, "আমি যাব না টুসী মা।"

ক্রমে সে কণ্ঠস্বরও যখন বাতাসে মিলাইয়া আসিল, তখন তুলসী জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া খুঁটীটা ছাড়িয়া দিল। সম্মুখেই পরাণের প্রদত্ত চালের পুঁটুলীটা পড়িয়াছিল। লাথি মারিয়া সেটাকে উঠানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তুলসী আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিল; ঢুকিয়াই মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

অপরাহ্নে পরাণ আসিয়া সংবাদ দিল, গুপীকে যথাস্থানে রাখিয়া আসা হইয়াছে। উত্তরে তুলসী শুধু বলিল, "আচ্ছা।" সে পথে যাইতে যাইতে কত কাঁদিয়াছে, তুলসীর নিকট ফিরিয়া আসিবার জন্য পরাণকে

কত অনুনয় করিয়াছে, পরাণ সেগুলা বর্ণনা করিবার উপক্রম করিতেই তুলসী কলসীটা লইয়া তাড়াতাড়ি ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

পরদিন মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত হইয়া পরাণ দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল যে, তুলসী বেশ নিশ্চিন্তভাবেই রন্ধনের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইয়াছে। দেখিয়া পরাণ দুঃখ অনুভব করিল না, বরং অনেকটা আনন্দিত হইল। ক্রমে সে কথায় কথায় গুপীর কথা তুলিল, এবং প্রথমটা কাঁদিলেও ক্রমে যে সে ভুলিয়া যাইবে, এবং সেখানে তাহার খুব অযত্নও হইবে না, এমন সব কথাও বলিল। কিন্তু তুলসী সে প্রসঙ্গে তেমন মন দিল না; বরং কতকটা বিরক্তভাবেই বলিল, "সে আপদ বিদেয় হয়েছে, বেঁচেছি। এখন সে বাঁচুক মরুক, আমার তাতে কি?"

স্ত্রীলোকের মনের এই অদ্ভুত কঠোরতার রহস্য ভাবিতে ভাবিতে পরাণ প্রস্থান করিল। কিন্তু সে যদি আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তুলসীর উৎসাহসহকারে রন্ধিত অন্ন ব্যঞ্জনগুলা তাহার উদরস্থ হওয়ার পরিবর্তে অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া জলতলে বিসর্জিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, তুলসীর এই অস্বাভাবিক ধৈর্যটা পরাণের মন্দ লাগিল না; সে হৃষ্টচিত্তে গিয়া লোচনকে এই সংবাদ প্রদান করিল। শুনিয়া লোচন শ্রীহরির মাহাত্ম্য কীর্তনপূর্বক পরাণকে কণ্ঠীবদলের জন্য ত্বরান্বিত হইতে বলিলেন, এবং সেই সঙ্গে ঘরখানাকে উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া দিবার কথা মনে করিয়া দিতেও ভুলিলেন না।

৭

তুলসী ভিতরে ভিতরে স্নেহের শাসন যতই তীব্রভাবে অনুভব করিতেছিল, বাহিরে ততই উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে দিন গুপী চলিয়া গেলে সে অনেকক্ষণ ঘরের মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল। তার পর যখন মনে হইল, পরের ছেলের জন্য এতটা অধৈর্য নিতান্ত বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন সে জোর করিয়া উঠিয়া পড়িল, এবং ঘরকন্নার যে সকল কাজ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়, সেই কাজগুলাকে খুব প্রয়োজনীয় কাজের মত করিয়া তুলিল। ঘরের এখানে সেখানে ইঁদুরের গর্ত হইয়াছিল, খানিকটা মাটী আনিয়া সেগুলাকে বুজাইয়া দিল; চালের ঝুল ঝাড়িল; দেয়ালের ফাটে মাটী দিল; উঠানের ঘাসগুলাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া ফেলিল। তার পর অন্য কাজ না পাইয়া কলসী লইয়া পুকুরঘাটে চলিল।

সন্ধ্যা হইলে তুলসীতলায় প্রদীপটি জ্বালিয়া দিয়া তুলসী একা দাবার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে রজনীর গভীরতার সহিত পল্লী যতই নিস্তব্ধ হইয়া আসিল, ততই সেই নিস্তব্ধতার ভিতর শিশুকণ্ঠের একটা অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে তাহার কানে আসিয়া বাজিতে লাগিল; অন্ধকারটা ক্রমেই দারুণ বিভীষিকার ন্যায় ভীষণ হইয়া উঠিল। তুলসী ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া, এবং প্রদীপ জ্বালিয়া বিছানা পাতিয়া লইল। অভ্যাস বশতঃ নিজের বিছানার পাশে ছোট কাঁথাখানি পাতিয়া ছোট বালিশ দুইটি দিয়া গুপীর বিছানাও প্রস্তুত করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সে তাড়াতাড়ি গুপীর বিছানাটা তুলিয়া ফেলিল; সেই সঙ্গে নিজের বিছানা গুটাইয়া ঘরের এক পাশে ফেলিয়া দিয়া মেঝের ধূলার উপর শুইয়া পড়িল।

নিদ্রিতাবস্থায় অভ্যাসমত গুপীর গায়ে হাত দিতে গেলে হাতটা যখন ঠক্ করিয়া মাটীর উপর পড়িল, তখন তুলসী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, এবং দেশলাই খুঁজিয়া লইয়া প্রদীপ জালিয়া ফেলিল। তার পর কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়া মেঝের উপর বসিয়া রহিল। শেষে বিরক্তভাবে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ছট্‌ফট্ করিবার পর একটু তন্দ্রা আসিলে তুলসী শুনিতে পাইল, যেন রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বহুদূর হইতে একটা আকুলকণ্ঠ প্রাণপণশক্তিতে তাহাকে ডাকিতেছে—"টুসী মা, টুসী মা!"

একটা ইঁদুর কিচ্‌মিচ্ শব্দ করিয়া মাথার কাছ দিয়া ছুটিয়া গেল। তুলসী তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপটা জ্বালিয়া ফেলিল। প্রকৃতি গভীর সুপ্তিনিমগ্ন। তাহার ভিতর হইতে শুধু একটা করুণ স্বর উত্থিত হইতেছে—"টুসী মা!" তুলসী এবার উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই তুলসী উঠিয়া ঘরের চারিদিকে একবার ব্যগ্রভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তার পর গায়ের কাপড়ের ধুলা ঝাড়িয়া ঘরের বাহির হইল। প্রভাতের রৌদ্রে পৃথিবী তখন হাস্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া তুলসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

খাইতে ইচ্ছা ছিল না, তথাপি তুলসী জোর করিয়া রাঁধিল। কেন রাঁধিবে না? কেন খাইবে না? একটা পরের ছেলে, যাহার নিকট একটুও উপকারের প্রত্যাশা ছিল না, শুধু যে তাহাকে অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলিয়া সকলের সমক্ষে তাহাকে হীন করিয়া তুলিতেছিল, তাহার জন্য সে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবে! ঘরে চাউল ছিল না, উঠানে পরাণের প্রদত্ত চাউলের পুঁটুলীটা পড়িয়া ছিল। তুলসী সেটাকে রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া প্রতিবেশীর ঘর হইতে ধার করিয়া চাউল আনিল। রন্ধন শেষ হইলে তুলসী ভাত লইয়া খাইতে বসিল। কিন্তু হাতের ভাত মুখে উঠিল না, প্রথম গ্রাস মুখের নিকট আনিতেই মনে পড়িল, কাল এই এক মুটা ভাতের জন্য ছেলেটা কি মার না খাইয়াছে! শেষে তাহাকে—

তুলসীর চোখ দিয়া বন্যার প্রবাহ ছুটিল। তথাপি সে ভাতের গ্রাসটা মুখে গুঁজিয়া দিল। কিন্তু তাহা কিছুতেই গলা দিয়া নামিতে চাহে না, উদ্গত বাষ্পরাশি তাহাকে উপরের দিকে ঠেলিয়া দেয়। বহুকষ্টে তুলসী মুখের ভাতগুলা গলাধঃকরণ করিল। বাকী ভাতগুলা তুলিয়া লইয়া পুকুরের জলে ঢালিয়া আসিল।

পরদিন পরাণ আসিয়া বলিল, "আজ আড্ডার দিকে গিয়েছিলাম তুলসী।"

তুলসী উদাসস্বরে উত্তর করিল, "বেশ!"

গুপীর সম্বন্ধে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিল না দেখিয়া পরাণ আপনা হইতেই বলিল, "গুপী বেশ ভাল আছে।"

তুলসী গম্ভীরভাবে বলিল, "আচ্ছা।"

তাহার এই ধৈর্য্য দেখিয়া পরাণ অবাক্ হইল। একটা পোষাপাখী উড়িয়া গেলেও লোকে তাহার জন্য কত হায়-হায় করে, আর একটা ছেলেকে এতদিন মানুষ করিল, অথচ তাহার জন্য একটু ব্যাকুলতা নাই! তুলসীর প্রাণটা কি পাষাণে গড়া? পরাণ একটু ভাবিয়া বলিল, "ছেলেটা এখনও কাঁদে।"

বিরক্তিসূচক ভাভঙ্গী করিয়া তুলসী বলিল, "তবে আর কি।"

পরাণ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "যদি বল তো এখনো ছেলেটাকে এনে দিতে পারি।"

তুলসীর ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখার আবির্ভাব হইল ; একটু কৌতুকীস্বরকণ্ঠে বলিল, "কেন, কণ্ঠীবদলের কড়ির যোগাড় হ'লো না বুঝি ?"

কণ্ঠীবদলের কথায় পরাণের মুখখানা হাস্যপ্রফুল্ল হইল ; সে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "সে যোগাড় অনেক আগেই ক'রে রেখেছি তুলসী, আর তারি যোগাড়ে আজ আখড়ায় গিয়েছিলাম।"

তুলসী বলিল, "বটে !"

পরাণ বলিল, "কিন্তু বাবাজীর সঙ্গে দেখা হ'লো না, তিনি ন'পাড়ার আখড়ায় গিয়েছেন। কাল নাগাদ সন্ধ্যা ফিরবেন। পরশু সকালেই একবার যাব।"

পরিহাসের স্বরে তুলসী বলিল, "তোমার যে আর দুম সয় না ?"

মাথা নাড়িতে নাড়িতে পরাণ বলিল, "সে কথা সত্যি তুলসী, যে দিন হ'তে কথাটা উঠেছে, সেই দিন হ'তে রাতে ঘুম বড় একটা হয় না। দেখ, আমি চিরকালই একা, কিন্তু এখন যেন বড্ড একা ব'লে মনে হয়। গা ছম্‌ছম্ করে, চোখে ঘুম আসে না। না তুলসী, যত শীগ্‌গীর হয়, কাজটা সেরে ফেল্‌তে হবে।"

তুলসী বলিল, "কিন্তু আমি যদি অমত করি ?"

চমকিত হইয়া পরাণ তুলসীর মুখের উপর করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল ; কাতরকণ্ঠে বলিল,"না তুলসী, তা হ'লে—তা হ'লে আমি পাগল হ'ব, গলায় দড়ি দেব।"

গম্ভীরস্বরে তুলসী বলিল, "তুমি পাগল হ'লে বা গলায় দড়ি দিলে আমার কোনও ক্ষতি নাই। কিন্তু ভয় নাই, আমি অমত করবো না।"

পরাণের ভীতিকাতর মুখখানায় আহ্লাদের হাসি ফুটিয়া উঠিল ; আনন্দে মস্তকসঞ্চালন করিয়া বলিল, "তা আমি জানি তুলসী !"

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকমে জানলে ?"

পরাণ হাসিয়া বলিল, "তা নইলে কি তুমি ছেলেটাকে দূর ক'রে দাও।"

তুলসীর মুখখানা লজ্জায় ক্ষোভে মলিন হইয়া আসিল। কিন্তু স্বরে সে অস্বাভাবিক কঠোরতা আনিয়া বলিল, "বেশ ক'রেছি ! পরের ছেলেকে কেন আমি খাওয়াতে যাব বল তো ?"

পরাণ একটু অপ্রতিভভাবে "ঠিক, ঠিক !" বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

৮

পরদিন তুলসী পরাণের পথ চাহিয়া উৎকণ্ঠায় সারাদিনটা কাটাইল। সে উৎকণ্ঠা পরাণের জন্য নয়, সে আখড়ায় গিয়াছিল কি না, ইহাই জানিবার জন্য। পরাণ কিন্তু আসিল না। যতই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ততই পরাণের উপরে বিরক্তিতে তাহার মনটা ভরিয়া উঠিতে লাগিল। হতভাগা মানুষ, একবার এই দেড় কোশ পথ গিয়া খবরটা আনিতে পারিল না। অবশ্য, তুলসী খবর আনিতে বলিলে সে হাজার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া যাইত, কিন্তু তাহাকে বলিতে যাইবে কি জন্য ? পরের ছেলে হইলেও, এবং তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেও, তাহার খবরটা পাইবার জন্য তুলসী কত উৎসুক হইয়া থাকে। বাহিরে সে ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না বটে, কিন্তু তাহার মনের ভিতর কি যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে তাহা বুঝিবে ? পরাণের বুঝা উচিত ছিল যে, তুলসী মেয়েমানুষ, তাহার প্রাণ মেয়েমানুষের প্রাণ। কিন্তু নিষ্ঠুর পুরুষমানুষ কি ইহা বুঝে ?

সন্ধ্যার পর তুলসী বসিয়া যখন প্রতি মুহূর্তে পরাণের আগমন প্রত্যাশা করিতেছিল, তখন লোচন মালা-হাতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পায়ের শব্দ পাইয়া তুলসী ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল, "কে, বৈরিগী ?"

লোচন হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এর মধ্যেই এত টান তুলসী, তবু এখনো কণ্ঠীবদল হয় নি।"

বলিয়া লোচন হাসিতে হাসিতে দাবার উপর উঠিলেন। তুলসী বিরক্তভাবে একখানা আসন পাতিয়া দিয়া কিছু দূরে গিয়া বসিল। লোচন আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "আজ দ্বাদশী, পূর্ণিমার দিন স্থির ক'রে দিয়েছি। পরাণে ছোঁড়া বড় কঞ্জুস, কিন্তু তুলসী, দশ জন বৈষ্ণবের সেবা পাওয়া বড় ভাগ্যের কাজ, কিন্তু বলে, তা পারব না। আরে না পারলে কি চলে ? ছোঁড়ার ইচ্ছাটা কি জানিস্, নিখরচায় এমন একটা বৈষ্ণবীকে হাত করে।"

লোচন হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তুলসী হাসিল না, কোনও কথাও বলিল না, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। লোচন তখন পরাণের অন্যান্য গুণাবলীর কীর্তন করিয়া শেষে প্রস্তাব করিলেন যে, কণ্ঠীবদলের পর তুলসী পরাণের ঘরে চলিয়া গেলে এই ঘরখানার অধিকার তাঁহাকে দিতে হইবে। তিনি ইহার সংস্কার করিয়া ইহাকে সযত্নে রক্ষা করিবেন, এবং এখানে একটি তুলসীকুঞ্জের প্রতিষ্ঠা করিবেন। ইহাতে গোবর্দ্ধনের স্মৃতিস্বরূপ ঘরখানাও বজায় থাকিবে, এবং তুলসীকুঞ্জ তাহার ভিটাটাকে পবিত্র করিয়া তাহার বৈকুণ্ঠের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিবে।

তুলসী ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল না। তখন লোচন তাহার সুবুদ্ধির প্রশংসা করিয়া অচিরাৎ যে তাহার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হইবে, এরূপ সম্ভাবনা প্রকাশপূর্ব্বক সানন্দে প্রস্থান করিলেন। তুলসী ক্রোধে পরাণকে মনে মনে গালি দিতে দিতে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

পরদিন তুলসী স্নানান্তে রন্ধনের উদ্যোগ করিতে করিতে যখন বার বার পথের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল, তখন পরাণ আসিয়া ডাকিল, "তুলসী!"

তুলসী তাহার দিকে একবার উৎকণ্ঠাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই মুখখানা ভারী করিয়া গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিল। পরাণ তাহা লক্ষ্য না করিয়াই দাবার উপর বসিয়া পড়িল, এবং হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল, "সব ঠিক হয়ে গেল তুলসী, পরশু পূর্ণিমা, বেশ ভাল দিন। বাবাজী নিজে আস্বেন।"

গম্ভীরমুখে তুলসী বলিল, "আজ আবার সেখানে গিয়েছিলে বুঝি ?"

পরাণ মাথা নাড়িয়া সহাস্যে বলিল, "যাব না ? দু'রাত কি আমি ঘুমিয়েছি ? আজ ভোরে উঠে ছুটেছিলাম।"

তুলসী যে কথাটা সকলের আগে শুনিতে চাহিতেছিল, তাহা শুনিতে না পাইয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইল। অথচ সে কথাটা খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও ইচ্ছা হইতেছিল না। সুতরাং সে নীরবে নতমুখে উনানে একখানা কাঠ গুঁজিয়া দিল। পরাণ বলিল, "বাবাজী নিজে আস্বেন, খরচটা কিছু বেশী হবে। তা কি করি বল, না হয় পাঁচ টাকা ধার হবে। খেটে খুটে ধার শোধ ক'রে ফেলবো, কি বল ?"

সে সাগ্রহে তুলসীর মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তুলসীর মুখে আগ্রহ বা আনন্দের কোনও

কিছুই দেখিতে পাইল না। না পাইলেও সে ইহাতে নিরুৎসাহ হইল না। সমান আবেগের সহিত বলিল, "আমার ইচ্ছা হচ্ছে কি জান, এই দিন দু'টোকে হাতে ক'রে ঠেলে দিই।" পরাণ একটু হাসিল। তুলসী গম্ভীরমুখেই বলিল, "ও'।" পরাণ উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "যাক্, এখনো চান-আহ্নিক সব বাকী, তার পর রান্না। তুমি বুঝি হাঁড়ীতে চাল দিয়ে ফেলেছ ?"

তুলসী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।" পরাণ প্রস্থানোদ্যত হইল। তুলসী আর থাকিতে পারিল না; সে ডাকিয়া বলিল, "শোন।"

পরাণ দাঁড়াইল। তুলসী জিজ্ঞাসা করিল, "হতভাগা ছেলেটা এখন আর কাঁদে না বোধ হয় ?"

সচকিতভাবে পরাণ বলিল, "ছেলেটা ? কাঁদে—হাঁ কাঁদে বৈ কি। ভাল কথা, কা'ল রাত থেকে তার আবার জ্বর হয়েছে।"

তুলসী বসিয়াছিল, তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল; ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর ? খুব বেশী জ্বর নাকি ?"

পরাণ বলিল, "খুব বেশী নয়, তবে নেহাৎ কমও নয়।"

শঙ্কাজড়িতকণ্ঠে তুলসী বলিল, "দেড় বছরের ভিতর একদিনও তো তার জ্বর হয় নি ?"

পরাণ সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "ঠাঁই-নাড়া হয়েছে কি না, ভাবনায় জ্বরটা হয়েছে। ভয় নাই, সেরে যাবে।"

তুলসী চিন্তামলিনমুখে শুধু বলিল, "তাই তো।"

পরাণ বলিল, "ভাবনার কিছু নাই। আমি তো পরশু বাবাজীকে আনতে যাচ্ছি।"

তুলসী নতমুখে বলিল, "পরশু ?"

পরাণ মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে বলিল, "কাল একবার গিয়ে দেখে আসবে ?"

তুলসী মুখ তুলিয়া বলিল, "কেন ?"

"কেমন থাকে, তুমি খবরটা পেতে।"

তুলসী চুপ করিয়া রহিল। পরাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কি বল ?"

ভঙ্গী করিয়া রুক্ষস্বরে তুলসী বলিল, "তোমার খুসী হয় যেতে পার, আমি বলতে যাব কেন ? আমার তো তার ভাবনায় ঘুম হয় না।"

বলিয়া সে সবেগে মুখটা ফিরাইয়া লইল। পরাণ দেখিল, তুলসীর গলাটা এত ভারী হইয়া আসিয়াছে যে, আর একটা কথা কহিতে গেলেই হয় তো সে কাঁদিয়া ফেলিবে। পরাণ মনে মনে একটু হাসিয়া আর কোনও কথা না বলিয়াই চলিয়া গেল।

ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদেই জ্বর হয়েছে নিশ্চয়। জ্বরের যাতনায় যখন সে ছট্‌ফট্ করবে, তখন কে তাকে দেখবে ? যখন টুসী মা টুসী মা ব'লে কাঁদবে, তখন কে তাকে শান্ত করবে ? তুলসী রাঁধিল, কিন্তু খাইতে পারিল না; হাঁড়ীর ভাত হাঁড়ীতেই পড়িয়া রহিল।

সে দিন রাত্রিটা তুলসীর যে কি করিয়া কাটিল, তাহা সেই জানে। হায়, বিকালে তাহাকে একবার

দেখিয়া আসিবার জন্য কেন সে পরাণকে যাইতে বলিল না? সে তাহার উপর রাগ করিয়া ছেলেটার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা করিল? ধিক্ তাহাকে! রাত্রিতে তুলসী একবারও ঘুমাইতে পারিল না। একটু তন্দ্রা আসিলেই সে যেন চোখের উপর দেখিতে পাইত, গুপী একটা ফাঁকা ঘরে একা পড়িয়া জ্বরের যাতনায় ছটফট্ করিতেছে, আর চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, "টুসী মা, টুসী মা!"

৯

সকালে উঠিয়াই তুলসী পরাণের ঘরে উপস্থিত হইল। কিন্তু ঘরে তালা বন্ধ, পরাণ কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে। তুলসী খানিকক্ষণ দরজায় বসিয়া রহিল, কিন্তু পরাণ ফিরিল না। মনে মনে তাহার উপর রাগিয়া তুলসী ফিরিয়া আসিল।

দুপুরবেলা আবার একবার গেল। পরাণ তখনও ফিরে নাই, ঘরে তালা বন্ধ রহিয়াছে। তুলসীর ক্রোধের সীমা রহিল না। উঃ, সংসারের লোকগুলা কি নিষ্ঠুর, কি স্বার্থপর! একটা দুঃসংবাদ দিয়া স্বচ্ছন্দে নিরুদ্দেশ হইয়া রহিল! তুলসীর ইচ্ছা হইল, দেখা পাইলে সে এই নিষ্ঠুরতার জন্য পরাণকে বেশ পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়। ছি ছি, অসুস্থ ছেলেটার খবর পাইবার জন্য সে হা-প্রত্যাশা করিয়া রহিয়াছে, আর পরাণ হয় তো কণ্ঠীবদলের আমোদে মাতিয়া তাহার যোগাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এমন স্বার্থপর লোকের সঙ্গে কণ্ঠীবদল! ছি!

তুলসীর ইচ্ছা হইল, সে নিজেই ছুটিয়া যায়। কিন্তু আখড়ায় যাইতে তাহার সাহস হইল না। সে ছুটিয়া লোচনের কাছে গেল। কিন্তু লোচন শরীর অসুস্থ বলিয়া যাইতে পারিলেন না; অধিকন্তু তিনি তুলসীকে শ্রীহরির ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করিয়া থাকিতে বলিয়া উপদেশ দিলেন, প্রভু যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্যই। হয় তো ছেলেটার একটা ভাল-মন্দ ঘটাইয়া তিনি তুলসীর দোটানা মনকে একনিষ্ঠ করিয়া দিবেন! তাঁহার অপার মহিমা!"

তুলসী কিন্তু প্রভুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কানে আঙুল দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। তথাপি পরাণ ফিরিল না। তুলসী সন্ধ্যা জ্বালিল না, তুলসীতলায় প্রদীপ দিল না; অন্ধকারে দাবার উপর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় পরাণ ডাকিল, "তুলসী!"

তুলসী রাগে গর্জ্জন করিয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু বলা হইল না, তাহার সকল ক্রোধ, সকল উৎকণ্ঠাকে নিষ্ফল করিয়া দিয়া মৃদু ক্ষীণকণ্ঠের আহ্বান উত্থিত হইল, "টুসী মা!"

তুলসী পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া পরাণের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং গুপীকে তাহার কোল হইতে টানিয়া লইয়া বুকে চাপিয়া ধরিয়া আবেগবিহ্বলকণ্ঠে ডাকিল, "গুপী!"

গুপী তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আমাল দ্বল (জ্বর) অয়েতে (হইয়াছে) টুসী মা, আমি আল দাব না।"

সে টুসীমার বুকে আপনার মুখটা গুঁজিয়া দিল। তুলসী তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "না গুপী, আর তোকে কোথাও যেতে দেব না।"

পরাণ বলিল, "তা হ'লে কণ্ঠীবদলের কি হবে?"

তুলসী বলিল, "আমি কি জানি? তুমি কেন ওকে নিয়ে এলে?"

পরাণ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সাধে কি নিয়ে এসেছি? সকালে উঠে শোনপুরে গিয়েছিলাম বিষ্টু দাসের কাছে দশটা টাকা ধার করতে। সেখানে টাকা নিয়ে ভাবলাম, ছেলেটাকে একবার দেখে যাই। গিয়ে দেখি, আটচালার একপাশে একখানা ছেঁড়া চাটায়ের উপর ওকে ফেলে রেখেছে, ছেলেটা ছটফট্ করছে, আর কেঁদে কেঁদে ডাকছে 'দুগ্গা মা, দুগ্গা মা!' এক এক বেটা বৈরাগী এসে ওকে ধমক দিচ্ছে।"

তুলসী আঁচলে চোখ মুছিল। পরাণ বলিল, "তোমার কি, দেখে আমার চোখেও জল এল তুলসী। তাই কি ব্যাটারা ছাড়তে চায়? ব্যাটাদের যেন সাত পুরুষের কেনা ছেলে। শেষে বিকেলে বাবাজী এলে কত স্তব-স্তুতি ক'রে, নগদ পাঁচ টাকা সেলামি দিয়ে তবে এনেছি।"

কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে তুলসীর চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। পরাণ বলিল, "ছেলেটাকে নিয়ে সোনা-পুরের হরি ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি দেখে ওষুধ দিলেন। দশ আনা দিয়ে এই ওষুধ একশিশি এনেছি। ডাক্তার বলেছেন, ভয় নাই, এই ওষুধ খেলেই সেরে যাবে। বাজার থেকে আবার মিছরী, সাবু, একটা ডালিম নিয়ে তবে এসেছি। ভাগ্যে গিয়ে পড়লাম, তা নইলে ছেলেটার কি হ'তো?"

গুপীকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সজলকণ্ঠে তুলসী বলিল, "কিন্তু এখন তোমার কণ্ঠীবদলের কি হবে?"

তুলসী বাষ্পপূর্ণ নেত্রে এই নিষ্ঠুর স্বার্থপর লোকটার দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় লোচন মালা জপ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন এবং তুলসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পরাণে ছোঁড়া নাকি ছেলেটাকে আবার ফিরিয়ে এনেছে তুলসী?"

পরাণ তাঁহার দিকে ফিরিয়া সহাস্যে বলিল, "এনেছি খুড়ো, হতভাগা ছেলেটা সেখানে গিয়ে যে মরতে বসেছিল।"

লোচন গম্ভীরভাবে বলিলেন, "বটে, তা হ'লে কণ্ঠীবদলটা হলো না বল?"

পরাণ বলিল, "আপাততঃ তো নয়।"

লোচন খানিকটা গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, তার পর পরাণের নির্বুদ্ধিতার উল্লেখপূর্ব্বক দ্রুত মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিলেন। পরাণ বলিল, "তা হ'লে আমি এখন যাই তুলসী?"

তুলসী ছেলেটাকে তাহার পায়ের কাছে ধপ্ করিয়া বসাইয়া দিয়া তর্জ্জন করিয়া বলিল, "যাবে কোথায়? ছেলেটাকে নিয়ে এলে, এখন তার ভার নেয় কে?"

পরাণ হাসিয়া গুপীকে তুলিয়া লইল; হাস্যতরলকণ্ঠে বলিল, "আমি যখন এনেছি, তখন তার ভার আমা-কেই নিতে হবে। কিন্তু ছেলের মায়ের ভার নিতে পারবো না, তা ব'লে রাখছি।"

তুলসী তাহার দিকে হাস্যোজ্জ্বল বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "ওঃ, ছেলের মা তো তোমার উপর ভার দেবার জন্য কেঁদে বেড়াচ্ছে।"

পরাণের উচ্চ হাস্যধ্বনিতে তরল অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রাঙ্গণ হাসিয়া উঠিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কেরাণী কাব্য

[রঙ্গচিত্র]

১

প্রেম বল, পতিভক্তি বল, ও সব কথার কথা। স্ত্রীলোকের পরম আরাধ্য বস্তু—গয়না। নারী-চরিত্রের এ নিগূঢ় রহস্য কেবল সত্যের সংসারেই উপলব্ধি করা যায়, গল্পের নায়িকায় পাওয়া যায় না। যদি স্ত্রীর মনে সন্তোষ, সংসারে শান্তি রাখিতে চাও, গহনার দোকানের সচিত্র ক্যাটলগ্ বাড়ীতে আনিও না। এমন কি, গয়না-পরা স্ত্রীলোকের ছবি পর্য্যন্ত নয়। আমি যখন সেই রকম একখানা ফটোগ্রাফ ঘরে আনিয়াছিলাম, তখন আমাকে কেহ সতর্ক করিয়া দেয় নাই।

আমার স্ত্রী ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ। নভেলের নায়িকার মত একেবারেই নয়, অন্ততঃ আমি তাই ভাবিতাম। এই সাধারণ স্ত্রীটি যখন একখানি আধময়লা কাপড় প'রে হলুদ বাটিতেন, আর তাঁর কাচের চুড়ীতে চুড়ীতে কড়ি-কোমল বাজিত, সে আওয়াজ আমার কানে বড় মিঠা লাগিত। আফিসের সারা পথ ভাবিতে ভাবিতে যাইতাম, উহারা পরস্পরে কি বলাবলি করিতেছিল। মনে আক্ষেপ হইত, হায়, যদি কবি হইতাম, উহাদের ভাষা বুঝিতাম।

দারিদ্র্যের দুঃসহ তাপে কবিতার অমৃত-উৎস শুকাইয়া যায় সত্য, কিন্তু বয়সের স্বধর্ম একেবারে লোপ পায় না। টেক্সের বিল, উঠ্‌নোর খাতা, গয়লার হিসাবের উপরও যৌবন আপনার জয়-পতাকা বিস্তার করে। তবে বর্‌র পোষাকের মত এই যৌবনকে যদি ভাড়া করিয়া আনিতে হইত, আর চাঁদের আলো, ফুলের গন্ধ, দক্ষিণা বাতাস, পাখীর গান পয়সা খরচ করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত, তাহাদের মাধুর্য্য কতটা বজায় থাকিত, বলিতে পারি না। কিন্তু এ সকল নাকি নিখরচায় পাওয়া যায়, সে জন্য দরিদ্রেরও সময় সময় বিমল আনন্দভোগের ব্যাঘাত হয় না। তাই এমনি এক রাত্রে—

কিন্তু ইহার পূর্ব্বের কথাটা একটু বলিয়া রাখি। আমি কেরাণী; ত্রিশটি টাকা মাহিনা পাই। এক-খানি ভাঙ্গা বাড়ী আছে, বাসাভাড়া লাগে না, তাই কোনও রকমে সংসার চলে; তাহাও আমার স্ত্রীর গৃহিণীপনায়। কিন্তু যখন জার্ম্মাণ যুদ্ধের তাড়সে অন্নবস্ত্র, এমন কি, শাক-পাতার পর্য্যন্ত অগ্নিমূল্য হইয়া উঠিল, তখন আমার স্ত্রী দাবদগ্ধা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

যে রাত্রির কথা আমি বলিতেছিলাম, সেদিন কি তিথি ছিল, স্মরণ নাই। কিন্তু মাসটা বোধ করি ফাল্গুন, কেন না, কবিদের মতে এমন আগুনলাগা মাস আর নাই। এই মাসে বিধবার সর্ব্বনাশ, বির-হিণীর হাঁসফাঁস, বিধুরের দীর্ঘশ্বাস, আর আর্য্য কার্ত্তিকেয়গণের ক্ষয়কাস উপস্থিত হয়। এই মাসে প্রাণ পাখী চমকিয়া চমকিয়া উঠে, কোকিলের স্বরভঙ্গ হয়, আর হরকোপানলদগ্ধ অনঙ্গ ফিনিক্স-পক্ষীর মত

নূতন অঙ্ক লাভ করে। এহেন মাহেন্দ্র মাঘে দৈব-জ্যোৎস্নাতে ছাদে ব'সে ঠিক কি ভাবিতেছিলাম, জানি না।

সে দিন শুক্লা অষ্টমী। ছাদের কোণে একটা ভাঙা টবে গোটাকয়েক বেলফুল ফুটিয়াছিল। চাঁদ তখনও উঠে নাই, কিন্তু উঠি উঠি করিতেছে। আমার সন্নিকটে একটা মার্জারী চোখ বুজিয়া বোধ করি প্রিয়সম্মিলনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। এমন সময় একটা পাগলা হাওয়া কোথা থেকে হঠাৎ ক'রে ছুটে এসে ফুলের উপর মহা উৎপাত আরম্ভ ক'রে দিলে। সে কখনও বেলফুলের জীর্ণ বৃন্তে দোলা দিয়ে যায়, কখনও সেই গন্ধ-বেলগুলোর সঙ্গে নির্লজ্জ রসিকতা করে। একটা কোকিল কোথায় চুপ ক'রে ব'সে ছিল, সেও হঠাৎ উতলা হয়ে ডেকে উঠলো। অমনি আমাদের ভাঙা পাঁচিলের ওপাশ থেকে কে এক নবীন চাঁদের আলো আমার গায় ছিটিয়ে দিলে। আর ঠিক সেই সময় আমার স্ত্রী ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া বসিলেন।

পাঁজিতে প্রিয়তমা সম্ভাষণের কালাকাল নিরূপিত হয় না। এটা বাঙ্গালা দেশের একটা অভাব। যদি এমন বিধান থাকিত—আজ অষ্টমী, বিয়াল্লিশ দণ্ড, আট পল, ছয় বিপল, ইতিমধ্যে প্রেম-সম্ভাষণ কি নারী জাতির প্রতি কটাক্ষপাত নিষিদ্ধ; তাহা হইলে বঙ্গ-সংসারে অনেক দুর্দৈব, দুর্নিমিত্ত নিবারিত হইত। কিন্তু তেমন কোন বিধানই ছিল না, সুতরাং স্ত্রী কাছে বসিতেই আমি তাঁহার একখানি কোমল করপল্লব আমার দুইখানি হাতের মধ্যে টানিয়া লইলাম। চাঁদ তাঁহার চারি দিকে অপূর্ব মাধুরী বর্ষণ করিতেছিল। আমার মনে হইতে লাগিল, যেন এমনি চাঁদের আলোয়, মুক্ত আকাশের তলায়, মুক্ত হাওয়ায়, তাঁহাতে আমাতে নিবিড়তর মিলনের আকাঙ্ক্ষায় করে-করে পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিয়া বসিয়া আছি, এবং ইহাই সত্য, আর সব ভোজবাজির মত মিথ্যা। ঐ চাঁদ, গগনাঙ্গনে নিক্ষিপ্ত ঐ মুক্তাহার, ঐ নীহারিকাজাল, সব মিথ্যা। আমার নিত্য আপিস যাওয়া, সাহেবের গাল খাওয়া; এই ভাড়াবাড়ী, ঐ কোকিলের ডাক, 'বেলফুল'—'বরফ' ওয়ালার হাঁক, সব মিথ্যা—সত্য কেবল সে আর আমি। সেই সময় পথে কে গাহিতেছিল—

"সেথা কেউ ছিল না রে—
কেবল সে ছিল আর আমি ছিলাম,
সে একা আর আমি একা।"

যাদুমন্ত্রের মত এই গান আমাকে যেন মোহাচ্ছন্ন করিতেছিল। আমি তাঁহার হাতখানিতে একটি মৃদু চাপ ও ঈষৎ টান দিয়া অতি কোমল গাঢ় আবেগে কম্পিতস্বরে ডাকিলাম—'অনু!'

তাঁহার নাম ছিল অনুপমা। তিনি আমার সে প্রীতি-মধুর, অব্যক্ত ভাবময়, অনৈসর্গিক প্রণয় সিক্ত সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে বলিলেন, 'সন্ধ্যার পর ত তোমার সময় থাকে, একটা মাষ্টারী-টাষ্টারী জোটে না?'

যেন বাগানে যেতে যেতে হোঁচট খেয়ে গোবরগাদায় প'ড়ে গেলুম। আমি ত্বরিত তাঁহার হাত ছাড়িয়া দিয়া মনে মনে বলিলাম, 'জুটবে না কেন? তার চেয়ে আরও সহজে জোটে দড়ী আর কলসী!'

আমার মুখে কোনও উত্তর না পাইয়া স্ত্রী ছাদের উপর আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং অল্পক্ষণ পরেই ইহ-সংসারের হাতা, বেড়ী, হাঁড়ি কুঁড়ি, এমন কি, আমার ভাবী মাষ্টারের ছবির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত নিদ্রার কোলে নিমগ্নপ্রায় হইলেন। কিন্তু আমার চোখে ঘুম আসিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল, অমু আজ এ কি কাণ্ড করিয়া বসিলেন। এই প্রেমস্বপ্নময়ী যামিনীতে—যাহা পুরাণে নাই, কোরাণে নাই, আমার মনস্তত্ত্ববিদ্ প্রেমেশদাদার নব্যতান্ত্রিক উপন্যাসেও নাই—হঠাৎ এমন একটা বাক্য তিনি প্রয়োগ করিলেন কেন? এ কি উন্মত্ততার প্রথম প্রলাপ? দুঃখের জ্বালায় কি পাগল হইয়া গেলেন? আজ কিছুদিন ধরিয়া ইঁহাকে কেমন কেমন দেখিতেছি। আচম্বিতে নিঃশব্দে কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, আমার ঘরে যে সেই সুসজ্জিত মাষ্টারের সুন্দর ফটোগ্রাফখানা আছে, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহাকে দেখিতেছেন। রাত্রে দৈবাৎ নিদ্রাভঙ্গে কখনও দেখিয়াছি, তিনি শয্যায় নাই, সেই ভাঙা ছাদে একলা বসিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন।

এ সকলের একটা-না একটা কারণ অনুমান করা শক্ত নহে। আমার মা ঠাকুরাণীর মৃত্যুর পর দুই বৎসরের উপর বাপের বাড়ী যান নাই, এখনও ছেলেমানুষ, মন কেমন করিবে বই কি। এটা এক রকম বোঝা যায়। কিন্তু আজিকার এই প্রণয়-বাসরে মাষ্টারের চিন্তা উঠে কেমন করিয়া? স্থিরচিত্তে একটু ভাবিয়া দেখ। একখানি ভাঙা বাড়ীর ছাদ, তাহার উপর নায়ক-নায়িকা। কল্পনাকে একটু উচ্চসুরে বাঁধিলে এ ছাদটিকে কুসুমিত কুঞ্জকুটীর বলিলেও বলা যায়। কেন না, তাহার প্রাচীরে শিশু বট, অশ্বত্থের চারা ও নানাজাতি তৃণ-গুল্মের অভাব ছিল না। তার উপর মলয় পবন, কোকিল-কূজন, বেলফুলের গন্ধ, আর চাঁদের আলো যেখানে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল বুনিতেছিল, সেখানে স্ফুরিত নেত্র, আস্ফালিত-বেত্র মাষ্টার মহাশয়ের আবির্ভাব হয় কেন? কেন? নহিলে অলঙ্কারের সামঞ্জস্য হয় না। সেই ফটোগ্রাফখানা দারিদ্র্য-প্রপীড়িত, আমার চিরবঞ্চিত যৌবনমন্দিরের উপর যে একটা কুহেলিকা মোহজাল বিস্তার করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। আমার নিদারুণ অভিমান হইল। আমি তখন সেই বস্ত্রাঞ্চল-শায়িতা, চঞ্চল-পবন-বিলসিতা, স্বর্ণালোকিতা রমণীর মুখ চাহিয়া মনে মনে হাসিয়া বলিলাম, আমি তোমার সোনার স্বপন সার্থক করব, প্রেয়সি! কিন্তু তুমি আজ আমার একটা বড় সাধের স্বপ্ন ভেঙে দিলে। তার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই ছাদের উপর ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া দৈন্যের একমাত্র সান্ত্বনা—লাখ টাকার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম। সর্বাগ্রে ঠিক করিলাম, এখন হইতে প্রতি বৎসর একখানা করিয়া ডার্বীর টিকিট কিনিব। আহা, আলাদিনের মত যদি একটা আশ্চর্য্য প্রদীপ পাওয়া যায় ত বেশ হয়। দূরের ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া দুইটা বাজিয়া গেল। কাল সকাল সকাল আফিস যাইতে হইবে—মেল-ডে। আমার পক্ষিরাজকে সংযত করিতে হইল। অনন্ত আসমান হইতে আপাততঃ আকাশ-কুসুম তোলা বন্ধ করিয়া সেই ভাঙা ছাদের উপর তাহাকে নামাইয়া আনিলাম, এবং হাতের কাছে যে উপায়টা ছিল, সেইটাই স্থির করিয়া ফেলিলাম। স্ত্রীকে এখনকার মত পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিয়া আপনার থাকিবার জন্য একখানিমাত্র ঘর রাখিয়া বাকী বাড়ীটা ভাড়া দিব। আমার শ্বশুরেরা যদিও বড়লোক নহেন, কিন্তু স্ত্রীর খোরাকী বাবদ মাসে ১০৲টা করিয়া টাকা দিলে আমার যতদিন ইচ্ছা তাঁহারা তাঁহাকে আদরে রাখিবেন। আমি হোটেলে থাকিব,

প্রশ্নটা যে ঠাট্টা নয়, তাঁহার মুখ দেখিয়াই বুঝিলাম। আমি ত অবাক্! তিনি পুনরায় বলিলেন, 'বল না!' তখন আমিও মনে মনে বলিলাম, এই মাঝ গঙ্গা, আর ঐ সব মাঝি মাল্লা সাক্ষী, 'আমি ভাল-বাসার নিদর্শন তোমাকে এমন দেব যে, তোমার আর সন্দেহমাত্র থাকবে না।' মুখে উত্তর দিলাম, 'এ কি কথা বল্‌ছ? ভালবাসি কি না, মাঝ গঙ্গায় তার কি প্রমাণ দিব? তুমি ফিরে এস, তার পর ভাল ক'রে প্রমাণ করব।"

২

অনুকে রাখিয়া আসিয়া বাড়ীর দরজা খুলিতেই আমার মনে হইল, জীর্ণ অট্টালিকাখানা যেন আমাকে গিলিবার জন্য হাঁ করিল। আমি সত্য সত্যই একপদ পিছাইয়া আসিলাম। মনে ভয় হইল, এই মহা-শূন্যের উদরে আমি প্রবেশ করিব কেমন করিয়া? একটা স্ত্রীলোক যে মানুষের মন সংসার এমন করিয়া ভরিয়া রাখে, তাহা পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। একলা এখানে বাস করি কি ক'রে? হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরিয়া উঠিল। আপনার অভিমানকে জাগাইয়া তুলিয়া ধিক্কার দিলাম, ছিঃ! আমার চেয়ে গয়না যার বেশী প্রিয়, তার জন্য শোক কেন? কিন্তু একটা কিছু না করলে পাগল হয়ে যাব। চট্ ক'রে একটা মতলব আমার মাথায় উঠিল। আমি উমেশ দাদার বাড়ীর অভিমুখে ছুটিলাম। সেখানে আমার প্রতি নিদারুণ স্নেহশীলা বৌদিদি আছেন,— নিদারুণ বলিতেছি এই জন্য যে, তাঁহার স্নেহের অত্যাচার সময় সময় আমার অসহ্য হইয়া উঠে।

উমেশদা'র বাটীতে তখন সবেমাত্র সান্ধ্য-চায়ের আসর বসিয়াছে। ঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতে-ছিল সত্য, কিন্তু ঘর আলো করিয়াছিলেন আমার বৌদিদি।

আমি উপস্থিত হইতেই দাদা বলিলেন, 'সতীশ না কি!' লোকটার সঙ্গে আমার প্রায় দশ বৎসরের আলাপ, কিন্তু আমি আমি কি না, এ সন্দেহ তাঁহার আর গেল না। আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলাম 'দাদা, আমি একটা গল্প লিখ্‌ব।'

উমেশদা একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া ছিলেন। উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, 'বল কি?' বলিয়াই আবার হেলিয়া পড়িলেন।

এতক্ষণ লজ্জায় বৌদিদির মুখের পানে চাহিতে না পারিলেও আমি মনে মনে বেশ অনুভব করিতেছিলাম যে, একটি সকৌতুক কুতূহল দৃষ্টি আমার অন্তস্তলে কি অন্বেষণ করিতেছে। বৌদিদি স্বল্পভাষিণী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উজ্জ্বল আনন্দ চঞ্চল, অন্তর্ভেদী চক্ষু দুটিকে আমি বড় ভয় করিতাম। তত ভয় আমার মনস্তত্ত্ববিদ্ উমেশদাদাকেও ছিল না। বলিলাম, 'বলাবলি নয়, দাদা, গল্প আমি লিখ্‌বই। তোমাকে ঠিক ক'রে দিতে হবে।'

এতক্ষণে বউদিদি বলিলেন, 'আমি তোমাকে নিতান্ত গো-বেচারী বলেই জান্‌তাম, ঠাকুর পো!' বলিয়া আমার দিকে এক পেয়ালা চা অগ্রসর করিয়া দিলেন। আমি সহাস্যে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দাদাকে প্রশ্ন করিলাম, 'এখন গোড়া আরম্ভ কি ক'রে করতে হবে, বল।'

দাদা বলিলেন, 'গোড়া? তা, গোড়া থেকেই গোড়া আরম্ভ করা ভাল। কিন্তু এখানেও এক

বিষণ্ণভাবে তিনি আমাকে লক্ষ্য করেন, আর মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন যার এত জোর যে, আমাকে চমকে উঠতে হয়।

এই দীর্ঘশ্বাসের কথায় উমেশদার উৎসাহ আবার সতেজ হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে খাড়া হইয়া বসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার স্ত্রী প্রেম করেন?'

আমি উত্তর দিতে না দিতে বউদিদি বলিলেন, 'করেন, করেন।'

প্রশ্ন।—কার সঙ্গে?

উত্তর।—একটা ভূতের সঙ্গে।

আমি হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলাম। দাদা পুনশ্চ জিজ্ঞাসিলেন, 'কখনও ভেবে দেখেননি?'

আমি বলিলাম, 'না।'

দাদা অনুরোধ করিলেন, 'একটু ভেবে দেখ না।'

বৌদিদি বলিলেন, 'দোহাই ঠাকুরপো, ভেবো না। ওটা ভারি বদ্ অভ্যাস।'

দাদা কহিলেন, 'তোমার স্ত্রীর মনের কথা কিছুই জান না?'

এবারেও বৌদিদি উত্তর দিলেন, 'হরি বল। আপনার মনের কথাই জানা যায় না, তা পরের মনের কথা।'

দাদা বলিলেন, 'আপনার মনের কথা না জানা যাক, পরের মনের কথা অনায়াসে বোঝা যায়। বিশেষ, তার আচরণ দেখে। আচ্ছা বল দিকি, তোমার স্ত্রী চাঁদ দেখে হাই তোলেন?'

বলিলাম, 'অত ক'রে কখন লক্ষ্য করি নি।'

'এগুলো খুব লক্ষ্য করা উচিত। আচ্ছা, ঐ যে দীর্ঘনিঃশ্বাসের কথা বল্লে, সেটা কি খুব গরম?

আমাদের পাড়ার বিধুবাবুর কথা মনে পড়িল। তিনি অ্যামেচার হোমিয়োপ্যাথ। একদিন আমার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছিল। আমার স্ত্রীর নির্বন্ধাতিশয্যে তাঁর কাছ থেকে একটু ঔষধ আনিতে গিয়াছিলাম। তিনি এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন যে, আমার মাথাধরা ত দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল—তার উপর আফিসের লেট্ হয়। এ দিকে পলাইবারও উপায় নাই। নাড়ী দেখিবার অছিলায় এমন করিয়া হাত ধরিয়াছেন যে, ছাড়ায় কার সাধ্য। অবশেষে বিস্তর কৌশলে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। তিনিও প্রশ্ন করিতে করিতে পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। 'ম'শায়! বলুন, বলুন, হাঁচলে বাড়ে কি কাসলে কমে? থেকে থেকে মরতে ইচ্ছা হয়?' 'আপাততঃ হচ্ছে বটে।' বলিয়া আমি ছুটিতে আরম্ভ করিলাম। বুঝিলাম, হোমিয়োপ্যাথীর ঔষধ যতই অবস্তু হউক, শাস্ত্রটা কিন্তু বেজায় বস্তু-তন্ত্র।

এ দিকে দাদার প্রশ্ন চলিতে লাগিল—'আচ্ছা, চাঁদ দেখলে কি অনেকক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন?'

উত্তর।—জানিনি।

প্রশ্ন।—ফুল পেলে কি করেন?

উত্তর।—গন্ধ শোঁকেন।

দাদা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি তা জানি। উঁকে আন্‌চান্‌ করেন কি না?'

'তা জানি নি।'

দাদা বলিলেন, 'কিছুই জান না, তবে লিখবে কি?'

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, 'তুমি যেমন বলে দেবে, তেমনি লিখব।'

দাদা খুসী হইয়া কহিলেন, 'সে ভাল কথা। আচ্ছা, আরও গোটা কতক কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার স্ত্রী সকালে উঠে কি করেন?'

আমি সলজ্জ ভাবে উত্তর দিলাম, 'উঠেই আমার পায়ের ধুলো নেন্‌।'

দাদা যেন অন্ধকারে আলো দেখিলেন। বলিলেন, 'পায়ের ধুলো নেন? তোমার কাছে যদি অপরাধীই না হবেন, তবে পায়ের ধুলো নেবার দরকার কি?'

আমি চমকিয়া উঠিলাম। দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তার পরে কি করেন?'

'তার পরে গোবর ছড়া দেন।'

'গোবর-ছড়া দেন? ওঃ, সংসারে ঘোরতর বিতৃষ্ণা! তার পর?'

আমার উত্তর দিতে আর মন সরিতেছিল না। তথাপি সংক্ষেপে বলিলাম, 'তার পর বাসি পাট, বাসন-মাজা, কাপড় কাচা, স্নান করে' ডাল-ভাত চড়ান।

'ডাল চড়িয়ে কি করেন?'

'ডালে কাটি দেন।'

দাদা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'বল কি! খামকা ডালে কাটি? এ ত ভাল লক্ষণ নয়। তার পর?'

'তার পর রান্না বান্না হলে আমি নেয়ে এসে '

'রোস, রোস, তাড়া কোর না! আচ্ছা, তুমি নেয়ে এসে ভাত চাইলে চিঁচিয়ে ওঠেন?'

না।'

'তবে শক্ত কাঠ হয়ে বসে থাকেন?'

'তাও না।'

'তবে কি করেন?'

'ভাত বেড়ে দেন।'

উমেশদা যেন কিছু নিরাশ হইলেন। অনেকক্ষণ কি ভাবিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচ্ছা, দুপুর বেলা কি করেন?'

'দুপুর বেলা ত আমি বাড়ী থাকি নি।'

'ওহো, তা বটে। আচ্ছা, রবিবার?'

'রবিবার খেয়ে দেয়ে একটু পড়েন-টড়েন।'

'কি—কি—কি বই পড়েন?'

'এই রামায়ণ, মহাভারত।'

উত্তরে উমেশদা বোধ করি সন্তুষ্ট হইলেন না। তথাপি প্রশ্ন করিলেন, 'রামায়ণের কোন্‌খানটা তাঁর খুব ভাল লাগে—বলতে পার ?'

'লঙ্কা-দহন, আর সীতার অগ্নিপরীক্ষা।'

'আচ্ছা, আগুনের উপর তাঁর এত ঝোঁক কেন বলতে পার ?'

'না। বোধ হয়, ছেলেবেলা আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় বলে।'

'আচ্ছা, যাক। সন্ধ্যেবেলা কি করেন ?'

'কাপড়-চোপড় কেচে এসে তুলসীতলায় প্রদীপ দেন, তার পর শাঁক বাজান।'

উমেশদা আবার ঘোর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। অনেকক্ষণ পরে প্রশ্ন করিলেন, 'বিবাহের পূর্ব্বে খুব বাল্যকালে তোমার স্ত্রীর কোন রকম ভালবাসা টাসা ছিল, বলতে পার ?'

'তা পারি।'

'কি বল দিকি ? কার উপর ?'

'কদ্‌বেল পেয়ারা, কাঁচা কুল, আর একটা মেনি বেরালের উপর।'

'আর কিছু না ?' তার পর একটু ভাবিয়া বলিলেন, 'কথাটা কি জান, সতীশ, বাল্য-প্রণয় বলে একটা জিনিস আছে। ছেলেবেলা কাউকে ভালবাসতেই হবে, আর তার জন্যে আজীবন দীর্ঘশ্বাস আর চোখের জল ফেলতেই হবে।'

বৌদিদি এতক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া আমাদের প্রশ্নোত্তর শুনিতেছিলেন। দাদার শেষ মন্তব্য শুনিয়া তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'ওমা! কি ঘেন্না!'

দাদা তাঁর দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন; 'এতে ঘেন্না, পিত্তি, লজ্জা, কিছুই নেই। এই হ'ল প্রকৃতির ধর্ম্ম। একেবারে নিরঙ্কুশ, বিবশ প্রকৃতি। গীতায় আছে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, 'তুমি হাজার মনে কর, যুদ্ধ করবে না, কিন্তু তোমার প্রকৃতি তোমায় যুদ্ধ করাবে।' সেই রকম, তুমি হাজার চেষ্টা কর, প্রেম করবে না, কিন্তু তোমার প্রকৃতি তোমায় করাবে। তবে সে কথা সহজে স্বীকার করতে কেউ চায় না। এক আয়েষাই কেবল বলেছিল, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।'

লজ্জায় বৌদিদির মুখ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'রাম রাম!'

দাদার চরিত্র-বিশ্লেষণ, তাঁর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা, দৃঢ় অভিমত, যুক্তির অব্যভিচারিণী গতি, আর অকাট্য প্রমাণপ্রয়োগ সহ তাঁহার উক্তির প্রতিষ্ঠা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম, আমার বুকের ভিতরটাও কেমন করিতে লাগিল। ভয়ে ভয়ে বলিলাম, 'দাদা, কোনও কোনও ক্রিটিক্—'

ক্রিটিক শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই দাদার মুখখানা ঘৃণায় বিকৃত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'ক্রিটিক্, ক্রিটিক্। ক্রিটিকের মানে জানো ? ক্রি ধাতু, 'টিক্' প্রত্যয়। ওদের কাজই হচ্চে কেবল মাথার উপর টিক্ টিক্ করা।'

বউদিদি বলিলেন, 'তা করুক। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষকে এত ক'রে ভয় দেখাচ্ছ কেন ?'

ছেলেমানুষ। বৌদিদি আমার সমবয়সী। বরং দু এক বছরের ছোট বৈ বড় নয়। কি

দাদা অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'এত সোজা কথাটাও আবার ব'লে দিতে হবে? বুঝ্‌তে পারছ না, ওখানা তার স্ত্রীর ছবি।'

'কার স্ত্রীর ছবি? বৌয়ের?'

উমেশদা বৌদিদির এই বিদ্রূপ—বিদ্রূপ বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। কহিলেন, 'না—বৌয়ের যে বাল্যপ্রণয়ী ছিল, তার স্ত্রীর।'

'লটারীর ভিতর এল কেমন ক'রে?'

'এমনিই ত আসে। একেই বলে দৈব-যোজনা—'

দাদা আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু বৌদিদি তাঁহাকে একটি ছোট্ট 'তা বটে' বলিয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন।

'কিন্তু, দাদা, বৌ ছবিখানার দিকে অমন কট্‌-মট্‌ ক'রে চাইত কেন?' বলিয়া আমি একটা সদুত্তর-প্রত্যাশায় তাঁহার মুখ চাহিয়া রহিলাম।

দাদা বলিলেন, 'রোষে, ক্ষোভে, রাগে। তোমার বাস্তু-ভিটাটিতে যদি কেউ আগুন লাগায়, তা হ'লে তোমার মনটি কেমন হয়, বুঝে দেখ।'

এই আগুনের উপমায় আমার সত্য সত্য মনে হইল, আমার বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। অনু—আমার অনু! আর আমার কি? সংসারে সব প্রতারণা! নিবিড় মিলনের মাঝে, যেখানে দুইটি হৃদয় একতারে বাজে, সেখানেও প্রতারণা। যাকে বুকের উপর রেখে তোমার তৃপ্তি হয় না; মনে হয়, অন্তরে—আরও অন্তরে—আসুক, সেই সময় সে কামনা করছে আর এক জনকে। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কেরাণী-জীবনে এ কি কাব্যের উচ্ছ্বাস! বাল্য-প্রণয়, প্রতারিত পতি, লটারীর ছবি, ঈর্ষান্বিতা স্ত্রী—কেরাণী জীবনে এ কি কাব্য! তাও আবার অতি কুৎসিত। উমেশ দাদাকে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'দাদা, এর পরিণাম কি হবে, এখন বলুন।'

দাদা বলিলেন, 'সেটা ভাব্‌তে হবে। তুমি উন্মাদ হ'তে পার, তোমার স্ত্রী সন্ন্যাসিনী হ'তে পারেন। এমন কত কি হ'তে পারে। একটা দিন আমায় চিন্তা কর্‌তে দাও, পরশু এস, বল্‌ব।'

'বৌদিদি, আমি চল্‌লুম।'

'না, ঠাকুরপো, জল খেয়ে যাও।'

'খাওয়া! গলা থেকে সমস্ত বুকটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। 'আজ মাপ কর, বৌদিদি! পরশু আস্‌ব' বলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

৬

সে দিন রাত্রে কেবলই স্বপ্ন দেখিয়াছি। কখনও দেখি, অনু একগা গয়না পরিয়া ছাই মাখিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছে। কখনও দেখি, আমি বিকট উন্মাদ হইয়া উমেশ দাদাকে খুন করিতে

গিয়াছি। বৌদিদি আমাকে বলিতেছেন, 'দোহাই ঠাকুরপো, আমাকে মনস্তত্ত্বের হাত থেকে বাঁচাও।'

একটা দিন ভগবানের কাছে নিরন্তর প্রার্থনা করিয়াছি, হে ভগবান্, আর একটা দিন আমার জ্ঞান রাখ, পাগল করিও না। জীবনে যে কাব্যের সূচনা করিয়াছি, তাহার পরিণাম কি হইবে ?

নির্দ্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যার পর আমি উপস্থিত হইতেই দাদা বলিলেন, 'সতীশ নাকি ? দেখ, প্রস্তুত হও, তোমার বৌকে মেরে ফেল্‌তে হবে।'

আমি ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। মেরে ফেল্‌তে হবে! আমার অনুকে! এই সকল গল্পলেখক, মনস্তত্ত্ববিদ্, এদের কি একটুও দয়া-মায়া-মমতা নাই! না হয়, গয়নার কামনা করে বলিয়া একটু অভিমান করিয়াছি। না হয় মাষ্টারী করিতে বলায় একটু রাগই করিয়াছি। তাই বলিয়া হত্যা ? আর কথাটা বলিল, যেন বলিতেছে, 'প্রস্তুত হও, তোমাকে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে হইবে।' উমেশ দাদার মুখে একটা পৈশাচিক হাসি দেখিয়া আমার সমস্ত শরীর ঝিম্-ঝিম্ করিতে লাগিল। বোধ করি, আমার তখনকার অবস্থা দেখিয়া আমার প্রতি চির-করুণাময়ী বৌদিদি বলিলেন, 'সত্যিকার বৌ নয়, ঠাকুরপো! তোমার গল্পের বৌকে মেরে ফেল্‌তে হবে। কিন্তু তাই বা কেন ? সেই আপুদে ছবিখানাকে পুড়িয়ে ফেলে গঙ্গাস্নান ক'রে বৌকে ঘরে আন।'

অমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, 'বৌকে ঘরে আন! তুমি সব কথা কেমন ক'রে জান্‌লে, বৌ-দি ?'

বৌদিদির অধরে ঈষৎ হাসির আভাস দেখিলাম। তিনি বলিলেন, 'হাত গুণে।' কিন্তু পরক্ষণেই সে চিরফুল্ল অধর দুটি শুষ্ক হইয়া উঠিল। আমার উপর কঠোর দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 'এ সব কি জোট পাকিয়েছ, ঠাকুরপো ? এই চিঠিখানা পড় দিকি। চেঁচিয়ে পড়। তোমার একটু প্রায়শ্চিত্ত হোক।'

চিঠিখানি ডাকে আসিয়াছে, খামে বৌদিদির শিরোনামা। অনুর হাতের লেখা। খুলিয়া পাঠ করিতে আমার বুকের ভিতর টিপ্-টিপ্ করিতে লাগিল। সত্য সত্যই কি সে সম্যাসিনী হইবে ? সেই কথা বৌদিদিকে লিখিয়াছে ? আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বৌদিদি ধমক দিলেন, 'পড় না। চেঁচিয়ে পড়।'

আমি পড়িলাম :—

"দিদি!

আমার কপাল ভেঙেছে। বাপের বাড়ী আস্‌বার সময় বরাবর তোমাকে প্রণাম করিয়া হাসিমুখে বিদায় নিয়ে এসেছি। কিন্তু এবার পারিলাম না। উনিও সে অবসর দেন নি। আর আমিও তোমার কাছে গেলে চোখের জল সাম্‌লাতে পারিতাম না। তাই বিদায় লইয়া আসা হয়নি। বিশেষ এ বিদায় চির-বিদায়। তুমি বৈ আর ত আমার কেউ নাই, দিদি, যে দুঃখিনীর দুঃখ বুঝবে। আমি অন্ন-বস্ত্রের দুঃখ বল্‌ছি না। সে দুঃখ আমার নাই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে শাক-ভাত

খেয়ে দুবেলা আঁচাচ্ছি। তার উপর আমার দেবতার মত স্বামী। কিন্তু সেই স্বামী আমায় পর করেছেন।

'আমি আর স্বামীর মনে স্থান পাই না। একখানা ছবি অষ্টপ্রহর তাঁহার হৃদয় অধিকার ক'রে য়েছে। সেই ছবিকে তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে দেখেন। তার সঙ্গে কথা কহেন। কিন্তু সে কি ধু ছবি? তা হইলে আমাকে মিথ্যা অছিলা করিয়া তাড়ালেন কেন? এইবার বুঝি যার ছবি, াকে ঘরে আনিবেন। তা আনুন না। একটা ছাড়িয়া দশটা আনুন না। তবে আজকাল াত-কাপড় অগ্নিমূল্য, সুতরাং ওরকম সখের একটা সীমা থাকা ভাল। তা না হয়, এক জনকেই াখুন। আমরা সীতা-সাবিত্রীর জাত, তার উপর কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে। সেই মান্ধাতার ামলের রক্তের সঙ্গে আমরা এ সব সহ্য করিবার শক্তি পেয়েছি। তাই বলি, আমাকে তাড়ালেন কেন? সই জীর্ণ বাড়ী—আমার পক্ষে তা ইন্দ্রালয়—তার এক কোণে কি আমার একটু স্থান হইত না। ার রাঁধবার, বাসন মাজিবার এক জন ঝি ব্রাহ্মণী কি দরকার নাই? আমাকে বললেন, জনিস-পত্তর দিন দিন চড়ছে, চলবে কি ক'রে? বাড়ীর খানিকটা ভাড়া দিতে হবে। কিন্তু লাচলির সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ কি? তিনি কর্তা হলেও বাড়ীর ভেতুড়ে। মাস গেলে টাকা কটি নে দেন। কখন্ তাঁর কাপড়-জামা কিনিতে হইবে, কবে চুল ছাঁটিতে হবে, তাও আমাকে দখতে হয়। তাঁর চলাচলির এত ভাবনা কেন? সত্য বটে, অনটনের সঙ্গে আমাকে অষ্ট-হর লড়াই করতে হয়। এক পলা তেল, এক চিমটি লবণ কেমন করিয়া বাঁচাব, তাও াবতে হয়। সত্য বটে, এক দিন বলিয়াছিলাম, একটা মাষ্টারী জোটে না? কিন্তু সে কি ামার জন্যে বলেছিলাম? এদানী তাঁকে যা খেতে দিতাম, তিনি সোনা-মুখ ক'রে খেয়ে যেতেন টে, কিন্তু কি দিয়ে তাঁর সামনে ভাতের থালা ধ'রে দিতাম, সে ত আমি জানি। ামার দুটি মাকড়ি, তিনটি সোনার ফুল ছিল; যত দিন পেরেছি, তাই বেচে চালিয়েছি। সগুলি গেলে, অন্ধকার দেখেছিলুম—সত্যই যে তাঁকে নুন দিয়ে ভাত বেড়ে দিতে হবে। এক াসায় একফালি কুমড়ো—প্রতিপদের চাঁদের মত, আর দেড়গাছি সজনে খাড়া। দিদি, তুমিই ল। মেয়েমানুষ নুন-ভাত খেতে পারে, পুরুষমানুষে কি তা পারে? তাই বড় দুঃখে বলেছিলুম, কটা মাষ্টারী জোটে না? বলেছিলেন, হোটেলে খাবেন। কখন তা অভ্যাস নেই। তুমি ার ক'রে এক জন বামুন রাখিয়ে দিয়ো। আর, দিদি, তাঁর শরীর না খারাপ হয়, একটু দখো; অন্ততঃ যত দিন না নূতন বৌ আসে। কিন্তু মনে হয় না, আমার মতন ক'রে কেউ তাঁকে ত্ন করবে। তাঁর চরণে দাসীর প্রণাম দিয়ো, আর তুমি ও বটঠাকুর আমার প্রণাম নিয়ো। তামার কাছে আমি চির-বিদায় লইতেছি। স্বামীর পরিত্যক্ত শরীর আমি যেমন ক'রে পারি াত করিব। ইতি।'

বৌদিদি বলিয়া উঠিলেন, 'বালাই, ষাট্।'

আমিও চোখ দুটা মুছিয়া বলিলাম, 'বৌদিদি, আমি বড় পাষণ্ড।'

'তা আর একবার ক'রে বলতে। কিন্তু আজ এখনি সেটা জানতে পারলে কেমন ক'রে, শুনি?'

'সে যখন আমাকে গয়না বেচে খাওয়াচ্ছিল, আমি তখন মনে করছিলুম, সেই গয়না-পরা ছবিখানা দেখে তারও—'

বৌদিদি আমার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিলেন, 'তারও গয়নাপাতি পর্‌বার সাধ হয়েছে ?'

লজ্জায় আর আমার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। বৌদিদি বলিলেন, 'তোমাদের মনস্তত্ত্ব তোমরাই নিয়ে থাক, ঠাকুর-পো—'

বৌদিদির কথা শেষ না হইতে হইতে দাদা বলিলেন, 'কেন, আমার ভুল হ'ল কোন্‌খানটা ?'

ইতিমধ্যে আমি উঠিয়া পড়িলাম। বৌদিদি জিজ্ঞাসিলেন, 'কোথা যাও, ঠাকুর-পো ?'

'অমুকে আন্‌তে।'

'এখন নৌক পাবে ?'

'না পাই, সাঁৎরে যাব, বৌদি।'

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
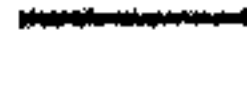
শারদীয় উপহার

আশ্বিন মাস ; বাগানের ফুলে, বাতাসের চাঞ্চল্যে, আকাশের নীলিমায়, দিগন্তের বর্ণবিন্যাসে শরতের শোভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুকুমারী দেবী, অপরাহ্ণপূর্ব্বে মুক্ত বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া, তাঁহার নব-রচিত একটি গানে সুর বসাইতেছিলেন। সুকুমারী কেবল কবি এবং গায়িকা নহেন ; গানের সুরও রচনা করিতে পারেন। তাঁহার সুরযত্নে গানগুলি ক্রমশঃ যখন এক একটি মোহনবেশধারী মূর্ত্তিমন্ত নটরূপে জীবন্ত হইয়া উঠে, তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যায়! কবিকণ্ঠের মৃদুগুঞ্জন তখন মুক্ত উচ্ছ্বাসে বীণার রবে গৃহ ঝঙ্কৃত করিয়া তোলে।

আপাততঃ তিনি মৃদুস্বরে গায়িতেছিলেন—

মরি— শারদ সমীর পাগল ভোলা
দিয়ে যায় তার পরশদোলা।
পাতা পড়ে ঢ'লে, পাখী সুরে বলে,
শেফালি হেসে লোটে গাছের তলা।
কি জানি কি কথা আকাশে রটে!
আগুন ধ'রে ওঠে নীরদজটে,
দিক্‌-ভুরু বাঁকা—ইন্দ্রধনু আঁকা।
মরি রে! প্রভাত এল নাকি সাঁঝের বেলা।

শেষ দুইটি ছত্রের সুর তখনো ঠিক মনের মত তাঁহার হয় নাই,—সহসা কাহার দীর্ঘশ্বাসের শব্দে চমকিয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, বিনোদ দাঁড়াইয়া আছে। বিনোদ তাঁহার দূর-সম্পর্কীয় দেবর,—কিন্তু স্নেহাস্পদ অন্তরঙ্গ আত্মীয়।

সুকুমারী তখন গানের খাতাখানা পাশের টেবিলে রাখিয়া বলিলেন—"অমন ম্লান মূর্ত্তি যে? কিছু নতুন খবর আছে নাকি?"

বিনোদ দেয়ালের ধারের কৌচখানার শুইয়া পড়িয়া খুব জোরে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"ফুরফুরে বাতাস, ফুলের গন্ধ, পাখীর কূজন, কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না আর—বৌদি।"

সুকুমারী হাসিয়া বলিলেন—"ভাল লাগ্‌বে গো, একটু ধৈর্য্য ধর, চন্দ্রোদয় হ'ল ব'লে।"

বিনোদ চোখ বুঝিয়া—দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "না বৌদি—সে আশা নেই, চাঁদের আলোর এখানে প্রবেশ-নিষেধ, অন্ধকার, বড় অন্ধকার।"

সুকুমারী হাসিমুখখানা গম্ভীর করিয়া কহিলেন—"উঃ কি ভয়ানক! তা হ'লে বিজলীর আলোই একমাত্র ভরসা এখন।"

বিনোদ ইতিপূর্ব্বে বহুবার হৃদয় হারাইয়াছে। বালককাল হইতেই প্রেমদেব তাহার প্রতি সুপ্রসন্ন।

প্রথম সে 'লভে' পড়ে—এক বয়োজ্যেষ্ঠা বিদেশিনীর সহিত, ইডেন গার্ডেনের রাস্তায়। তখন সম্ভবতঃ বিনোদের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষের অধিক হইবে না। যুবতীর জাপানী কুত্তাটি আর একটু হইলে গাড়ী চাপা পড়িত। বিনোদ তাহাকে অক্ষতশরীরে তুলিয়া আনিবামাত্র যুবতী যখন আনন্দ-আবেগপূর্ণ হাসিতে, সাদরে করমর্দ্দন পূর্ব্বক চিরকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, তখন সেই প্রকাশ্য হাসির বিনিময়ে বালক অপ্রকাশ্যে চির-দাসখতে তাঁহার নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া ফেলিল। এই বিক্রীত হৃদয়ে পুনরায় সে দখল পাইল কিরূপে, সে খবর আমরা পাই নাই, তবে এ ঘটনার পরেও প্রেমপণ্যশালায় পুনঃপুনঃ যে বহুকী আঁচড় পড়িয়া আসিতেছে, ইহা আমরা জানি।

তাহার দ্বিতীয়বারের ভালবাসা এমন নীরব দান নহে, সাংঘাতিক কল্পনা-পূর্ণ। বন্ধুবর যামিনীমোহনের বাগ্‌দত্তাকে দেখিবামাত্র সে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়িল যে, কি উপায়ে বন্ধুকে ভবসিন্ধুপারে রাখিয়া নিজে তাহার আলপনা-আসনে চড়িবে, এই জল্পনায় কিছু দিন বৌদিদিকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও অবশেষে নির্ব্বিঘ্নে যখন বন্ধুবরের বিবাহ হইয়া গেল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বিয়ের পরিবর্ত্তে বি-এটা পাশ করিয়া লইয়া মনের দুঃখে সমুদ্রে ভাসিয়া পড়িল। সুকুমারী বাজি রাখিলেন, বিলাত হইতে কখনই সে আস্ত বা একা ফিরিবে না। কিন্তু সংসারে প্রায়ই অসম্ভব যাহা, তাহাই সচরাচর ঘটে। সে দেশের জল-হাওয়া বিনোদের পক্ষে বিষস্য বিষমৌষধং স্বরূপ দাঁড়াইল। কামরূপ-নগরীর অপূর্ব্ব সুন্দরীর কটাক্ষবাণ এবং সুকুমারীর ভবিষ্যদ্বাণী একই সঙ্গে ব্যর্থ করিয়া বিনোদ কয়েক বৎসর পরে নিরাপদে যখন দেশে ফিরিল, তখন পরাজিতা সুকুমারী নিজেই জয়ধ্বনি তুলিলেন। কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমুদ্রের ঘূর্ণীপাকের মধ্যেও যে মাথা অচল ছিল, দেশের কঠিন মাটীতে পা দিবামাত্র আবার তাহা ঘুরিয়া উঠিয়াছে।

এবার বিনোদের মনোহরণ করিয়াছে, একটি নাবালিকা,—কায়স্থ ব্যারিষ্টার-কন্যা। বয়সে ইনি দ্বাদশী-শশিকলা, এখনো স্কুলের বালিকা; শাড়ীর পরিবর্ত্তে ফ্রক পরেন, এবং পিয়ানো বাজাইতে অনুরুদ্ধ হইলে সারেগামা-প্রাক্‌টিস শুনাইয়া অতিথি-অভ্যাগতের মনোরঞ্জনে কুণ্ঠাবোধ করেন না। ইঁহার বাজনার সমজদার বিনোদের মত দ্বিতীয় কেহ নাই। বিনোদ এই প্রাক্‌টিস্ শুনিতে শুনিতে ভাববিভোর হইয়া ভাবেন—অসবর্ণ-বিবাহ ব্যতীত ভারতের আর গতিমুক্তি নাই।

কবিতাদি বিসর্জ্জন দিয়া উল্লিখিত দেশহিতকর সংকল্পে প্রবন্ধাবলী লেখাই যে বৌদিদির জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সেই দিন হইতে সুকুমারী দেবী অহর্নিশি এই কথাই শুনিতেছেন। আর কেহ হইলে এই উপদেশের জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিত, কিন্তু সুকুমারী নীর ত্যাগ করিয়া ইহার মধ্যকার ক্ষীরটুকুই উপভোগ করেন। গুণী বটে। যাক্।

এতদিন তাঁহাদের গল্পের ছত্রে ছত্রে বৌদির মুখে বিজলীবালার নামটি উচ্চারিত না হইলে বিনোদের রাঙা মুখ কালো হইয়া উঠিত, কিন্তু আজ এ নামের মাহাত্ম্য হঠাৎ তাহার মন হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সুকুমারীর ঠাট্টায় সে রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল,—"কেন যে লোকে বলে, মেয়েরা কোমলপ্রাণ, তা বুঝতেই পারিনে। আমি ত চিরদিন বিপরীত প্রমাণই পাচ্ছি। তোমাদের ঠাট্টার জ্বালা বিষের জ্বালার চেয়েও ভয়ানক।"

সুকুমারী হাসিয়া কহিলেন, "বিরহের জ্বালার চেয়ে ত নয়। ওগো শর বিদ্ধ কুরঙ্গ-প্রবর, আহা ম'রে যাই! হাত বুলিয়ে দেব বুকে? কিন্তু তাতে ত ঠাকুরপো, তোমার প্রাণের জ্বালা নিবৃত্তি হবে না। যদি বল ত বরঞ্চ তোমার স্পর্শমণির সন্ধানে ফিরি।"

"তায় কাজ নেই গো কাজ নেই, আমার বিরহই ভাল।" বলিয়া বিনোদ গান ধরিল—

"সখি, মোর বিরহ ভাল—
মিলনেতে পুরে সাধ, আছে তাহে অবসাদ—
কে জানে উচ্ছ্বাস স্রোত বহে কি মিলালো।
সখি, মোর বিরহ ভাল।
তীব্র ব্যথাভরা স্মৃতি, তৃষাভরা সুখ অতি,
চির সচেতন প্রীতি চির-দীপ্ত আলো—
সখি, মোর বিরহ ভাল।"

ধৈর্য্যসহকারে শেষ পর্য্যন্ত গানটি শুনিয়া অবশেষে সুকুমারী কহিলেন—"সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিজুলী-বাতির আলোতে তোমার ঘরখানি বেশ ত আলোকিত দেখেছি। রাতের কোন্ প্রহরে কোন্ নিঠুর এসে তার আঙ্গুলের ইঙ্গিতে সেই স্থির-দীপটি যে নিভিয়ে দিলে, আর তুমি এমন বিরহাকুল হয়ে পড়্‌লে, তা ত বুঝ্‌তেই পার্‌ছিনে। ওঃ, কাল বুঝি ক্যালকাটা ক্লবে ইভনিংপার্টি ছিল?"

বিনোদ হাসিয়া উঠিল। সুকুমারী বলিলেন, "বল ভাই, ভাল ক'রে তোমার স্বপ্নরাজ্যের বিবরণটা। শুনেও তৃপ্তিলাভ করি।"

"সত্যিই বৌদি, সে স্বপ্নরাজ্য! বাগানে যেন নন্দনের শোভা ফুটেছিল।"

"পারিজাতের খুবই ছড়াছড়ি ছিল বোধ হয়?"

"সে খবরটা বল্‌তে পার্‌ছিনে।"

"তা ত বটেই। কেমন ক'রে বল্‌বে? তোমার নয়নে যে তখন স্বপ্নরাণী মোহ-কাজল পরাচ্ছিলেন, অন্য দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল না ত।"

"স্বপ্নরাণী! নামটি চমৎকার appropriate হয়েছে। কবি কি না। কি বল্‌ব বৌদি, কি যে সুন্দর তার কথার ভঙ্গী,—কি মধুর হাসি!"

সুকুমারী একবার মুখ ফিরাইয়া চকিতদৃষ্টিতে চারি দিক্ দেখিলেন, বিনোদ, ত্রস্ত-ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "দাদা আস্‌ছেন নাকি?" সুকুমারী কষ্টে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া কহিলেন, "না, দেখ্‌ছি আশে-পাশে কেউ নেই ত; এ কথা বিজুলী বেচারীর কানে উঠ্‌লে তার কি নিদারুণ অবস্থাই হবে।"

বিনোদ রাগ করিয়া কহিল, "সেই এক কথা। আমি চল্লুম তবে। সব সওয়া যায়, সরস কথা বিরস করে তুল্লে বড় জ্বালা ধরে।"

বিনোদ উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া সুকুমারী বলিলেন—"প্রতিজ্ঞা করছি

Raja
Maharaj
C S I
C I E
JAN
1
Congratulate you Maharaja
but damn it – where are
you ?

অভিনন্দন

ঠাকুরপো, সে কথা আর তুলবে না, সে নাম আর করবে না; সে রূপ আর দেখবে না, তুমি বল তোমার চন্দ্রাবলীর কথা। এই প্রথম দেবীদর্শন না কি ?"

বিনোদ মুখে তর্জ্জনী লাগাইয়া বলিল, "আমি মৌনব্রত অবলম্বন করেছি!"

সুকুমারী বলিলেন, "আচ্ছা, বেশ; তোমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করাটাই আমার ভুল হয়েছে, দ্বিতীয়বার দেখলে ত এ Charm তার থাকত না।"

বিনোদ দুই হাতে বুক চাপিয়া অভিনয় করিয়া বলিয়া উঠিল, "সেটি তোমার একেবারেই ভুল। তার মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে চির মুদ্রিত হয়ে গেছে,—

তারকা হারাতে পারে ভাতি,
দিবসের অবসানে নাহি পারে আসিতেও রাতি।
কিন্তু সখি এ হৃদয়-মাঝে, তার তরে যে প্রেম বিরাজে,
রবে তাহা চির জ্যোতির্ম্ময় অমর অক্ষয়;—
জন্মজন্মান্তরে তাহা জীবনের সাথী।"

সুকুমারী কহিলেন—"তবু ভাল; শুনে বড়ই সুখী হলাম, অভিনন্দন করি।"

বিনোদ অভিনয়ের সুর ছাড়িয়া স্বাভাবিক ভাবে কহিল—"দস্তুর রক্ষা কর তবে; একটি গান গাও বৌদি; জান ত, গান কবিতাই চিরকাল অভিনন্দনের ফুলচন্দন।"

"তথাস্তু" বলিয়া সুকুমারী গান ধরিলেন—

"একবার চেয়ে শুধু নয়নকোণে,
কি সুধা ঢালিয়া গেল হৃদয় মনে।
কি মদির মোহে আমি, মগন দিবসযামী,
চির-প্রেমে মধু স্বপনে,—
কি কুহক জানে সখি, মনোমোহনে।"

বিনোদের প্রতি ঠাট্টাচ্ছলেই কিছুদিন পূর্ব্বে এই গানটি তিনি রচনা করিয়াছিলেন। চোখ বুজিয়া বিনোদ গানটি শুনিল। গান শেষ হইলে চক্ষু মেলিয়া হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল "Thank you Madam, প্রাণের কথা নিঙড়ে যেন সেই রসে গানটি রচনা করেছ। বলব কি বৌদি, প্রথম পরিচয়ে তিনি যখন মৃদুহাস্যে হাতখানি বাড়িয়ে how do you do বল্লেন, তখন সত্যিই আমার বুকের মধ্যে সুধার ঢেউ উথলে উঠেছিল—"

"একেবারে হাউডুডু ?" শুনে যে আমার বুকের রক্ত জমাট বেঁধে উঠছে। তার পর ?

"কি আর বলব, যদি স্বর্গ কোথাও থাকে ত, এ তাই। কল্পনা কর বৌদি, দিকে দিকে চাঁদের

৮

আলো, গাছে গাছে ফানুসের আলো, 'আর সব 'আলো ম্লান করে' বাগান ভরা পরীদের রূপের আলোক চমক দিচ্ছে।"

"আহা, আহা! তোমার গায়ে না জানি কত ফোস্কা পড়েছে!"

"তুমি কি রকম কবি বৌদি! স্বর্গের আলোতে কি জ্বালা আছে? সেখানে আলো জ্বালাশূন্য, ফুল কণ্টকবিহীন, আর চাঁদগুলি সব নিষ্কলঙ্ক! সেই চাঁদ পরীদের পোষাকে ঝলমলের ঝলক, আর তাহতে ফুলের সুগন্ধ উথলে উঠছিল! তখন সে শোভায়—"

"মন মধুকর সব আটকা প'ড়ে গেল বুঝি? সৌভাগ্যবলে তুমি জীবন্ত স্বর্গ লাভ করলে?"

"স্বর্গলাভ করিনি বৌদি—তা হ'লে এ গল্প কে করত তোমার কাছে? জীবন্তে স্বর্গামৃতের আস্বাদ পেয়েছি।"

"বেশ ভাই! তোমার পরীটি ঠাকরুণ, নীল, লাল, না পীতবসনা?"

"তুমি ত বলেছ ভাই, তিনি স্বপ্নপরী, স্বপ্নের রং ত বহুদিন থেকেই নিরূপণ করা আছে, তিনি ছায়াবসনা।"

"ছায়াপরী? বেশ! হাউড্রুতে তোমাকে মায়ামগ্ন করেই ছায়ালীন হলেন নাকি?"

"ছায়া এখন কায়াবদ্ধ, আর কি সহজে উড়তে পারেন? আমি তাঁকে বাহুপাশে বেঁধে কাননহ্রদের একখানি নৌকাতে উঠে পড়লুম।"

"হ্রদের জলে তখন বোধ হয় আনন্দসাগরের ঢেউ খেলতে লাগলো, আর তোমরা দুটিতে কূলের পথ ভুলে তরঙ্গরঙ্গে অকূলে ভেসে পড়লে?"

"দুঃখের বিষয়, তা পারিনি ভাই, কূলের মুখেই তোমার গানটি ধরেছিলুম।—

বিশ্বভুবনের রূপরত্নখানি,
তাহাতে বিরাজে, সে মোর তরণী,
আমি তাহারে বাহি—আর কি চাহি?
সে আমার, আমি তার, আমার কি নাহি।"

"ছায়া-পরীর কৃপায় তা হ'লে তুমি বাসনামুক্ত হয়ে পড়েছ দেখছি।"

"চুপি-চুপি স্বীকার করি, হে মাদার সুপীরিয়ার, মুক্তিবারির ছিটা বর্ষণ কর, আমার পাপভারাক্রান্ত মস্তিষ্কে;—মুখে ঐ গানটি গাচ্ছিলেম যখন আমি—তখন কিন্তু মনের মধ্যে আমার একটি সাংঘাতিক বাসনার দোলন চলেছিল। অনুমান করতে পার কি বৌদি, সেটি কি?"

"সেই অকূল আকুল সুখে আনন্দতরঙ্গসাগরে বুঝি ডুবে মরতে সাধ হচ্ছিল?"

"না ভাই, তোমরা কবি মানুষ, তোমাদেরই সুখের সময় মরতে ইচ্ছা করে; আমরা কিন্তু সুখে বাঁচতেই চাই। আমার তখন কি ইচ্ছা করছিল, শুনবে? নৌকাটা কোন রকমে উল্টে দি—উপন্যাসের নায়করূপে জল থেকে তুলে যদি ঐ নীলনয়নার হৃদয় জয় করতে পারি।"

"হ্যাঁ, তা হলেই উপন্যাসটা ঠিক জমতো বটে। তা ত আর হয়নি, এখন সাদা ভাষায় বল দেখি, সে নীলনয়না সুন্দরীটি কে?" কি জাতি কি নাম ধরেন কোথায় বসতি করেন? কোন্ সিন্ধুপারের বিদেশিনী তিনি?"

"বিদেশিনী! তাহ'লে টেম্স নদীর জলেই ত ঝাঁপ দিতে পারতুম।"

কিন্তু, নীলনয়ন, হাড্ডুড্ডু এ সব কিছুই ত স্বদেশিনীর লক্ষণ নয়?"

"অয়ি রূপাভাগিনি, মুগ্ধতমে, চিরকালই ফাটা দর্পণের ভিতর দিয়ে নিজেদের রূপ তোমরা দেখে থাক, তাই কখনই ঠিক চেহারাখানি ধরতে পার না; কখনও বা অতিরঞ্জিত, কখনও বা বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখতে পাও। কিন্তু জেনে রাখ, আমাদের চোখে তোমরা সকলেই সুনীলনয়না।"

"সত্য নাকি! বেশ, তাতে ত আমার আপত্তি নেই; তোমাদের রুচিও ভাল।"

"তবে আপত্তিটা কেবল বুঝি হাড্ডুড্ডুতে?"

"সত্যি কথা যদি বল্‌তে হয়, আমরা বাবু সেকেলে মানুষ, হাড্ডুড্ডুতে আমরা চম্‌কে যাই, নমস্কার-প্রথাই আমাদের ভাল ব'লে মনে হয়।"

"ওগো সেকেলে ঠাকরুণ, ঐটেই হলো একেলে; আমাদের কোটর থেকে টেনে বার ক'রে তোমরা জনকতক দুঃশাসনপন্থী ওকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছ; ও বেচারা ডাক ছেড়েছে ত্রাহি ত্রাহি।'

"বটে! আর তোমরা বুঝি শ্রীকৃষ্ণাবতার।"

"তা যাই বল; আমরা ত তোমাদের খাতিরে আর অসময়ের পুরাতন বন্ধুকে ত্যাগ করতে পারিনে। তোমার নমস্কার-প্রথাটা এ হিসাবে—হোয়েছেন,—একেলেরও একেলে; আর হাড্ডুড্ডুটা বিলেত ফেরতের চির-ন্তন সম্ভাষণপ্রথা।"

সুকুমারীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "এক জন যুবতী মেয়ের অজানা পুরুষের সঙ্গে নৌকায় চড়ে বসা,—এটাও কি তোমাদের চিরন্তন প্রথা নাকি? এ সব শুন্‌লে আমার এমন রাগ ধরে, মন এমন খারাপ হয়ে যায়!"

"আর আমারও এমন রাগ ধরে তোমার এই রকম গোঁড়ামিতে। এ দিকে তোমরা চাও love marriage অথচ দুজনের মেলামেশার opportunityটুকুও দিতে নারাজ! এমন illogical! একেই বলে স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী!"

"ঠিক উল্টো! আমরা চাই সংযম, আর তোমরা চাও উচ্ছৃঙ্খলতা, হাড্ডুড্ডু ক'রে নৌকা চড়ে না বেড়ালে কি মেলামেশা হয় না? সব সময়ে সব কাজের মধ্যে, এমন কি প্রেমালাপেও স্ত্রীলোকের সংযম এবং শীলতা রক্ষা ক'রে চল্‌তে হবে। বিলাতফেরত যদি সেদিকে লক্ষ্য না দেন ত দেশটা অধঃপাতে যাবে, এ তোমাকে আমি ব'লে দিলুম।"

"আর আমিও ব'লে দিচ্ছি যে, ঘোমটার মধ্যেই যদি তোমরা শালীনতা এবং শীলতা রক্ষা করতে চাও, তাহ'লে তোমাদের কপালের সিঁদুরটিপ, নয়নের কাজল, এবং অধরের আলতারাগ সবই ব্যর্থ হবে।"

"দেখ ঠাকুরপো, এ রকম গভীর কথার মধ্যে তুমি যদি ঠাট্টা এনে ফেল, তা হলে কিন্তু এখান আমি উঠে যাব।"

"আর খেজুররসে কুইনিন মিশিয়ে তুমি যদি আমার ওষুধ ব্যবস্থা কর, তবে কিছুতেই আমি তা গলাধঃকরণ করব না। আমিও চল্লুম। তোমাকে যদি আর কোনও কথা বলি, আমার নামই মিথ্যে। বলব না, বলব না, তিন সত্যি ক'রে বল্‌ছি—বলব না।"

"বেশ বলো না, আমিও তোমার কোন কথাই শুনতে চাইনে।"

"বেশ, সেই ভাল, অরসিকের কাছে রহস্যনিবেদন আর অরণ্যে রোদন একই কথা। ১৩১৬ সালের আশ্বিন মাসের ৫ তারিখে আজ আমরা এই Covenant কর্‌চি যে আমিও তোমাকে কোন কথা বলব না, আর তুমিও আমার কোন কথা শুনবে না।"

ক্রোধে মধুরে মিশ্ররাগ জমাইয়া তুলিয়া গম্ভীরভাবে শিশ দিতে দিতে বিনোদ উঠিল, পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া সময়টা দেখিয়া কহিল, "উঃ, তাই ত!" বলিয়াই ছুট দিল। ৫টার সময় তাহার একটি বন্ধুর বাড়ীতে চা-পানের নিমন্ত্রণ ছিল, ৪॥০টা বাজে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সে সাজসজ্জা করিতে গেল, সুকুমারী গোঁ হইয়া সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। কিছু পরে ফিটফাট বিদেশী বেশ ধরিয়া বৌদিদির নিকট পুনরাবির্ভূত হইয়া বিনোদ কহিল, "রাগটা পড়েছে কি না দেখতে এলুম বৌদি।" সুকুমারী কোন কথা কহিলেন না। বিনোদ চলিয়া যাইলেই তিনি গানের খাতা-খানা পুনরায় হাতে লইয়াছিলেন, সেই দিকেই চাহিয়া রহিলেন, বিনোদ সেখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল—"শোন বৌদি, একটা কথা বলি,—তোমার এতটা রাগ সবই শূন্য পাত্রে পড়েছে।" সুকুমারীর ভাবোজ্জ্বল সুন্দর নয়নযুগল হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বিনোদ আবার নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "বাঁচলুম, I thank you many many thanks, let us forget and forgive and be friends again! আমি তোমাকে আশ্বাস দান করছি তিনি স্বদেশিনী নন।"

সুকুমারী হাসিয়া কহিলেন, "বিদেশিনীই তবে তিনি?"

বিনোদ হাত রগড়াইতে রগড়াইতে কহিল—"আজ্ঞে না, মাপ করবেন, বিদেশিনীও নন তিনি!"

"তবে? সবই তোমার বানান কথা নাকি?"

দু'জনেই খুব হাসিয়া উঠিলেন; হাসির উচ্ছ্বাসটা একটু শমিত হইলেই বিনোদ কহিল—"কি করি, গুরু-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, তুমি নতুন খবর শুনতে চাইলে, কাজেই আমার উপন্যাস রচনা করা ছাড়া উপায় কি?"

"বটে! এমন দুষ্ট যদি দুনিয়ায় আর একটি আছে" বলিয়া তর্জনী নাচাইয়া কহিলেন—"রবে না গো রবে না; এমন দিন রবে না, চিরদিন প্রেম নিয়ে এমন হাস্য-পরিহাস চলবে না এর শাস্তি একদিন তোমাকে পেতেই হবে।"

"বেশ! সেদিন আসুক—তোমার শাপ বর বলেই তখন শিরোধার্য্য করব। এখন ত তোমার মুখে হাসি ফুটেছে, আমি হৃষ্টচিত্তে চরণধূলি নিয়ে বিদায় গ্রহণ করি!"

বিনোদ প্রফুল্লভাবে শিশ দিতে দিতে চলিয়া গেল। সুকুমারী গানের খাতাটা টেবিলে রাখিয়া উঠিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় বেহারা আসিয়া তাঁহার হাতে একখানি ডাকের চিঠি

প্রদান করিল। তিনি শিরোনামা পড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—"প্রিয়বালার চিঠি এ যে। এদের দুজনের যদি মিলন ঘটাতে পারি—তবেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিধাতা এদের দুজনকে যেন দুজনের জন্যেই গড়েছেন। একজন শুচি-শুভ্র, একজন গম্ভীর; একজন চিরদিনই ফাঁদে পড়ে ফাঁদ কাটছে, আর অন্য জন এ পর্য্যন্ত কাউকেই সুনজরে দেখ্‌লে না, —যেন একটি শুভ মুহূর্তের অপেক্ষায় আছে। এ চেষ্টাটা একবার দেখ্‌তেই হবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন,—

প্রিয়বালার পত্র।

দিদিমণিটি আমার,

এই, ভাই, দারজিলিঙে এসে পড়া গেছে। কি সুন্দর দেশ দিদি! চির-পুরাতনে চির-নবীন দেশ এ!

কতবার এসেছি; তবু যখনি আসি, মনে হয় যেন, এমন শোভা আর কখনও দেখিনি।

এখন বর্ষা নেই, আকাশ কি গাঢ় নীল। দিনের বেলা দিগন্তব্যাপী তুষারপর্ব্বতশ্রেণী, কখনও পূর্ণ মেঘমুক্ত, কখনও আধ মেঘঢাকারূপে সূর্য্যকিরণে ঝলমল করতে থাকে। রাত্রিকালে, বিজলী-দীপাবলী-খচিত মায়াপুরী, চন্দ্র-তারকার তুষার-স্নিগ্ধ ম্লান রজতজ্যোতিধারায় যেন ছায়ালোকরচিত একখানি স্বপ্নদৃশ্যের মত দেখায়। স্তর-বিন্যস্ত পাহাড়গাত্রে অহরহ মেঘের লুকোচুরী খেলা, নির্ঝরের নৃত্যগীত, যত্নরক্ষিত বনানীর অকৃত্রিম আদিম সৌন্দর্য্য এবং মানবগঠিত বিচিত্র সহরের অপরূপ কৃত্রিম সৌন্দর্য্য—এ সকলই অপূর্ব্ব, মনোহর ব'লে মনে হয়।

জান ভাই, আমাদের পাশের বনে একটা পাখী থেকে থেকে কুহুকু করে ওঠে; তার স্বরটিও আমাদের দেশের কোকিলের চেয়ে মধুর।

শুন্‌তে পাই, এই কোকিলই ইয়োরোপের বিখ্যাত কুকু (Cuckoo), সাধে কি সে দেশে গেলে নিজের দেশকে লোকে ভুলে যায়। আমি কিন্তু ভেবে দেখেছি, এত শোভার রাজ্যেও যদি আমাকে একলা থাক্‌তে হোত, তা'হলে একটি দিনও আমি তিষ্ঠুতে পারতুম না। নিজেকে বনবাসী বলেই মনে হোত।

আমরা এবার বাড়ী নিয়েছি 'ঘুমে'। এ জায়গাটা দারজিলিঙের চেয়েও উঁচু, আর প্রাকৃতিক দৃশ্যেও এখানে ততটা বাধা পড়েনি এখনো। দারজিলিং সহরের মধ্যে আজকাল ঝরণা প্রায় দেখাই যায় না—কিন্তু এখানে যত্রতত্র পাহাড়ের গা দিয়ে জলপ্রপাত ঝর্‌ঝর্‌-ধারায় নাম্‌ছে।

আমাদের বাড়ীর কাছেই একটি বেশ নির্জ্জন বসার স্থান আছে। আমি আহারান্তে প্রায়ই একখানা বই হাতে ক'রে ঐখানে গিয়ে বসি, ঝরণার গান শুন্‌তে শুন্‌তে বইয়ের পাতা কি ওল্টান যায় দিদি, তোমার গানটিই আমার প্রাণে জাগে—কণ্ঠে উথ্‌লে ওঠে! বুঝতে পেরেছ কি দিদিমণি কোন গানটি?

> আমার—প্রাণের গানের ঝরণা
> আজি ফুলে ফুলে ফুলে উঠিয়া

তারার মতন ছুটিয়া
দিগ্‌দিগন্তে লুটিয়া
সুরভি সুষমা ছড়ায়ে
হাসিতে পড়িছে গড়ায়ে
সুরতালমানে ইন্দ্রজাল-বরণা !

জানি না, ঝরণা-তানের সঙ্গে আমার কণ্ঠতান মেলে কি না !

জলপ্রপাতের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় আমার কি মনে হয় জান দিদিমণি ? যেন কোন অদৃশ্য পরীরাণীর সহস্রতার বীণাটি তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শে এমন মধুর তানে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। তুমি এখানে এলে ঢের নতুন নতুন কবিতা লিখ্‌তে পারতে। এস না ভাই দিদিমণিটি, লক্ষ্মীটি এস, এস, এস।

তোমাকে সত্যি এত আমার মনে পড়ে, আর দেখ্‌তে ইচ্ছে করে। আর ? আর ? না, আর কিছুই না। তুমি ত দিদিমণি মনে কর,—আমি অদম্য, অনম্য ; অচ্ছেদ্য, অভেদ্য , বেশ, তোমার বিশ্বাস আমি ভাঙ্গাতে চাইনে, সুখে থাক, ভাল থাক দিদি—তোমার ঐ মর্ম্মবিজড়িত প্রাণের ভুলটি নিয়ে। কত সময় আমার মনের কথা ঠোঁট পর্য্যন্ত এগিয়ে এসে তোমার ঐ বিশ্বস্ত হাসির সামনে লজ্জা-সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ হয়ে লুকিয়ে পড়েছে। আজ কিন্তু দিদিমণি, তোমার চোখের দৃষ্টি, অধরের হাসি থেকে আমি বহু যোজন দূরে ; তা ছাড়া সময়টাও অনুকূল—নিস্তব্ধ রাত্রি দীপালোক-পরিম্লান ; অবসর বুঝে আমার মনের পাগলামী কালিটা কাগজে আজ প্রকাশ কর্‌বার জন্য কলমের আগায় এমন ঝুঁকে পড়েছে যে, আর ধ'রে রাখ্‌তে পারছিনে। কেন দিদিমণি, তোমাকে আমার সব কথা বল্‌তে ইচ্ছা করে ? তোমাতে আমাতে বয়সের ব্যবধান ত কিছু কম নয় ? বার বছরেরও বড় তুমি আমার চেয়ে—বল্‌তে গেলে তোমার মেয়েরই বয়সী আমি। তবুও তুমি আমার প্রিয়সখী, প্রাণের দিদিমণিটি, তোমাকে সব কথা ব'লে যেমন তৃপ্তিলাভ করি—এমন আর কাউকে না। কত ত সমবয়সী সখী আছে আমার। বুঝি আমার পক্ষে এই বয়সে বয়োজ্যেষ্ঠা সখীর স্নেহ-অভিজ্ঞতার অঞ্চলতলে আশ্রয়-গ্রহণের আকাঙ্ক্ষাই স্বাভাবিক।

কতবার তোমাকে বলেছি দিদিমণি, আজ আবার না ব'লে থাক্‌তে পারছিনে, প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলুম—আমার সমস্ত হৃদয়-প্রাণ শ্রদ্ধা-প্রীতিতে তোমার চরণে নত হয়ে পড়েছিল। কি মোহিনী তোমার রূপ দিদিমণি, কি করুণ প্রেমদৃষ্টি দিয়ে আকর্ষণ করেছিলে আমাকে তুমি। নইলে কি সখী ব'লে তোমাকে আলিঙ্গন কর্‌তে আমার সাহস হোত ? মহীয়সী নারী তুমি, আর আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। মনে করেছিলুম, এই ভালবাসাই সারাজীবন আমার অন্তর-প্রাণ পরিপূর্ণ ক'রে থাকবে ; কিন্তু তার পর ? কে জানে দিদি, এ কি ওলটপালট !

তুমি কি এখনো ভাবছ, তোমার বোনটি স্বপ্ন দেখ্‌ছে ? তাই হোক ভাই, আমাকে এ স্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তোল, শিখিয়ে দাও দিদিমণিটি, কেমন ক'রে ভুল্‌তে হয়। আর কারো কাছে ত এ কথা বল্‌তে পারিনে ; তুমিই আমাকে উপদেশ দাও, কি ক'রে ভুলব,—

মাকে যদি ভাই এ কথা বলতে পারতুম। এক এক সময় বড় ইচ্ছা করে, তাঁর বুকে মুখ লুকিয়ে সব কথা খুলে বলি—ছেলেবেলা কোন দুঃখ হলে যেমন বলতুম; কিন্তু পারিনে ভাই, পারিনে; কেন পারিনে, তা জানিনে। আর সব কথা তাঁকে বলতে পারি, কিন্তু এ কথা পারিনে। মার যে ভাই আমি খুকী! তাঁর খুকী যে তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসতে পারে, এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। একটা মজার গল্প বলি শোন, একদিন ছোট মাসীমা বেড়াতে এসে মাকে ঠাট্টা করেই বলেছিলেন—আমি অন্য ঘর থেকে শুনলুম—"মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, কোথায় কোন অপাত্রে লভে পড়ে যাবে, এই বেলা বিয়েটা দিয়ে দাও দিদি।"

মা ত হেসেই অস্থির; আমার খুকী, ও লভের কি জানে? ১৭ বছর বয়স হ'লে কি হয়? ওর শরীরও delicate, মনও খুব কাঁচা; খুকীর বিশ বছর পূর্ণ হবার একদিন আগে আমি এ কথা ভাব্‌ব না।"

বাবা এ বিষয়ে কি ভাবেন, তা জানি না; তবে তিনি নিজে এক জন ভুক্তভোগী; শুনেছি, তিনি যখন মায়ের লভে পড়েন, তখন তাঁর বয়স বিশ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। বাবা আমাকে ফিলজফি পড়ান; আর অন্যমনা দেখ্‌লে সময় সময় উপদেশচ্ছলে বলেন—"আত্মনির্ভরতাই জীবনের প্রধান সুখ। সেই দিকেই মানুষের একান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত। বিবাহে মানুষকে পরাধীন ক'রে তোলে, অতএব স্বাধীনতা রক্ষা করতে হ'লে বিবাহ না করাই সঙ্গত।"

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি দিদি, ক'জন মেয়ে, এমন কি, কজন পুরুষই বা এ সম্বন্ধে স্বাধীন হ'তে পেরেছে? বাবা যে নিজে একটি জলজ্যান্ত বিপরীত দৃষ্টান্ত, সেটি তিনি ভুলে যান। যাক্‌।

আমি কিন্তু ভাই! বাবার উপদেশ অনুসরণ করেই চল্‌ব ব'লে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি। বি-এটা আগামী বছরে পাশ ক'রে নিয়ে স্ত্রীশিক্ষায় জীবন দান কর্‌ব।

দিদি, ভাই, একটি কথার উত্তর দাও ত; সংসারে দুঃখহীন সুখ কিছু আছে কি? আমি ত বলি মুহূর্ত্ত কালের জন্য থাক্‌তে পারে, কিন্তু তা হলে ত সেটা মোহমাত্র। কোথায় যেন পড়েছি If a man is unhappy then it must be his fault, for god made all men to be happy. আমার কিন্তু উল্টোটাই মনে হয়; সুখের প্রত্যাশাই মানুষের অসুখের কারণ। আমি ত মনে করেছি, সুখের প্রত্যাশা না ক'রে কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য ক'রে যাব। এই কর্ত্তব্যের অনুসরণে যদি তাকে ভুলতে পারি,—ত তবেই—তবেই কি, তাও ত জানি না।

সবাই বলে, মনকে বোঝাও, বশ কর, হেন তেন; কিন্তু মনের উপর মানুষের এক্তার কতটুকু? অন্ততঃ আমি ত দেখ্‌ছি, আমার উপর মনটিও আমার উপর বিলক্ষণ প্রভুত্ব করছে। নিজের প্রতি সময় সময় এত রাগ ধরে! কি দুর্ব্বল আমি দিদি! ছি ছি!

দিদিমণিটি, জন্মালেই কি ভালবাসতে হয় সকলেরই? এই কি সংসারের নিয়ম নাকি? তাই যদি, তা হলে এ চেষ্টারই না কি ফল? এই নৈরাশ্যের মধ্যেও তাই সময় সময় মনে হয়,—

আজীবন ধ'রে জলিব পুড়িব সারাটি দিবস-রজনী,
তবুও—তবুও হৃদয়ের ধনে ভুলিব না কভু স্বজনি।

এ গানটি তোমারি ত রচনা দিদি! একদিন বুঝি আমার মত অবস্থা তোমারও হয়েছিল? কে জানে?

রাত হয়ে যাচ্ছে দিদি, এবার শুতে যাই। তোমার কাছে মনটা খুলে দিয়ে বেশ একটা শান্তি পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, কালকের প্রভাত আমাকে নবজীবন দান ক'রে সম্মুখের পথে আমাকে এগিয়ে দেবে। এই আশীর্ব্বাদ কর দিদি, তোমার আশীষ আমার জীবনের ধ্রুবতারা হোক, এই আলো দেখে আমি কাল যেন নবজীবন আরম্ভ করতে পারি।

প্রণাম প্রণাম— শ্রদ্ধাভক্তি ও প্রীতি পূর্ণ শত সহস্র প্রণাম।

তোমার চির স্নেহাকাঙ্ক্ষিণী—
প্রিয়বালা।"

সুকুমারী চিঠিখানা পড়িয়া একটা মৃদু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আকাশের দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ হইতে উত্তরপূর্ব্ব কোণে একখানা কাল মেঘের টুকরা ভাসিয়া চলিয়াছিল, হঠাৎ একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া তাঁহার মুখে একটা সজল ঝাপটা মারিয়া গেল, এ কি দার্জিলিঙের মেঘদূত নাকি? একটু হাসিয়া উড়ন্ত বিশৃঙ্খল চুলগুলাকে মুখের উপর হইতে কপালে সরাইয়া দিতে দিতে তিনি ভাবিলেন, "তাই ত, আমার সঙ্কল্প সব ব্যর্থ যায় বুঝি? প্রেমদেব যে আগে থেকেই অলক্ষ্যে লক্ষ্য হানছেন, তা কে জানে। কে সে সৌভাগ্যবান্? অনেক কথাই বলেছেন প্রিয়সখীটি আমার, কিন্তু এই আসল কথাটাই বলেন নি।"

রাঙ্গা বৃন্তে শুভ্র সুন্দর মুখের শোভা ফুটাইয়া ঝরা শিউলিফুলের রাশি গাছতলা আলো করিয়া রাখিয়াছিল, কতকগুলি প্রজাপতি তাহার উপর ঝাঁকিয়া ঝাঁকিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া সুকুমারী স্বগত কহিলেন—"আমার রাঙা ফুলটির প্রজাপতিটি কে? আচ্ছা, যদি ঠাকুর-পোই হয়, দু'একবার ত দুজনের এখানে দেখা-শুনাও হয়েছে। না, তা নয়, সংসারে যা চাওয়া যায়, এমন সহজে তা মেলে না ত? প্রেমের পথ চিরদিনই কঠিন, আঁকাবাঁকা। যা হ'ক, আমরা ত গিয়ে পড়ি, সে চাচ্ছে ভুলতে, আমি চেষ্টা করি ভোলাতে, দেখি কৃতকার্য্য হই কি না। চেষ্টাতে পাহাড়ও ত নড়ে।"

তিনি মনে মনে কার্য্যপ্রণালী ঠিক করিয়া লইয়া সংক্ষেপে পত্র একখানি লিখিয়া দিলেন যে,—"পত্রের উত্তর-বাহকরূপে নিজেই শীঘ্র তোমার নিকট পৌঁছিব। তৎপূর্ব্বে ভিন্ন পত্রে মোড়কের মধ্যে আমার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ উপহার প্রেরণ করিতেছি। সাদরে গ্রহণ করিলে সুখী হইব।"

লাল ফিতায় বাঁধা খামখানি প্রিয়বালা আগ্রহের সহিত খুলিল, খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে লিপ্যক্ষরে লেখা একটি কবিতা। পড়িল—

শারদীয় উপহার।

যার ফুল-দলে পরিব ব'লে ওগো আকুল আশে,
রহিলাম অপেক্ষায় হাহুতাশে,
সে ত না দেখা দিল, অশ্রু ঝরি শুকাইল,
কে দাঁড়াল মালা নিয়ে হায় রে পাশে!
আহা এত গীতগান পড়িল থেমে,
বসন্ত মধু রাতে বাদল এল নেমে।

নয়নে প্রেম আলো, তাহার চমকিলো –
চাহিনু দোঁহে মোহে নবীন প্রেমে।
ভুলিয়া গেনু সব পুরান কথা,
রহিল প্রাণে শুধু একটু ব্যথা,
একটি চাপা শ্বাস বহিল ধীরে,
একটি ফোঁটা নীরে উঠিল আঁখি ভেসে।
কাহার মালা নিতে ভুলিনু কার গাঁতে!
হায় রে! ঝরিল দলরাশি মরমে হেসে।

পড়া শেষ হইলে রাগ করিয়া প্রিয়বালা কহিল, "এমন দুষ্টু!" বলিয়া সাদরে সযত্নে উপহারটি তুলিয়া রাখিল।

*　　　　　*　　　　　*　　　　　*

স্থকুমারী যে তাঁহার দেবর সহযাত্রীটির সহিত নিরাপদে দারজিলিং পঁহুছিয়া গিয়াছেন, এবং সেথানে বার্চহিলের নিভৃত কাননকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার শুভ সঙ্কল্পসিদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছেন, এ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার কবি-মস্তিষ্ক-প্রসূত ষড়্যন্ত্রের যে শেষ পরিণাম কি হইল, তাহা এখনও জানিতে না পারায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছি। প্রতিদিনই উৎসুক অন্তঃকরণে ডাকের চিঠি-পত্রের মধ্যে একখানা লাল খামের অনুসন্ধান করিতেছি—এবং সেখানা পাইবামাত্র কি যৌতুক উপহার পাঠাইব, তাহাও ঠিক করিয়া রাখিয়াছি।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

হারামণি

নাকে-মুখে কোনমতে চারটি ভাত গুঁজিয়া মনমোহন তাড়াতাড়ি উপরে আসিয়া দড়িতে খাটানো কামিজটা তুলিয়া যেমন গায়ে দিতে যাইবে, অমনি পিঠের কাছটা ফ্যাঁস্ করিয়া ফাঁসিয়া গেল। মনমোহন রাগিয়া কামিজটা মেঝেয় ফেলিয়া দুই পায়ে সেটাকে চাপিয়া ধরিল। স্ত্রী শান্তি দুইটা পান লইয়া শশব্যস্তে আসিয়া স্বামীর সে মূর্ত্তি দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, "হল কি ?"

মনমোহন গর্জ্জিয়া উঠিল, "হবে আর কি! বেরুবার সময় জামাটা ছিঁড়ে বস্লুম—এখন সেলাই করতে গেলে অফিসে দেরী হয়ে যাবে।"

শান্তি মনমোহনের পানে চাহিয়া দেখিল, মুখ বিরক্তির আঁধারে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

শান্তি বলিল, "বেশ ত, এসো, আমি আর একটা জামা বের করে দিচ্ছি।"

"জামা কোথায় যে বের করবে ? ছটো এ ধোপে কাচ্‌তে দেছ। তখন বল্লুম অত করে, একটা কাচতে দাও, আর একটা বাড়ীতে সাবান দিয়ে জলকাচা করে রাখো, তা ত শুনলে না।"

শান্তি বলিল, "মা গো, সেটা জলে ভিজে সসে ধরে কি হয়েছিল, বল দেখি, সে গায়ে দিয়ে মানুষ বাইরে বেরুতে' পারে কখনো ?"

"এখন উপায় ?" মনমোহন হতাশভাবে শান্তির পানে চাহিল। শান্তি বলিল, "তুমি পান খাও, আমি টক্ করে এখনি টেঁকে দিচ্ছি—এখনই হয়ে যাবে'খন।"

মনমোহন একটা পান মুখে দিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। শান্তির ছুঁচ সুতা লইয়া কামিজ সেলাই করিতে বসিল; সেলাই করিতে করিতে বলিল, "আজ আসবার সময় একপো সাবান এনো দেখি, রাত্রে সাবানে কেচে দেব'খন। জামা ময়লা হলেও ছেঁড়ে পাল্‌তিস। আর তাও বলি, চারটে জামা না হলে চলেও না—ছটো করে যদি গায়ে দাও—"

এ কথায় মনমোহন একেবারে জ্বলিয়া উঠিল,—বলিল, "অঢেল পয়সা দেখ্‌চো না! নিত্য তোমার ছেলে-পিলেদের ব্যামো, তাদের ওষুধের খরচাও যদি এক মাস রেহাই হয়, তা হ'লেও নয় জামা-কাপড় কেনা যায়। তা ত নয়—"

শান্তির মুখ নিমেষে পাংশু হইয়া গেল। ছেলেমেয়েদের অসুখ নিত্য লাগিয়া আছে—কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু সে কি তাহার দোষে ? সে বেচারী কি করিবে! তবু আপনাকে সকল অপরাধের মূল ভাবিয়া দুঃখে লজ্জায় সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

জামা সেলাই তখনই হইয়া গেল। মনমোহন কামিজ গায়ে দিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে,

এমন সময় জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন আসিয়া বলিল, "দু'মাসের মাইনে বাকী বাবা আজ না দিলে স্কুলে নাম কেটে দেবে বলেছে।"

মনমোহন গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "দিক্ নাম কেটে—আপদ্ চোকে তাহলে। বেটারা যেন কশাইয়ের মত ব'সে আছে—খালি টাকা আর টাকা। টাকা মানুষ দেবে কোত্থেকে, তা ভাবে না একবার!"

শান্তি ছেলেকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "বলগে বুঝিয়ে, আর দু একদিনের মধ্যেই মাইনে দেব খন।"

পুত্র শুনিল না—বলিল, "বা রে, রোজ রোজ খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে অত ছেলের সামনে। আমি তা'হলে স্কুলে যাব না, আজ মাইনে না দিলে—"

মা ধমক দিল, "যাগে—ভারী বিদ্যে হচ্ছে ত স্কুলে গিয়ে—"

মনমোহন চলিয়া যাইতেছিল—ছেলে আবার তুলিল, "বাবা, মাইনে—"

পিতা ঘুরিয়া পুত্রের গালে প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিল, বলিল, "স্কুলে যেতে হবে না তোকে, শূয়ার" পুত্র বিকট চীৎকারে ক্রন্দন জুড়িয়া দিল। শান্তি আসিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, "এমন বাপের ছেলে ত দেখিনি কোথাও! বেরুচ্ছে মানুষ, তার পিছনে জ্বালাতন। যা হতভাগা, তোকে স্কুলে যেতে হবে না আর—" তার পর স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি সব ঠিক ক'রে দেব খন। তোমায় আর এখন ভাবতে হবে না। আপিস যাও।" শান্তির চোখ ছল-ছল করিয়া আসিল—গলার স্বর ভারী হইয়া উঠিল।

মনমোহন উঠিয়া জামা গায়ে দিতে দিতে কহিল, "ভাবব না কি বল। আজ বিশু এসে বলে গেছে, তার দোকানে তিরিশ টাকা ধার হয়েছে—দু চার দিনের মধ্যে দিতে না পারলে সে নালিশ করবে!"

শান্তি কহিল, "তার হাতেপায়ে ধ'রে বলো, বিনির অত বড় অসুখটা গেল, তাতেই ডাক্তারে ওষুধে বিস্তর খরচ হ'য়ে গেছে, কাজেই দিতে পারনি! এখন সে সেরেছে, এবার ক্রমে ক্রমে সব ধার শুধে দেবে। দেবে না, বলনি ত!"

এত দুঃখেও মনমোহন হাসিয়া ফেলিল, কহিল, "তোমার মেয়ের অসুখ হ'লে পাওনাদার ত চুপ ক'রে থাকতে পারে না। যাক্, ভেবেই বা আর করছি কি। যা বরাতে আছে হবে।"

শান্তি কহিল, "সেই ভাল। বরাত ছাড়া ত পথ নেই, তুমি আর ভেবো না। ভগবান্ এক রকম ক'রে চালিয়ে দেবেনই।"

ছিন্ন ছত্র লইয়া মনমোহন বাহির হইয়া গেল। পথে তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, ভগবান্ কি দিয়া চালাইবেন! ভগবান্ কি আছেন! নাই, ভগবান্ নাই—কখনই নাই। নহিলে সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিয়া সারা হইয়াও সংসারে কোন দিকে এতটুকু শৃঙ্খলা বা সামঞ্জস্য আনিতে পারে না, আর ও পাড়ার দত্ত বাবুরা এই যে সে দিন অনর্থক একটা ঘটা করিয়া বাগানে বাইনাচ দিয়া রঙিন ফানুস জ্বালাইয়া বাজি পুড়াইয়াও পয়সা ফুরাইতে পারিতেছে না!

মাথার উপর সূর্য্য তখন প্রচণ্ড অনল বর্ষণ করিতেছিল। মনোহরপুকুরের রোড পার হইয়া বড় রাস্তা ধরিয়া তাহাকে আলিপুরে আপিস করিতে হইবে, এ দীর্ঘ পথটা আর অতিক্রম করা যায় না। মনমোহনের জীর্ণ ছত্র সূর্য্যের সে অনলতাপ হইতে তাহার মাথাটাকে রক্ষা করিবে, এমন তাহার সামর্থ্য

ছিল না। জুতার একটা প্রেকও এমন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, সে তাহার পা'টাকে বিঁধিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া তুলিয়াছে! কালীঘাটের পুলের কাছে আসিয়া মনমোহন জুতা খুলিয়া একটা খুদে প্রস্তরখণ্ড লইয়া প্রেকটায় ঘা দিয়া বসাইল। পা তখনও জ্বলিতেছিল। মনমোহন কাঠের রেলিঙে ভর দিয়া দাঁড়াইল। বাহির হইবার সময় ছেলেটাকে মারিয়া মনটাও বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। তার কি দোষ, মাহিনার জন্য স্কুলে তাগাদা করিয়াছে, এই কথাটাই না শুধু সে বলিতে আসিয়াছিল। আহা! গাছের তলায় স্নিগ্ধ একটু ছায়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। মনমোহন কপালের ঘাম মুছিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া একটু জুড়াইবে ভাবিল।

পথের উপর দিয়া সদর্পে তখন গাড়ী-জুড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে—পয়সাওয়ালা উকীল-মোক্তার ও মামলা-বাজের গাড়ী! আশার উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল তাহাদের চোখ, হাসির কিরণে প্রদীপ্ত মুখ—গাড়ীর মধ্যে বসিয়া হাস্য-কৌতুকের লহর তুলিয়া সব চলিয়াছে! মনমোহনের মনে হইল, এই দারিদ্র্যের আঁধারে ঘেরা পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া আনন্দের একটা বিদ্যুৎ যেন ঠিকরিয়া গেল। পৃথিবীর সকল সুখ, সকল সৌভাগ্য ইহারা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে—ইহাদের প্রাচুর্য্যের অন্তরালে কি দারুণ দৈন্য পথের কিনারায় পড়িয়া হা-হা করিতেছে, তাহা ইহাদের চোখেও পড়ে না। মনমোহনের বক্ষপঞ্জরগুলাকে চূর্ণ করিয়া নৈরাশ্যের এক তীব্র হাহাকার ফুটিয়া উঠিল।

আর দাঁড়াইয়া থাকাও চলে না। অফিসের নূতন বড় বাবু ভারী কড়া লোক, হাজিরার সময়ের এক চুল তফাত হইবার যো নাই—সাহেবের কর্ণে সে সংবাদ পৌঁছিতে তখনই মুহূর্ত বিলম্ব ঘটিবে না! আর তাহা হইলে এই পঁচিশটি টাকার মূলে—না, সে কথা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে! মনমোহন ছাতা খুলিয়া অফিসের দিকে চলিল।

২

অফিসে গিয়াই সে দেখে, সেখানে আমোদের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। কেহ চেয়ার, কেহ খাতা তুলিয়া মহা-আনন্দে কলরব লাগাইয়াছে। বিরিঞ্চি কোমরে চাদর জড়াইয়া সহসা অপূর্ব্ব নৃত্য-কৌশল দেখাই-বার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। সব দেখিয়া-শুনিয়া মনমোহনের তাক লাগিয়া গেল। সে ভাবিল, ব্যাপার কি! বড় বাবুর সহসা মৃত্যু ঘটিল না কি! বড় বাবুর প্রতি সকলেরই মন এতখানি প্রসন্ন ছিল যে, এতটা আনন্দের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে মন ঐ বিষয়টার প্রতিই প্রথম ইঙ্গিত করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা রাখে না।

মনমোহনকে আসিতে দেখিয়া শৈলেশ চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাজি মাৎ হে মনু—"

মনমোহন সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করিল, "কি—হয়েছে কি?"

কালিদাস কহিল, "ফলার পেকেছে।"

তাহার মুখের কথা লুফিয়া গণেশ কহিল, "আমাদের বগলা ডার্বির টিকিট কিনেছিল—আজ খবর এসেছে, ওর নামে একটা ঘোড়া উঠেছে। ও পাঁচশ' টাকা পাবে। তারা মনি-অর্ডার অবধি করেছে।"

মনমোহনের বুকটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। বগলা—! চিরকেলে বখা বগলা! বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্রের দারুণ রোগের সময়ও বাড়ীতে যাহার চুলের টিকি দেখিতে পাওয়া যায় না—অফিসের ছুটির অন্তরালে চরিত্রহীনা

নারীর সংসর্গে নেশা-ভাঙ করিয়াই যাহার সময় কাটে—সেই দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন ইয়ার বগলার অদৃষ্টে এত টাকা! তাও গতর খাটাইয়া নয়,—নিতান্তই ফাঁকতালে উপার্জ্জন। আর মনমোহন? সে ভাবিল, ইহার পরও মানুষ বলিবে, এটা ভগবানের রাজ্য—বিচার এখানে নিক্তি করিয়া বাঁটিয়া দেওয়া হয়! মিথ্যা, মিথ্যা কথা!

প্রথমটা তাহার মুখে কোন কথা জোগাইল না। অফিসের বন্ধুদের সহিত এ আনন্দে নির্লজ্জভাবে যোগ দিতে তাহার কেমন সঙ্কোচ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই বগলার প্রতি একটা শ্রদ্ধায় মন তাহার ভরিয়া উঠিল। ভাগ্যবান্ বগলা! লক্ষ্মীকে সে যত ছাড়িয়া থাকিতে চায়, লক্ষ্মী ততই তাহাকে কোলে টানিয়া লয়! এই সে দিন সাহেবের একটা বিশেষ প্রিয়কার্য্য করিয়া দিয়া সে অফিসে 'প্রোমোশন' সংগ্রহ করিয়াছে—তাহার কার্য্যতৎপরতায় সাহেব তাহার প্রতি বিশেষ তুষ্ট, বড়বাবুও তাহাকে ঠেলিয়া চলিতে পারেন না। অথচ মনমোহন—তাহার মত সাধুকর্ম্মনিষ্ঠ কেরাণী আপিসে আর দুটি নাই; কিন্তু তাহার অদৃষ্টচক্রটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও লক্ষ্মীর প্রাসাদ-ভবনের দিকে এতটুকুও সে অগ্রসর হইতে পারে না! কেন, কেন, কি পাপে তাহার পানে চপলা লক্ষ্মী একটা নিমেষ-কটাক্ষও পাত করেন না?

টিফিনের ছুটীর সময় বগলা সেদিন সকলকে নানাবিধ সরস ভোজ্যে আপ্যায়িত করিল। কোনমতে তাহাকে একান্তে পাইয়া মনমোহন প্রশ্ন করিল, "কত টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলে?"

বগলা কহিল, "দশ টাকা।" পরে হাসিয়া বলিল, "একবেটা সাহেব এসে ধরেছিল, একখান টিকিট নিতে হবে—কখনও নিই নি—একেবারে দশ দশটা টাকা! বার ক'রে দিতে কেমন মায়া হ'ল। সে বেটাও নাছোড়বন্দা—কাজেই শেষে ভাব্লুম, দূর হোক্‌গে, এতদিকে এত বাজে পয়সা খরচ হচ্ছে, দি ফেলে—দশটা টাকা। দিলুম—শেষ দেখি, লাগ্‌বি ত লাগ্‌ একদম পাঁচশ টাকা, সেই টিকিটে। নম্ক'রে দিছলুম—'জয়-মা-কালী—' টাকাটা পেলেই আগে কালীঘাটে পাঁচ টাকার পুজো পাঠিয়ে দেব।"

৩

ইহার পর দুই-চারিদিন ধরিয়া মনমোহনের চিত্ত নিতান্তই অধীরভাবে নিজের ভবিষ্যৎটাকে নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিল। নাই, উন্নতির কোন সম্ভাবনা নাই। আলিপুরের আর্মি কোর্টিং আপিসে সে সামান্য কেরাণীর কাজ করে—এ চাকরীতে কতই বা উন্নতি হইবে! বড় জোর মাসে চল্লিশটা টাকা! কিন্তু এতগুলা লোককে ডিঙ্গাইয়া সহসা তাহার মাহিনা বাড়িবে কি করিয়া! ইহারা যদি মরিয়া যায়—কিন্তু তাহার উপরে চার জন কেরাণী; সকলেই মরিয়া যাইবে—এ হইতেই পারে না! তাহার চেয়ে মনমোহনের মৃত্যুটাই ত বেশী সম্ভব! কাজেই যে পঁচিশ—সেই পঁচিশেই তাহাকে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে! হায়, ছেলেবেলায় অনর্থক কতকগুলা বদ সঙ্গে মিশিয়া লেখাপড়ায় যদি সে অবহেলা না করিত! ঐ ত বিনোদ, সত্য—স্কুলে তাহারই সহপাঠী ছিল—এখন তাহাদের কেহ উকীল হইয়াছে, কেহ বা হাকিম—আর সে? বেচারা, নিতান্তই বেচারা সে! তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম করিল। হায়, স্কুলে পড়িবার সময় এই বিনোদ, সত্য এবং তাহার মধ্যে এতটুকু ব্যবধান ছিল না, এক বলে সকলে বসিত। এখন আর সে অধিকার নাই! লক্ষ্মীছাড়া সে সামান্য পঁচিশ টাকার কেরাণী, আর তাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র! তাহার জীবনে যে আঁধার, সেই আঁধার। ভবিষ্যতেই বা আলোর সম্ভাবনা কৈ?

তখনই আর একটা কথা মনে পড়িল। অমনি তাহার আঁধার চিত্তের মধ্যে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর

মুখে ম্লান হাসির মতই আশার ক্ষীণ বিদ্যুৎরেখা খেলিয়া গেল। সে ভাবিল, চপলা লক্ষ্মীকে বাঁধিবার এখন শুধু একটি উপায় আছে—একটিমাত্র! সে উপায় দশটি টাকা দিয়া ডার্বির টিকিট কেনা। ঐ ত বগলা কেমন ধাঁ করিয়া দশ টাকা ব্যয় করিয়া পাঁচশ' টাকা ঘরে আনিল। বগলার প্রতি তাহার মন শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। মনমোহন হাতের কলম নামাইয়া রাখিয়া বাহিরের পানে চাহিল।

বাহিরে বগলার কণ্ঠস্বর শুনা গেল। বেশ প্রসন্ন-প্রফুল্ল কণ্ঠস্বর! কেন না হইবে? না চাহিতেই মা লক্ষ্মী যাহার পকেটে নোটের তাড়া গুঁজিয়া দেন, তাহার স্বর যদি প্রসন্ন না হয় ত কাহার হইবে! কি অবিচার! মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, মুখে রক্ত উঠাইয়া সে কায়ক্লেশে ঐ পঁচিশটি টাকামাত্র উপার্জন করিতেছে—যে অর্থে তাহার স্ত্রী, তাহার পুত্র, সকলের জীবন, সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে—একটি পয়সা অপব্যয় নাই—বিলাস কাহাকে বলে, সে তা জানেও না, শান্ত সংযত জীবন বহন করিতেছে—অথচ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মী নিতান্তই অপব্যয়ী দায়িত্বজ্ঞানহীন ঐ বগলার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। মনমোহনের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নাই, কোন উপায় নাই। এমন নৈরাশ্যের হাহাকার বুকে পুরিয়া জীবনটাকে বহিয়া কি লাভ! তাহার চেয়ে এখনই ঐ চাদরের ফাঁস গলায় টানিয়া মৃত্যু—লক্ষগুণে ভাল!

মনমোহনের মাথায় খুন চাপিল। তাহার মনে হইল, আর এ ব্যর্থ জীবনটাকে টানিয়া বেড়াইয়া কোন ফল নাই। যে পুরুষ উপার্জ্জন করিতে পারিল না, স্ত্রী-পুত্রকে যাহার পেট ভরিয়া দুই মুঠা খাইতে দিবার সামর্থ্য হইল না,—সে আবার পুরুষ! কি বলিয়া লোকের মাঝে সে মাথা তুলিয়া বেড়ায়—হাসে, গল্প করে! নির্লজ্জ কাপুরুষ, পৃথিবীর ভার! তার মরাই উচিত! মনমোহন চাদরখানা গলায় তুলিয়া লইল—একটা ফাঁসও দিল। তাহার চোখের সম্মুখে মহাকাল যেন সহসা পিঙ্গল জটাভার মুক্ত করিয়া তাণ্ডবনৃত্য করিয়া উঠিলেন। কিন্তু তখনই আবার স্ত্রীপুত্রের কথা মনে পড়িল। এ মৃত্যু সেই স্ত্রী-পুত্রের মুখ হইতে এই পঁচিশটি টাকার গ্রাসও কাড়িয়া লইবে! সে মরিয়া ভাবনার দায় এড়াইবে বটে, কিন্তু শান্তি, ছেলেমেয়েরা? তাহাদের দশা! কি হইবে? তাহারা এ ক্ষুদ্র আশ্রয়টুকুও হারাইয়া একেবারে পথে বসিবে যে! মনমোহনের মরা হইল না। ভিতরের ঘরে রুদ্ধ বাতাস তাহার বুকখানার উপর পাথরের মতই চাপিয়া বসিয়াছিল। সে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িল। বড় বড় গাছগুলা অনেকখানি ছায়া বিস্তার করিয়াছিল, মৃদু স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছিল। মনমোহন আসিয়া বাহিরে একটা গাছতলায় দাঁড়াইল। দূরে পথে খেলিয়া দুলিয়া লোক চলিয়াছে, অদূরে কাছারির প্রাঙ্গণে কত লোক ঘুরিতেছে, গল্প করিতেছে। মনমোহন ভাবিল, ইহারা কত সুখী! প্রাচুর্য্যের মধ্যে এমন করিয়া কাহাকেও হাহাকার করিয়া ফিরিতে হয় না! ঐ যে আসামীটাকে পাহারাওয়ালাটা দস্তুরমতই দড়ি বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে, ও আসামীটাও অন্নের চিন্তায় এতখানি কাতর নয়, বেশ হাসিতেছে! জগতে সকলেই সুখী, সকলের মুখেই হাসির ছটা! সে—সে-ই শুধু অভাব ও নৈরাশ্যের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইতেছে।

বগলা আর দু জন বন্ধুর সহিত গল্প করিতে করিতে তাহারই কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা সিগারেট লইয়া কহিল, "এই নাও হে মনু।" মনমোহন অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি।"

"এঁ্যা—সে কি হে!" বলিয়া তাহার পানে একটা সবিস্ময় দৃষ্টি ফেলিয়া বগলা চলিয়া যাইতেছিল, মনমোহন তাহাকে ডাকিল, "বগলা—"

"ডাক্‌ছ ?" বলিয়া বগলা ফিরিল। বন্ধুদ্বয় চলিয়া গেল।

মনমোহন কহিল, "আমায় একটা ডার্বির টিকিট কিনে দেবে ? আমি দশ টাকা দেব।"

বগলা হাসিয়া কহিল, "সে ত এখন প্রায় দশ মাস পরে বিক্রী হবে। তা যা বলেছ, এ মন্দ নয়, মন্দ, কি জানো, বছরে দশটা ক'রে টাকা ফেলে দেওয়া শুধু—যদি বরাতে লাগে ত দু'চার লাখও লেগে যেতে পারে!"

দু'চার লাখ! মনমোহনের মনে হইল, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা আগাগোড়া কে যেন নোট-টাকায় মুড়িয়া দিয়াছে। দশ টাকা ব্যয় করিয়া দুই-চারি লাখ পাইবারও সম্ভাবনা আছে! এ যে পাগলের কথা!

কিন্তু না, পাগ্‌লামি ত নয়! বগলা পকেট হইতে একটা ছাপানো কাগজ বাহির করিয়া দেখাইল, এই বৎসরেই মান্দ্রাজের কে এক জন বিষ্ণুস্বামী পিল্লে দশ টাকার টিকিট কিনিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা পাইয়াছে। তাহার ঘোড়াই ডার্বি জিতিয়াছে! তবে! সেই বা কেন না পাইবে ? মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার মনোহরপুকুর কতদূরই বা! আর এই বিষ্ণুস্বামী পিল্লে—কে জানে এও হয় ত কোন রকমে তাহারই মত মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কায়ক্লেশে কিছু উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন করিতেছিল! লক্ষ্মী তাঁহার তর্জ্জনীর একটা ইঙ্গিতে এই ডার্বির ঘোড়া উপলক্ষ করিয়া তাহার হাতে পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিয়া দিয়াছেন! তবে ? তাহার অদৃষ্টেই বা না মিলিবে কেন ?

কিন্তু সাহস চাই! সাহস! এই দশটা টাকা ব্যয় করিবার সাহস এবং শক্তিও। পয়সার জন্য পৃথিবীতে কত লোক কত দুঃসাহসিক কাজ করিতেছে, বিপদ্‌ তুচ্ছ করিয়া দেশ দেশান্তরে ছুটিতেছে! উদ্যোগিনং পুরুষসিংহম্‌! সে এতখানি জীবনে কি করিয়াছে—কি দুঃসাহস, কি অধ্যবসায় দেখাইয়াছে যে, ভাগ্য-লক্ষ্মীর কৃপাকটাক্ষের দাবী সে করিতে পারে ? পয়সার জন্য মানুষ কি না করিতেছে। এরোপ্লেনে উড়িতেছে, খনির ভিতর নামিতেছে—তবে না লক্ষ্মী অজস্রধারে তাহাদের শিরে মণিমাণিক্য বর্ষণ করিতেছেন! চাই উদ্যম। চাই পুরুষকার। চাই সাহস। এই সব চাই। সে-ও এইবার সাহস করিয়া, ভরসা করিয়া এই দশটা টাকা—দশটা টাকামাত্র ব্যয় করিবে। বিষ্ণুস্বামী পিল্লে দশ টাকা ব্যয় করিয়াছিল, তাই সে আজ পাঁচ লক্ষ টাকার মালিক। সে-ও যদি সাহস করে, তবে হয় ত তাহার দাবীও উপেক্ষিত হইবে না ?

কিন্তু এই দশটি টাকা সংগ্রহ করা তাহার পক্ষে কতখানি কঠিন! নিজের ও স্ত্রীপুত্রের আহারের অংশ ছিনাইয়া সে টাকার জোগাড় করিতে হইবে। উপায় নাই, ছিনাইতেই হইবে। কষ্ট হইবে, কিন্তু এ কষ্ট না করিলে সুখ-সৌভাগ্য আয়ত্ত হইবে কেন ? কষ্ট করিয়া দশটা টাকা দিলে যখন পাঁচ লাখ ঘরে আসিবে, তখন! তখন যে আর এমনভাবে খাটিয়া মরিতে হইবে না—ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে সে ডুবিয়া থাকিবে যে! মনমোহনের চোখের সম্মুখে মুহূর্ত্তে আশার এক উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল। প্রকাণ্ড প্রাসাদ, প্রচুর অর্থ, অসংখ্য লোকজন—ঐশ্বর্য্যের সে এক কি বিপুল সমারোহ! আঃ, এত দিনে দুঃখ ঘুচিবার সম্ভাবনা দেখা গিয়াছে। স্ত্রীপুত্রকে আর অভাব-হাহাকারের মধ্যে জর্জ্জরিত হইতে হইবে না! মনমোহন বগলাকে কহিল, "এবার যখন ডার্বির টিকিট বেচতে আসবে, আমায় বলো। আমি একখানা কিনব।"

বগলা কহিল, "আচ্ছা।"

সে মাসে মাহিনা পাইয়া মনমোহন যখন শান্তির হাতে চব্বিশটি টাকা দিল, তখন শান্তি কহিল, "এক টাকা কম যে!"

একটা ঢোক গিলিয়া মনমোহন উত্তর দিল, "অফিসে কিছু খান ব'লে একটা টাকা কেটে রেখেছি। না খেলে বড় কষ্ট হয়!"

শুনিয়া শান্তি আর কিছু বলিল না। না বলুক, মনমোহনের মনে হইল, আজ ভয়ানক একটা অন্যায় কাজ সে করিয়াছে। স্ত্রী ও আপনার মধ্যে এতদিন কোথাও সে এতটুকু গোপনতা রাখে নাই—আজ এই প্রথম কথাটা বলিয়া অবধি তাহার মন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু না, থাক—এখন বলিয়া কাজ নাই—এতটুকু আভাষ দিবারও প্রয়োজন নাই! মনমোহন পূর্ব্ব হইতেই সব ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। একটা টাকা কাটিয়া রাখিলে অসুবিধা বিস্তর! পঁচিশ টাকাতেও ত টানাটানি করিয়া সংসারের কোন দিকে সামঞ্জস্য আনা যায় না—তাহার উপর এক টাকা কম পড়িলে কষ্ট বাড়িবে বৈ কমিবে না; কিন্তু উপায় নাই! এ কষ্ট সহিতেই হইবে। তবে আর কাহারও উপর সে এ কষ্টের ভার চাপাইবে না, এ কষ্ট নিজেই বহিবে। রাত্রে সে আহার করিবে না—তাহা হইলেই ত সব গোল মিটিয়া যায়। সংসারে ইহাতে খরচও বরং কিছু কমিতে পারে।

মনোমোহন পয়সা জমাইতে মন দিল। সন্ধ্যার পর মাথা একটু ধরিতে থাকে—বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিয়া সে মাথার যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করে! শান্তি আসিয়া কত মিনতি করে, "নিত্যি এমন খিদে নেই ব'লে প'ড়ে থাকচ—এ ত ভাল কথা নয়! ডাক্তারকে ব'লে একটা ওষুধবিষুধ খাও, না হলে বাঁচবে কেন?"

মনমোহন সে কথার জবাব দেয় না। সে ভাবে, এ কষ্ট ক'দিনের জন্যই বা! আর এই ক'টা মাস! তার পর ডার্বির ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া পাঁচ লক্ষ টাকার থলি আসিয়া যখন ঘরে পৌঁছিবে, তখন এ কষ্ট, এ যন্ত্রণা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ হইবে!

পূজার সময় ছেলেরা আসিয়া নূতন কাপড়ের জন্য আবদার ধরিলে মনোমোহন বলিয়া উঠিল, "দুদিন সবুর সয় না? এবার ভাল কাপড়-চোপড় বাজারে কিছু আসেনি। সেই বড়দিনের পর খুব ভাল পোষাক ক'রে দেব'খন।" বাপের কথা শুনিয়া ছেলেরা মুখ চাহিয়া গেল, মার কাছে গিয়া ক্ষুব্ধ বেদনার বেগ ছাড়িল। মা হাসিয়া কহিল, "তোরা চুপ কর্ দেখি, আমি সে বলব'খন।"

ষষ্ঠীর দিন ছেলেরা নূতন কাপড় পরিয়া ও পাড়ায় ঠাকুর দেখিতে গিয়াছিল। তাহারা বাড়ী ফিরিলে মনমোহন কহিল, "এ কাপড় কে দিলে রে তোদের?"

ছোট ছেলে রামমোহন কহিল, "মা দিয়েছে।"

মনমোহন আসিয়া শান্তিকে জিজ্ঞাসা করিল, "এদের কাপড় কি তুমি কিনে দিয়েছ?"

শান্তি রান্নাঘরে ঝোল চড়াইয়া দালানে বসিয়া নৈবেদ্য সাজাইতেছিল। পাড়ায় পূজার বাড়ীতে প্রতি বৎসরই পূজার কয়দিন সে একখানি করিয়া নৈবেদ্য পাঠাইত। স্বামীর কথায় শান্তি কহিল, "হাঁ। আহা, বছরকার দিনে একখানা নতুন কাপড় পরবে না?"

মিলন

চিত্রকর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার সৌজন্যে

মনমোহন কহিল, "পয়সা পেলে কোথায় ?"

শান্তি কহিল, "সেদিন রায়েদের বাড়ী আমায় সধবা করেছিল—তারা একখানা নতুন কাপড় আর দুটো টাকা দিয়েছিল, সেই টাকা, আর তার উপর ঘর থেকে কিছু দিয়ে কিনে দিয়েছি।"

মনমোহন গভীর স্বরে বলিল, "আর কখনো দিয়ো না। গরীবের ছেলের অত নবাবী ভালো নয়। গরীবের ছেলে গরীবের মত থাকবে।"

কোনমতে "আচ্ছা" বলিয়া শান্তি চোখের জল চাপিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

৫

অফিস হইতে ডার্বির টিকিট কিনিয়া সন্ধ্যার সময় মনোমোহন চোরের মত সন্তর্পণে যখন ঘরে ঢুকিল, শান্তি তখন মাথার যন্ত্রণায় কাতর হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। চোখে যেন কে লঙ্কা গুঁজিয়া দিয়াছে, চোখ এমনি জ্বালা করিতেছিল—তাহার উপর মাথাও একেবারে যাতনায় খসিয়া যাইতেছিল—মাথা তুলিবার শক্তি ছিল না। মনমোহন শান্তিকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এতদিন একসঙ্গে ঘর করিতেছে, কৈ, কখনো ত শান্তিকে সে এমন অবেলায় শুইতে দেখে নাই। ডার্বির টিকিট বাক্সে বন্ধ করিয়া শান্তির কাছে আসিয়া সে ডাকিল, "শান্তি—"

"উঁ" শান্তি আর কিছু বলিতে পারিল না, চোখও খুলিল না। তাহার মাথার শিয়রে বসিয়া মনমোহন শান্তির কপালে হাত দিল, উঃ, আগুন যে হাত যেন পুড়িয়া গেল। "তোমার খুব জর হয়েছে শান্তি—"

অতি কষ্টে শান্তি চোখ চাহিল। বলিল, "তাকের উপর সন্দেশ আছে, নিয়ে খাও, জল এক গ্লাস গড়িয়েই নিয়ো, আমি মাথা তুলতে পারছি না—"

"ছেলেরা কোথায় ?"

"তারা ভাবিনীদের বাড়ী গেছে—ওদের ওখানেই চাল-ডাল পাঠিয়ে দিছি, খেয়ে আসবে তারা—তোমার ভাত ওদের বামুন এসে দিয়ে যাবে।"

মনমোহন গামছাটা ভিজাইয়া শান্তির কপালে টিপিয়া ধরিল। শান্তি একটু আরাম পাইয়া বলিল, "আঃ !"

তার পর অনেকক্ষণ আর কাহারো মুখে কোন কথা ফুটিল না। শান্তি জরের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনমোহন একবার ব্যাপারটা আগাগোড়া তলাইয়া দেখিতেছিল। শান্তির এই জর—রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া, তাহার উপর রোগীর সেবা, ঔষধ চাই, ডাক্তার চাই, কি করিয়া সে ভাল হইবে, আর, ভাবনার কি অন্ত আছে। কি বিষম দুর্ভাগ্য লইয়াই সে জন্মিয়াছিল রে !

পাশ ফিরিয়া শান্তি কহিল, "খাবার খেলে ?"

"খাচ্ছি" বলিয়া মনোমোহন আবার চুপ করিয়া রহিল। নিস্তব্ধ ঘরটা যেন কি বিভীষিকায় ভরিয়া উঠিতেছিল। দারুণ অস্বচ্ছন্দতায় মনমোহনের চিত্তটা অবশ কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে একা, নেহাৎ বেচারা, কি করিয়া এখন কোন্ দিক সে সামলাইবে !

শান্তি তাহার রোগতপ্ত হাত দুইটা স্বামীর কোলে বিছাইয়া দিল, মাথাটাও মনমোহনের হাঁটুর কাছে সরাইয়া আনিল, বলিল—"খাও না গা—মুখ-হাত ধোও না—"

"কখন্ জ্বর হ'ল, শান্তি! কৈ, ওবেলায় ত কিছু বলনি।"

"ব'লে কি হবে.—জ্বর হয়েছে আজ দু'দিন—চেপেচুপে রেখেছিলুম। ভেবেছিলুম, উপোষ দিলেই সেরে উঠ্‌ব। আজ রান্না করতে ব'সে আর পারছিলুম না—কোনমতে খাইয়ে-দাইয়ে হেঁসেল পেড়ে ঘরে এসে শুয়ে পড়েছি। হুঁস ছিল না—ভাবিনীর মা বেড়াতে এসেছিলেন—তিনি এই একটু আগে গেলেন—তাঁর হাতে-পায়ে ধরে তোমাদের এবেলার খাবার ব্যবস্থাটা করিয়েছি।"

মনমোহন কোন কথা বলিল না—একদৃষ্টে পত্নীর জ্বর-পীড়িত মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শান্তির সমস্ত মুখ যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে—জ্বরের ঝাঁজে দুই গাল একেবারে টক্‌টকে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া শান্তি ভাল হইবে। সে যে বড় আশায় ডার্বি'র টিকিট কিনিয়াছে—দশ টাকা খরচ করিয়া। এই অসুখটা আর দুই মাস পরে হইলে ত কোন ভাবনা থাকিত না—তখন দুই চারি লাখ টাকার মালিক সে—মুখের কথা খসাইতে না খসাইতে বাড়ীতে ডাক্তারের ভিড় জমিয়া যাইত। দেখিবার শুনিবার, সেবা করিবার লোকেরও কি অভাব থাকিত। আর এখন? হায় রে কপাল। অস্বস্তির জ্বালায় মনমোহনের প্রাণটা জ্বলিয়া উঠিল।

শান্তি বলিল, "খেলে না? কি ভাব্‌চ?"

মনমোহন বলিল, "তাই ত—এক জন ডাক্তার চাই ত—কাকে ডাকি।"

মৃদু হাসিয়া শান্তি বলিল, "ডাক্তার কি হবে? এ আপনিই সেরে যাবে'খন। তবে ক'দিন কষ্ট হবে—এই যা ভাবনা।"

মনমোহন বলিল, "না, ডাক্তার এক জন চাই বৈ কি শান্তি। এত জ্বর।"

"তুমি পাগল হয়েছ?" কথাটা বলিয়া শান্তি এমন একদৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিল যে, মনমোহনের বুকটা ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। নৈরাশ্যে সমস্ত গা ছমিয়া উঠিল।

শান্তি কহিল, "ভয় নেই, আমি মরবো না। আমি ম'লে তোমার বড় কষ্ট হবে। এ সব ঝক্কি তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে আমি মরতে পারি কখনো?"

শীতের প্রভাতে একটু নাড়া পাইলে গাছের পাতা হইতে ঝর-ঝর করিয়া যেমন শিশিরবিন্দু ঝরিয়া পড়ে, শান্তির কথার ঘায় মনমোহনের দুই আঁখির পাতা হইতে ঝরঝর করিয়া তেমনি অশ্রুর বিন্দু ঝরিয়া পড়িল।

সারারাত্রি সে দিন মনমোহনের বুকে একটা পাথর যেন আঁটিয়া বসিয়া রহিল। শান্তির অসুখ, ডাক্তার, ঔষধ, পয়সা, নানা চিন্তায় উদ্‌ভ্রান্ত কাতর বেচারা শেষরাত্রে কখন্ যে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা সে বুঝিতেও পারিল না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন ঘরে রৌদ্র আসিয়াছে—শান্তি ঘরের বাহিরে কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে। মনমোহন উঠিয়া দেখিল, ভাবিনীদের বাড়ীর ঝী।

শান্তি বলিল, "ভাবিনীর মা সাবু পাঠিয়েছেন। তোমাদের দু'বেলাই আজ ওখানে খাবার কথা ব'লে দিয়েছেন।"

ঝী চলিয়া গেলে শান্তি ঘরে আসিয়া বসিল। মনমোহন তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "জ্বরটা কম আছে এখন, না?"

শান্তি বলিল, "হাঁ।"

মনমোহন বলিল, "কার কাছে যাই, বল দেখি?"

"তার মানে?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শান্তি মনমোহনের পানে চাহিল। মনমোহন বলিল, "কোন্ ডাক্তারকে ডাকি?"

শান্তি বলিল, "তুমি পাগল করবে দেখ্‌চি। কাকেও ডাকতে হবে না গো—এম্‌নি সেরে যাবে'খন। এই ত আজ অনেকটা ভালো আছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে আপিস যাও।"

মনমোহন ভাবিতেছিল, আহা, তাই হোক্। কিন্তু তাই ত, যদি না সারে? কি করা যায়! ডাক্তার ডাকিলে এখনই কতকগুলা টাকা ব্যয় হইবে! অনর্থক ব্যয়। অথচ এতগুলা টাকা আসে কোথা হইতে? জ্বর কি মানুষের হয় না? সারেও ত। ডাক্তার ডাকিলেই যদি রোগ সারিত, তাহা হইলে—তাহা হইলে ঐ ত মিত্তিরদের বড় বাবু—মাথা ধরিতেই সাহেব ডাক্তার আনাইত ত—তিন দিনের মধ্যে মরিয়া যাইবে কেন? সাত আটটা ডাক্তার দিবারাত্রি ত মাথার কাছে বসিয়াছিল—চব্বিশ ঘণ্টা! আর গরীব-গুর্ব্বোর দল এককোঁটা ঔষধ মুখে না দিয়াও ত সারিয়া উঠিতেছে। তবু আপিস যাইবার সময় বুকটা কেবলি ধক্ ধক্ করিতেছিল—শান্তির কথা না মানিয়া ডাক্তার ডাকিলেই ভাল ছিল। কি জানি! কিন্তু এখন বেলা হইয়া গিয়াছে—এত বেলায় ভালো ডাক্তার পাওয়া যাইবে কি?

আপিসে গিয়া কাজকর্ম্মে তেমন মন লাগিল না—এক-একবার কি এক অজ্ঞাত ভয়ে শিহরিয়া সে দুই হাতে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া পড়ে, আবার চকিতে আশার আলোয় চারিধার রাঙিয়া উঠে। দুইটা মাস শুধু। তার পর শান্তিকে লইয়া, ছেলেমেয়েদের লইয়া সে পশ্চিমে চলিয়া যাইবে—দুই মাস, তিন মাস, চার মাস সেখানে থাকিবে! চার লাখ টাকা—দার্জ্জিলিঙে একটা বাড়ী অনায়াসে কেনা যাইতে পারে। দার্জ্জিলিঙের হাওয়ায় শান্তির এই শীর্ণ-জীর্ণ স্বাস্থ্য একেবারে সারিয়া উঠিবে!

সন্ধ্যার সময় বাড়ী আসিয়া মনমোহন দেখিল, শান্তির গা গরম—তবে অল্প ঘাম হইতেছে। শান্তি বলিল, "দুপুরবেলা জ্বরটা বেড়েছিল—আর এখন ছাড়্‌চে।"

ঘাম দেখিয়া মনমোহন একটু ঠাণ্ডা হইল।

রাত্রে—তখন বোধ হয় একটা কি দুইটা,—ঘুমন্ত হাতটা শান্তির গায়ে পড়িতে মনমোহনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। গা পুড়িয়া যাইতেছে—খুব জ্বর। মনমোহন ধড়মড়িয়া উঠিয়া দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে বসিল। রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া কত বিচিত্র শব্দতরঙ্গ উঠিতেছিল - কত ছবি বিভীষিকার ঘূর্ণি তুলিয়া তাহার চারিধারে নৃত্য করিতেছিল। মনমোহন স্থির থাকিতে পারিল না—তাহার দুই চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। উপায় নাই রে, উপায় নাই। সে কপর্দ্দকহীন—দুইটা টাকা ঘরে নাই, যাহার জোরে সে একটা যা-তা ডাক্তারকেও ডাকিয়া আনিতে পারে।

ভোরের দিকে শান্তির জ্বর ছাড়িল। সকালবেলাটা সে বেশ মাথা ঝাড়িয়া উঠিল—রান্নাঘরে গিয়া ভাতে-ভাত রাঁধিয়া দিল। মনোমোহনের সতর্ক সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ হাসিয়া উড়াইয়া দিল।

সে দিনটা ভালই গেল। সন্ধ্যার দিকেও জ্বর আসিল না, রাত্রেও না। মনমোহন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য!

৬

তিন দিন পরে জ্বর আরো ভীষণ মূর্ত্তি লইয়া শান্তিকে চাপিয়া ধরিল। মাথায় যন্ত্রণা—নিঃশ্বাস ফেলিতে বুকে ব্যথা লাগে, সর্ব্বাঙ্গে পাকা ফোড়ার মত বেদনা। মনমোহন পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া ডাক্তার আনিল,—ডাক্তার আসিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগী দেখিয়া গম্ভীরমুখে প্রেস্ক্রেপসন লিখিয়া দিলেন। মনমোহন কম্পিত-কণ্ঠে কহিল, "সারবে ত?"

ডাক্তার গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বলতে পারি না। দেহে এতটুকু রক্ত নেই।"

মনমোহন প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল। ডাক্তার বলিলেন, "গোড়ায় খুবই অবহেলা করেছেন। নিউ-মোনিয়া—দুটো দিকই খারাপ।"

* * * *

একগাদা ঔষধ লইয়া আসিয়া মনমোহন অবহেলার প্রায়শ্চিত্তে মন দিল। তাহার এক একবার মনে হইতেছিল, ঐ বগলার মাথায় প্রচণ্ড ঘুষি বসাইয়া দেয়। তাহার এ ছোট নীড়টুকুতে সে-ই ত দুরাশার ঝড় বহাইয়া সেটাকে আজ নষ্ট করিয়া দিল। না খাইয়াই বেচারী শান্তির এই রোগ। আজ সাত আট মাস ধরিয়া তাহারই সঙ্গে শান্তি রাত্রেও আহার ছাড়িয়া দিয়াছে। মাসের অর্দ্ধেক দিন ফেন খাইয়াই কাটাইয়াছে। এমনি করিয়াই তাহার সংসারের ফাঁক সে প্রাণপণে বুজাইয়া আসিয়াছে। ছেলেদের নূতন কাপড় জামা স্কুলের মাহিনা সব সে জোগাইয়া আসিয়াছে নিজের বুকের রক্ত দিয়া। কোথা দিয়া কি করিয়া সংসার চলিতেছে, সে কি তার কোন খোঁজ লইয়াছে, কোন দিন লাখ টাকার নেশায় বিভোর হইয়াছিল সে! আজ তাই ঐ ডার্বির টিকিট কি অশুভক্ষণে ঐ বাতিক ভূতের মত তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছিল।

* * * *

আজ তিন মাস শান্তি রোগে ভুগিতেছে। ক্ষীণ দেহ দিন-দিন শুকাইতেছে।

সেদিন সকালে বগলা আসিয়া ডাকিল, "মনু—"

মনমোহন বাইরে আসিল। বগলা বলিল, "থ্রী চিয়ার্স, তোর নামে ঘোড়া উঠেছে—ও ঘোড়া ফার্ষ্ট-সেকেণ্ড না হয়ে যায় না। মেরিগোল্ড—মেরিগোল্ড—ডিউক্ অফ্ টাস্কোনির মেরিগোল্ড আরবারে ফার্ষ্ট প্রাইজ নেছে।"

মেঘান্ধকারে বিদ্যুতের আলো ফুটিলে পথিক যদি চাহিয়া দেখে, সে তাহার গৃহের দ্বারেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তাহা হইলে সে যেমন আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়ে, এই ঘোর বিপদের মধ্যে এ সংবাদে মনমোহনের প্রাণটাও তেমনি আনন্দে নাচিয়া উঠিল। কূল মিলিয়াছে রে, কূল মিলিয়াছে। আর ভয় নাই। শান্তি বাঁচিবে। টাকাটা হাতে এবার পাইলে হয়, তাহা হইলে তখনই ইন্‌ভ্যালিড্ বেপুন রিজার্ভ করিয়া ওয়াল্‌টেয়ার, নয় আলমোরা কোথাও সে শান্তিকে সেই দণ্ডে লইয়া যাইবে। যক্ষারোগের পক্ষে ঐ জায়গা দুইটা আশ্চর্য্য রকমের স্বাস্থ্য-নিবাস।

রাত্রে শান্তি ঘুমাইতেছিল—ঠিকাদাসী শিবুর মা শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতেছিল। মন-মোহন বাহিরে আসিল। জ্যোৎস্না যেন গভীর আনন্দে পৃথিবীর গায়ে ঢলিয়া পড়িয়াছে। আলোয় আলোয় চারিধার ভরপুর। মনমোহন তাক্ হাতড়াইয়া কতদিনকার পুরাতন টাইমটেব্‌ল লইয়া ঘরে ঢুকিল। প্রদীপের

আলোয় পাতা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া কাগজে হিসাবের অঙ্ক ফেলিল—সঙ্গে কোন্ ডাক্তার যাইবে, কয়টা নার্স, কত খরচ হইবে, তাহার একেবারে পাকা রকমের ফর্দ্দ পাড়িয়া কাগজটাকে ভরাইয়া ফেলিল।

হঠাৎ দাসী ডাকিল, বাবু একবার এদিক্‌পানে আসবেন, মনমোহন লাফাইয়া উঠিল, শান্তির কাছে আসিয়া বসিল। শান্তির দুই গাল বহিয়া রক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

মনমোহন খালি গায়েই ডাক্তারের বাড়ী ছুটিল। তারপর নানা কল, যন্ত্রপাতি, গ্যাসের চোং লইয়া মৃত্যুর সহিত শেষ রাত্রিটা তুমুল সংগ্রাম চলিল।

ভোরের দিকে বগলার সাড়া পাওয়া গেল, বাহিরে আসিয়া হাঁক পাড়িতেছে—"মনু—ওহে মনু—"

ঐ! টাকা—টাকা! আসিয়াছে!

মনমোহন ডাকিল, "শান্তি, টাকা এসেছে—" শান্তি সে কথা শুনিল কি না, তাহা গ্রাহ্য না করিয়াই মনমোহন লাফাইতে লাফাইতে একেবারে দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বগলা কহিল, "কাল আর খবরটা দিতে আস্‌তে পারিনি, ভাই, তোর wifeএর খুব অসুখ না?"

"শেষ মুহূর্ত্ত!"

"এঁ্যা, বলিস্ কি?"

"যাক্—তবু সে শুনেও যায়, যদি—বল, কি খবর?"

"মেরিগোল্ড মাঝরাস্তায় খোঁড়া হয়ে যায়—ছুটতে পারেনি, তার এসেছে। এ নিশ্চয় বেটাদের বদ-মায়েসী, একেবারে foul means।"

মনমোহনের মাথা ঘুরিতেছিল—শেষের কথাগুলা তাহার কানেও গেল না। সে মুর্চ্ছিতের মত সদরের কপাট ধরিয়া বসিয়া পড়িল। যখন সে ভাবটা কাটিল, তখন ভিতরে ছেলেমেয়েরা জাগিয়া উঠিয়া বিরাট্ ক্রন্দন তুলিয়া দিয়াছে—"মা—অ-মা,—মাগো—"

মনমোহন টলিতে টলিতে সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার তখন যন্ত্রপাতি তুলিয়া নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ির উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। মুখ মলিন। মুখে তাঁহার যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পাশার বাজি

বন্দী মারাঠী মুক্তি লভিল? মোগল জিনিল ছলে!
আরংজেবের চিত্ত ভরিল হিংসার হলাহলে;
গর্জ্জি উঠিল দানবের দূত—
চক্ষে ঝলিল রোষ-বিদ্যুৎ,
'মোয়াজেমে আজই ভেজি' দস্তখৎ—ছলে না পারুক, বলে
বাঁধিয়া আনুক অধম কাফের তক্ত-তাউস-তলে।

বাদশা-আদেশ বুকে বাঁধি' দূত উঠিল অশ্বযানে;
ছিলা-ছেঁড়া তীর ছুটে' চলে যেন না—চাহি' কাহারও পানে।
ওমরাহ যত আগ্রা নগরে
নীরবে ফিরিল যে যাহার ঘরে;
সে দিনের মত দরবার হ'ল চুরমার সেইখানে,
বুকে বাঁধি' খৎ ছুটে' চলে দূত, বিরাম নাহিক জানে।

*　　*　　*　　*

ঘরে বিজাপুর ঈর্ষ্যাআতুর, বাহিরে প্রলয়-ঝড়
মোগলের মেঘে উঠিয়াছে জেগে ঘনাইয়া অম্বর।
ক্ষুব্ধ শিবাজি রায়গড়শিরে
ভাবিছেন বসি' সন্ধ্যাতিমিরে,
শতবার 'কবি' ডাকি' ভবানীরে মাগিছে বিজয়-বর;
কয়দিন হ'ল মোগলের হাতে গিয়াছে সিংহগড়।

প্রতাপগড়ের ছাদে বসি' হোথা বিমল জীজাবাই—
হাতীর দাঁতের চিরুণীতে চুল বাঁধিছেন সন্ধ্যায়।
সম্মুখে দূরে পশ্চিমকোণে
দৃষ্টিটি তাঁর ধায় আনমনে,
সিংহগড়ের ঊর্দ্ধে যেখানে সূর্য্য অস্ত যায়—
আরক্ত-আভা ডিম্বের মত গম্বুজ-কিনারায়।

সহসা কি ভাবি' উঠিলা জননী—বেণী বাঁধা রহে বাকী,
সিপাহীরে হাঁকি করিলা আদেশ—'শিবাজীরে আন ডাকি;—
রায়গড়মাঝে যেখানে সে থাক্,
যা-কিছু করুক—থাক্ বা ঘুমাক্—
জরুরী তলব—এখনি সে আসে শত কাজ ফেলি' রাখি।'
মুখপানে চাহি' ভাবিল সিপাহী—মা আজ ক্ষেপিল না কি!

জননী-আদেশে নিমেষে পুত্র দুয়ারে দাঁড়া'ল আসি'—
'কৃষ্ণা'য় চড়ি' বীরবেশ পরি', ললাটে ভ্রূকুটিরাশি।
বন্দিয়া মার চরণ দু'খানি
কহিলা পুত্র যুড়ি দুই পাণি—
'যে আদেশ হয় কর মা জননী মনে বড় ভয় বাসি।'
আশিষ-হস্ত বুলায়ে ললাটে মা কহিলা মৃদু হাসি'

'বড় সাধ মনে—পুত্রের সাথে খেলিব আজিকে পাশা—'
'মার সাথে বাদ'—কহিলা শিবাজী—'খেলাও সর্ব্বনাশা।'
অনিচ্ছা তার মনে মনে মানি'
কহিলা জননী বিদ্রূপবাণী—
'মার সাথে বাদ ঘটিবে খেলায়। এ দেখি যুক্তি খাসা!'
মনে-মনে শুধু ডাকিলা—'ভবানি। পুরাও মনের আশা।'

চকিতে জননী বিছাইলা ছক পাষাণশিলার পর—'
শুরু হ'ল খেলা—ডাকিল পাষ্টি কড়্কড়্—গড়্গড়্!
ফেলে জীজাবাই যত বড় দান
মৌন শিবাজী তত ম্রিয়মাণ—
পাকা ঘুঁটি হারি শঙ্কিত প্রাণ—থর থর কাঁপে কর—
যত যায় খেলা, তত বাড়ে রোখ্, ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর!

জিনিয়া তনয়ে পড়ে শেষ পাশা কড়-কড়—গড়-গড়—
হাঁকে জীজাবাই বিজয়মন্ত্রে—'কি পণ ধরিবি ধর্'!
ধীরে কহে শিব—'তোমার তনয়,
যতই বল' মা, রাজা আর নয়—
যা আছে তা লও'—দ্বাদশগড়ের নাম করি' পর-পর;
হাঁকি' কয় রাণী—'চাহি নাক কিছু—শুধু সে সিংহগড়!'

—'আর কি তা হয়!' কহিলা শিবাজী—করে হানি' নিজ শির,
সিংহগড় যে অভেদ্য আজি—নিজে উদীভান বীর
বসায়েছে থানা তাহার উপরে,
অটল পাহারা দিবসে দু'পরে,
অসংখ্য সেনা ফিরে তার পরে করে ধরি' ধনুতীর।'
'শাপে জ্বালাইব রাজ্য তোমার'—উত্তর জননীর।

'তবে তাই হোক্, যা করিতে পারি কৃপায় ভবানী মা'র'—
'সেই ত তাঁহার মনের ইচ্ছা'—কহে মাতা বাছার।
'অক্ষম বাহু আলস্যে খুয়ি',
দৈবে যে করে নিজ দোষে দুষী—
সে শুধু কেবল কাপুরুষ নয়—সে ঘোর কুলাঙ্গার,
পাপে জলে যাবে ধর্ম্ম তাহার, রাজ্য ত কোন্ ছার।

ডেলী প্যাসেঞ্জার

চিত্রকর শ্রীযুত বীরেশ্বর সেনের সৌজন্যে

কম্পিত হিয়া 'অভিসম্পাতে, ভবানীরে স্মরি' ডরে,
নানা অনুনয়ে জননীরে শিব লয়ে গেলা রায়গড়ে ;
বহু বিতর্ক চিন্তার পর
পত্র লিখিয়া পাঠাইলা চর
উমরাটি হ'তে আনিতে ত্বরিতে তানাজী মালেশ্বরে—
বাল্যবন্ধু, রাষ্ট্রতিলক, গৌরব-ভাস্বরে।

* * * *

উমরাটিপুরে সুবেদার-গৃহে সে দিন বাজিছে বাঁশী,
তানাজী-পুত্র রায়বার বিয়ে ; প্রমত্ত পুরবাসী ,
নানা আয়োজন, ভারি ধুমধাম ,
নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম ,
দাঁড়াইল বর—বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি—
এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়া'ল আসি'।

পাঠ করি' লিপি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিলা মালেশ্বর,—
'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে' ফেল, বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ
তারই লাগি সবে পর নব সাজ,
সেই মিলনের শুভলগ্নের সময় অগ্রসর—
রে বরযাত্রি ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর !

লিপির বারতা শুনিলা সকলে সাগ্রহে 'পাতি কান,
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান !
উৎসবপুরে পুরনারী যত
শুনিলা সে বাণী স্বপ্নের মত,
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত, তবু নহে ম্রিয়মাণ,
নব উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান।

বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য সাজিল বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড-তেজে চলিল তানাজী ধেয়ে।
রায়গড়ে আসি' রাজারে শুধায়—
'কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?'
উত্তর শুধু করিলা শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
'বন্ধু, তোমায় আমি ডাকি নাই—ভবানী মায়ের মেয়ে !

জননী অমনি তানাজীর মুখে ধরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি' ললাট পরশি' বালাই লইলা টানি' ;
কহিলা মধুর-গম্ভীর-রবে
'সিংগড় মোরে জিনে' দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি'—
তানাজীর মুখে অপূর্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !

হাকি' পুনরায় কহে জীজাবাই 'ছি ! ছি ! তোরা—কাপুরুষ!
বীরের কর্ম্ম আপন ধর্ম্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা আচার
ধর্ম্ম যজ্ঞ বিবেক বিচার—
চরণে দলিত হেরি' বারবার, তথাপি হয় না হুঁস—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্ম্মে লুকায়ে পুস্ !

'দেখিস্ না চেয়ে চোখের উপরে কিবা হয় দিনরাত,
পাপ সে হাসিয়া পুণ্যের শিরে করিতেছে পদাঘাত ;
দরিদ্র দীন মূক অসহায়
ধনীর দুয়ারে আপনা বিকায়,
দম্ভী দর্পী হেলায় ঘৃণায় হেসে করে দৃক্‌পাত —
শুধু গড় নয়, যা-কিছু তোদের গেল যে পরের হাত !

'তবু বেঁচে থাকা—তবু প্রাণ রাখা পদে পদে সহি' গ্লানি,
মারাঠার বুকে হেরি' হাসিমুখে মোগলের রাজধানী!
সাজি' তারই দাস, তাহারই নফর,
বিলাইয়া দিলি আপনার ঘর,
মসী-অঙ্কিত ললাটের পর তিলকপঙ্ক টানি'—
মহারাষ্ট্রের হেন কলঙ্ক সহিবে কি মা ভবানী?

'তাই থাক্ তোরা লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবরমাঝে,
থাক বারো মাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে;
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল,
মিছে বেঁচে থাকা হয়ে জঞ্জাল.
আপনার মান পরেরে বিকায়ে স্বাচ্ছন্দ্যভরা লাজে—
সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে!'

রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তানাজী—'তাই হবে, তাই হবে,—
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জিত গৌরবে;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ,
ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক-লাজ,
অথবা পরাণ সঁপি দিব আজ মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে!'

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি' গেলা বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য চলিল সঙ্গে ঘিরে।
সিংহগড়ের দুর্গ চূড়ায়
সূর্য্য তখন স্বর্ণ কুড়ায়,
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় 'ভর্জী'-শৈলশিরে;
দূরে সেনা রাখি' চলিলা তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে।

তার পর যাহা— ইতিহাস তাহা শোনে নাই কোন সালে;
সত্য যাহার স্বপ্নের মত— দীপ্ত ইন্দ্রজালে!
        থার্মোপলির পুণ্য-কাহিনী,
        হলদীঘাটের ধন্য বাহিনী—
অপূর্ব্ব কথা— তুলনা পাইনি তবু এর কোন কালে,
ভাগ্য যে লিপি লিখিলা সে দিন মহারাষ্ট্রের ভালে।

*   *   *   *

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর;
শুনিলা সকলে সভয়ে গলে জয় সে ভয়ঙ্কর।
        জীজাবায়ে শুধু কহিলা শিবাজী—
        'জননি, তোমার বাজি লও আজি,
সিংহগড়ের সিংহ গিয়াছে— পড়ে' আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর।'

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

জঞ্জাল

১

প্রতি বৎসরেই 'মিউনিসিপ্যাল ইলেকশনে'র সময় সহরে একটা ঘোরতর গোলযোগ ঘটিয়া থাকে। সহর হইতে প্রায় এক কোশ দূরে 'ভোটারে'র সৈন্য একটা ময়দানে একত্রিত হয়। অনেকগুলি তাঁবু পড়িয়া যায়। দোকান বসিয়া যায়। সদর মহকুমার ডিপুটী বাবু আসিয়া ভোটের সংখ্যা যথারীতি লিপিবদ্ধ করেন। সেই জন্য হুলস্থুল ব্যাপার হইয়া পড়ে। ৬ নং ওয়ার্ড একটি বিখ্যাত স্থান। অনেক ভদ্রলোকের বাস একটি খৃষ্টানী মিশনের আড্ডা। অনেক খৃষ্টান ও মুসলমান অধিবাসী। তাহাদের মধ্যেই 'ভোটারে'র সংখ্যা বেশী। 'মিশন হাউস্' একটা বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়িয়া। স্বত্ব মোকররি। জমীদার শ্রীযুক্ত নটবর প্রামাণিক। প্রামাণিক মহাশয়ের প্রজা বেশী ভাগই খৃষ্টান। অল্পস্বল্প মুসলমান। অনেকবার প্রামাণিক মহাশয় প্রজা কর্ত্তৃক মিউনিসিপ্যাল কমিশনরীর জন্য 'ক্যাণ্ডিডেট্' স্বরূপ খাড়া হইতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু সংসার-বৈরাগ্যের ভাব বহুদিন হইতে তাঁহাকে অধিকার করাতে তিনি এ পর্য্যন্ত উপরিউক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য চেষ্টা করেন নাই, সুতরাং সেই তৌজির অন্যতম মালিক হরিহরপ্রসাদ প্রতিবার দাঁড়াইয়া গিয়া নির্ব্বাচিত হইতেন। এবার হরিহরপ্রসাদ গয়াক্ষেত্রে মানবলীলা সংবরণ করাতে ৬ নং ওয়ার্ডে বিভূতিবাবু উকীল 'ক্যাণ্ডিডেট' দাঁড়াইয়া গেলেন। বিভূতিবাবু প্রামাণিক মহাশয়ের চিরশত্রু কেনারাম মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উকীল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় নিকটস্থ মৌজার পত্তনীদার। প্রায়ই তাঁহার সহিত প্রামাণিক মহাশয়ের সীমা লইয়া বিবাদ ঘটিত, কিন্তু তিনি প্রায়ই মোকদ্দমাগুলি স্বীয় খৃষ্টান ও মুসলমান প্রজাগণের সাক্ষ্যবলে জিতিয়া লইতেন। এবার বিভূতিবাবু মিউনিসিপ্যাল কমিশনর হইলে প্রামাণিক মহাশয়ের প্রতিপত্তির লাঘব হইবে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমার তদ্বির করা কঠিন হইবে, তাহা তাঁহার প্রজাগণ সম্পূর্ণভাবে বুঝিতে পারিয়া, প্রামাণিক মহাশয়কেই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মদেবের ন্যায় খাড়া করিয়াছিল।

প্রামাণিক মহাশয় নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রথমে একটা আতঙ্ক হইয়াছিল, কিন্তু সেই আতঙ্ক হইতে সাহস জন্মাইয়া গেল। পূর্ব্বে যাহার সাহস প্রচ্ছন্নভাবে চরিত্রে লুক্কায়িত থাকে, পরে তাহা বাহির হইয়া গেলে ঘোরতর ও মূর্ত্তিমান্ হইয়া পড়ে। কাজেই নটবর বাবুর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা চঞ্চল হইয়া পড়িল। তিনি প্রাতঃকালে ও প্রদোষে যে হরিনামের মালা জপ

করিতেন, তাহা তাঁহার স্ত্রী গিরিবালার গহনার বাক্সে রাখিয়া 'ক্যানভাস' করিতে আরম্ভ করিলেন।

খৃষ্টান ও মুসলমান ভোটার একত্র হইয়া প্রামাণিক মহাশয়ের পক্ষে ভোট দিলে বিভূতিবাবুর পরাজয় নিশ্চয়। কিন্তু রটিয়া গেল যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্যালক 'মিষ্টার ব্যানারজি' নামক এক জন লাইফ ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্টবাবু, গোলাম আলি নামক এক জন মুসলমানকে হাত করিয়া ও মুসলমান ভোটারগণকে ভাঙ্গাইয়া শত্রুপক্ষের দলে লইয়া গিয়াছে।

ইহাতে প্রামাণিক মহাশয়ের আক্রোশ বাড়িয়া গেল। তিনি দুই হাতে পয়সা খরচ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া গেলেন।

গোলাম আলি মিয়া এক জন 'হাকিম্' (মুসলমান বৈদ্য)। 'মিউনিসিপ্যাল ইলেক্‌শনে'র সময় স্নায়বিক চঞ্চলতাপ্রযুক্ত অনেকের রোগ জন্মিয়া যাইত। কাহারও আমাশয়ের, কাহারও ফুসফুসের, এবং কাহারও মস্তিষ্কের। হাকিম সাহেব 'মিউনিসিপ্যাল সফুফ' নামক পুরিয়া বিক্রয় করিয়া সেই সময় দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেন। এবার অধিবাসিগণের অবস্থা অন্যান্যবার অপেক্ষা অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়াতে তিনি কতকগুলি পুরাতন পুরিয়ার সহিত গোলমরিচের গুঁড়া ও কাবাবচিনি মিশ্রিত করিয়া 'নবীন পুরিয়া' তৈয়ারি করিলেন। গোলাম আলির খানসামা খুসরু নামক বালক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঔষধগুলি লইয়া একত্র করিয়া খলে চূর্ণ করিতে আরম্ভ করিল।

২

প্রামাণিক মহাশয়ের চেষ্টা ও সাহস এবং ব্যয় সত্ত্বেও মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ—মিষ্টার ব্যানারজির বুদ্ধি ও শ্রমশীলতা। মিষ্টার ব্যানারজিকে নবীন যুবক বলিলেও চলে, তবে তাঁহার বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসর পার হইয়া যাওয়াতে অনেকে তাঁহাকে 'পুরাতন যুবক' অর্থাৎ 'ওল্ড ফেলো' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইহাতে ব্যানারজি খুব খুসী হইয়া রুমাল মুখে দিয়া হাসিতেন। ব্যানারজির হ্যাট্-কোট-টাই, সকলই নূতন ফ্যাসনের—'অপ্-টু-ডেট্'। সুতরাং তাঁহাকে দেখিলে সকলেই 'গুডমর্ণিং' কিংবা 'সেলাম,' কিংবা অন্ততঃ একটা নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিত না। বিশেষতঃ তাঁহার চেহারা ফর্সা, এবং চালচলন ভদ্রলোকের মত, পকেটে চামড়ার সিগার-কেস, হস্তে সুবর্ণের রিষ্ট-ওয়াচ্ ও গোঁফের লেশমাত্র নাই। এমন কি, একবার অক্সফোর্ড মিশনে তিনি খৃষ্টান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে গিয়াছিলেন, পথিমধ্যে বাইসিকেল্ হইতে পড়িয়া যাওয়াতে, তিনি পূর্ব্বসংস্কারক্রমে সেটাকে বাধা বিবেচনা করিয়া, গন্তব্য পথের শেষে উপনীত হইতে পারেন নাই। সেই অবধি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্ত্রী (ব্যানারজির ভগ্নী) ভ্রাতাকে 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' নামক বিখ্যাত উপদেশ দিয়া চরিতার্থ করিতেন।

ব্যানারজির কর্মপটুতা দেখিয়া মিসেস্ এনড্রুজ (তিনি মিশন-স্কুলের বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী) চিন্তিতা হইয়া পড়িলেন। নটবর প্রামানিক মহাশয়ের কন্যা 'সুধা প্রামাণিক' কিংবা মিস্ প্রামাণিক তাঁহার ছাত্রী। প্রামাণিক মহাশয় খৃষ্টানদিগের সংবাসে থাকিয়া অতিশয় উদার-চরিত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুধা প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া ইংরাজী বহি ও তাহার বাঙ্গলা তর্জমা, সেলাই ও বুনানি, এবং আদব-কায়দা বিলক্ষণ-রূপে অভ্যাস করিয়াছিল। সুধার চেহারা সুশ্রী ও রং ফর্সা। এমন কি, সুধা খৃষ্টান হইয়া গেলে কোনও উচ্চদরের সাহেব তাহাকে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে। কোনো বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারের সহিত সুধার বিবাহ দিলে জমীদারী রক্ষা হইবে, এবং সুধার উপযুক্ত বর জুটিবে, ইহাই মনে করিয়া প্রামাণিক মহাশয় ও তাঁহার স্ত্রী গিরিবালা একরকম নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন; এমন কি, প্রায় সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেও সুধার - বিবাহ হয় নাই।

সুধার মাও তাঁহার স্বামীর ন্যায় উদারচরিত্রা। মিসেস্ এনড্রুজকে তিনি ভগ্নী (দিদি) বলিয়া ডাকিতেন, তবে একত্র বসিয়া কখনও আহার করেন নাই। সুধা কখনও লুকাইয়া চার সঙ্গে বিস্কুট কিংবা একটা 'ওম্‌লেট' মধ্যে মধ্যে আহার করিয়া আসিত, কিন্তু সুধার মা ততদূর সাহস করিতে পারেন নাই। তবে রবিবারে কখনও কখনও মাতা ও কন্যা গির্জায় গিয়া 'উপাসনা' দেখিয়া আসিতেন, এবং সেদিন সুধা গাউন পরিধান করিত, এবং সুধার মা একটা রেশমের জ্যাকেট ও সেমিজ পরিধান করিয়া সগর্বে ধর্মমন্দিরে যাইতেন, এবং প্রত্যাবর্তন করিতেন।

আজ মিসেস্ এনড্রুজ সুধাদের বাটীতে আসিয়া সুধার মা ও সুধার সহিত কোনও বিশেষ পরামর্শে মগ্ন হইয়া প্রায় দুই ঘণ্টা কাটাইলেন। পরামর্শের সার মর্ম এই যে, যে রকম দিন আসিয়াছে, তাহাতে সুধার মার গাউন পরিধান করা কর্তব্য, এবং সুধার পিতা নটবর বাবুর হ্যাট-কোট ও টাই প্রভৃতি গ্রহণ করা নিতান্ত উচিত। সংসার একটা 'নৈতিক কর্মক্ষেত্র'। বাঙ্গালীর পুরাতন ধুতি ও চাদরে সুনীতি রক্ষা হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহা 'এনড্রুজ-দিদি' সুধার মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন, এবং সুধাও তাঁহার পক্ষসমর্থন করিল। আর একটা বিশেষ কারণ, মিষ্টার ব্যানার্জি তাঁহার সাজসজ্জা এবং 'অ্যাড্রেসে'র্ জোরেই দল পরিপুষ্ট করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেবল ধুতি ও চাদর পরিধান করিয়া মুসলমান ও হিন্দুদিগের সম্মানভাজন হইবেন, 'সে আশা করা বৃথা।'

৩

প্রামাণিক মহাশয়ের শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই মুখ প্রক্ষালন করা স্বভাব; এবং তৎপরে একখানি চাদর কাঁধে করিয়া ও পিতামহের আমলের পুরাতন বংশ-যষ্টি হস্তে ধারণ করিয়া মুসলমান-পাড়া ও বাঙ্গালীটোলা প্রদক্ষিণ করিতেন।

সে দিন রবিবার। প্রত্যুষে গুণপঞ্চাননানন্দ প্রামাণিক মহাশয় অভ্যাস স্থানে হস্তক্ষেপ করিয়া পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করাতে কতকগুলি অনভ্যস্ত বস্ত্র 'ঝুপ-ঝুপ' করিয়া পড়িয়া গেল। গৃহ তখনও অন্ধকার।

প্রামাণিক মহাশয় সেগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, একটা সম্পূর্ণ সাহেবী পোষাক। তিনি কিঞ্চিৎ বিরক্ত ও কিঞ্চিৎ চিন্তিত হইয়া ডাকিলেন, 'ওগো!'

গিরিবালা। ওঃ, বল্‌তে ভুলে গিয়েছি। তোমাকে ওগুলো আজ পর্‌তে হবে। মিশনরি-দিদির ইচ্ছা। তিনি বলেন, এবং আমিও বলি, এবং সুধাও বলে যে, সাহেবী পোষাক না করিলে কেহ আজকাল মানে না। ওগুলো না পর্‌লে মিউনিসিপাল কমিশনর হবার কোনও সম্ভব নাই। ভোট্‌ যোগাড় হবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বেন না।

প্রামাণিক মহাশয় তাঁহার লোকান্তরিত চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ের পিতৃপুরুষকে স্মরণ-পূর্ব্বক বলিলেন, "এটা অসম্ভব।"

গিরিবালা। তবে ক্যানভ্যাস কর্‌তে যেও না। নাপিতের পোষাকে বাহিরে বেড়ানর চেয়ে ঘরে ব'সে হরিনাম করাই ভাল।

প্রামাণিক মহাশয় ইহাতে লজ্জিত হইলেন। সম্প্রতি তাঁহার জেদ ক্রমাগত বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচারে বড় একটা রত হইতেন না। হৃষীকেশ যাহা করাইবেন, তাহাই হইবে, এই ভাবই মনে আসিত। তবে হঠাৎ পূর্ব্ব-অভ্যাস পরিবর্ত্তন করা কি সোজা? তাই বলিলেন, 'দেখ, ওগুলো কখন পরি নাই, একে ত কিম্ভূতকিমাকার দেখাবে, তার পর ঐ যে 'কলার' উহাতে গলা কেটে যাবার সম্ভাবনা।' আমার বোধ হয়, পাড়াশুদ্ধ লোক, বিশেষতঃ বাজারীটোলার ছোক্‌রাগুলো হাস্‌বে।'

গিরিবালা। ছোট লোকেরাই হেসে থাকে। ভদ্রলোকেরা কখনও ভদ্রলোক দেখ্‌লে হাসে না। সঙ্গে এলডজা দিদি থাক্‌বেন,—তাঁর কদর থাকবে। একটু কষ্ট ও সাহস ক'রে বেরুলেই নতুন বোধ হবে না।'

প্রামাণিক মহাশয়। আচ্ছা, তুমি ও ঘরে যাও, আমি একটু চেষ্টা ক'রে দেখি।

গিরিবালা প্রস্থান করিলে প্রামাণিক মহাশয় তাঁহার দর্পণের সম্মুখে প্রথমে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষানুক্রমিক চেহারা বিশেষরূপে দেখিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। পরে ধীরে ধীরে মোজা ও প্যান্ট্‌, লেন-শার্ট দেহস্থ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, কলারের মধ্যে তখনও 'টাই' ঝুলিতেছে।' তখন সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওগো, একবার এস। এই জিনিসটা গলায় ঠিক্‌ লাগ্‌ছে না।

গিরিবালা গৃহান্তর হইতে বলিলেন, 'দাঁড়াও, সুধাকে ডেকে দিচ্ছি। আমিও ঠিক জানি না।'

মাতা কর্তৃক অনুরুদ্ধা হইয়া সুধা ঘরে আসিয়া পিতার টাই ঠিক করিয়া দিল।

প্রামাণিক মহাশয় বলিলেন, 'তুই এখন যা।'

সুধা অন্তর্হিত হইলে প্রামাণিক মহাশয় সহধর্মিণীর সাহায্যে ওয়েষ্ট কোট ও ওভার কোট সংযত ভাবে স্বীয় বিপুল কলেবরের যথাস্থানে রক্ষা করিলেন।

গিরিবালা। বলতে নেই, তোমাকে আজকে যেমন সুন্দর দেখ্‌লেম, এমন জীবনে দেখিনি।

প্রামাণিক মহাশয় তাহা পরীক্ষা করিতে গিয়া দর্পণের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ আবার স্ত্রীর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। দর্পণ ও স্ত্রীর চক্ষু উভয় পদার্থেই তাহার সৌন্দর্য্য বিমল প্রভায় প্রতিভাত হইতেছিল। যদি আরও চক্ষু থাকিত, তবে বোধ হয়, প্রামাণিক মহাশয় একেবারেই চতুর্দ্দিকে কটাক্ষপাত করিতেন।

কিন্তু ক্রমে তাঁহার হস্ত ও পদযুগল নিতান্ত অসাড় বোধ হইতে লাগিল। তাঁহার ভাব দেখিয়া গিরিবালা বলিল, 'শীঘ্র জুতা পায় দাও।'

প্রামাণিক মহাশয় গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া বলিলেন, 'অসম্ভব! আমি গলা নীচু করতে পাচ্ছিনে। জুতার দিকে তাকায় কার বাবার সাধ্য?' ইহা বলিয়া খট্টাঙ্গে উর্দ্ধগ্রীব হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

৪

গিরিবালা সুধাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোর বাবাকে বাতাস কর্, আমি জুতা পরিয়ে দিই।'

সুধা পিতার অবস্থা দেখিয়া একটু দুঃখিতা হইয়াছিল। হাজার হউক, সন্তান ত? সে বলিল, 'তিন ইঞ্চি চৌড়া কলার বাবার পক্ষে একটু কষ্টকর হয়েছে।'

গিরিবালা। নে, ন্যাকামি করিস্‌নে। পুরুষমানুষেরই ত গলা উঁচু কর্‌বার কথা। এক সময় ওঁর গলা ছ'ইঞ্চি উঁচু হ'ত। ক্রমে হরিনামের মালা জপ কর্‌তে গিয়ে নীচু হয়ে গেছে। তোর যে এত উঁচু গলা, কার দৌলতে?

এইরূপে মাতা কন্যাকে ভর্ৎসনা করিয়া ফ্রেটিবাজারের ৮ নম্বরের বুট্‌-জুতার মধ্যে স্বামীর চরণযুগল প্রবেশ করাইবার জন্য অসাধারণ টানাটানি করিতে লাগিলেন। প্রামাণিক মহাশয় ছাদের কড়িকাষ্ঠের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ তাহার যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলেন। ক্রমে বুট-জুতা সম্পূর্ণভাবে বিন্যস্ত হইলে গিরিবালা অঞ্চল গুটাইয়া সুধাকে বলিলেন, 'পাগুলো চাষার মত হয়ে গেছে। যা হোক, দুদিনে শুধ্‌রে যাবে।'

তাহার পর মাতা ও কন্যা পিতাকে লইয়া বাহিরে গেলেন।

বাহিরে মিসেস্ এনড্রুস্ বসিয়াছিলেন। তিনি প্রামাণিক মহাশয়ের নূতন পোষাক দেখিয়া

চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, 'এইবার শ্যাম নাগ ও গিরিবালার স্বামী ও আমাদের জমাদার ব'লে আপনাকে মানাচ্ছে। এমন কি, আপনাকে ভগিনীপতি ব'লে সম্বোধন করিতে পারি।'

প্রামাণিক মহাশয় অতিকষ্টে বলিলেন, 'তাহাই করুন।—এখন আমাকে যেতে হবে কোথায়?'

মিসেস্। ক্যান্‌ভাস্ করতে। সঙ্গে আমার কুকুর টেবিকে নিয়েছি। কোনও ভয় নাই।

প্রামাণিক মহাশয়ের অন্য কাহাকেও ভয় না থাকুক, টেবিকে ছিল, কারণ, জমাদারের রূপান্তর দেখিয়া টেবি সন্দিগ্ধ চিত্ত হইয়া তাঁহার শরীরের আঘ্রাণ লইতে সুরু করিল। এই অভিনব বিপদ্ দেখিয়া প্রামাণিক মহাশয় বলিলেন, 'কামড়াবে না ত?'

মিসেস্। কখনও না। কুকুর আঘ্রাণ লইয়া প্রশংসা করে। আমরা কথা কহিয়া প্রশংসা করি। যদি প্রশংসা করিবার ইচ্ছা না থাকিত, তবে পূর্ব্বেই বিকট শব্দে চীৎকার করিত।

যাহা হউক, প্রামাণিক মহাশয় কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া বাহির হইলেন, এবং বহির্জগৎ তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতেছে, তাহা সন্দিগ্ধচিত্তে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

যাইবার সময় গিরিবালা বলিল, 'দিদি, ওঁর উপর নজর রাখ্‌বেন। যেন কোনও বিপদে না পড়েন।'

মিসেস্ এণ্ড্রুস চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'কোনও ভয় নাই। ঈশ্বর এই সৎকর্ম্মের সহায়। জগতে ওঁর কোনও বিপদ্ হবে না। তা হ'লে ধর্ম্মই মিথ্যা।'

এইরূপ আশ্বাস বাণীতে প্রামাণিক মহাশয়ের সাহস বাড়িয়া গেল। তিনি দেখিলেন যে, ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া তাঁহার কলার, মোজা ও বুটজুতা অনেকটা নরম হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তখন তিনি হাসিবার একটু সুযোগ পাইয়া বলিলেন, 'কদাকার দেখাচ্ছে না ত?'

মিসেস্। মোটেই না। ধুতি, চাদর ও চটি-জুতাই কদাকার।

উভয়ে সহরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে একটা দেশী কুকুর টেবিকে দেখিয়া কামড়াইতে আসিয়াছিল, এবং তাহা দেখিয়া প্রামাণিক মহাশয় পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা অসম্ভব দেখিয়া হতাশ হইয়াছিলেন।

প্রামাণিক। দেখুন, আমার বোধ হচ্চে যে, এ জুতা না খুলিলে আমি আজীবন খঞ্জ হয়ে থাক্‌ব।

মিসেস্। আচ্ছা, আপনি এই কেতাবের দোকানে বসুন।

সেখানে অনেক 'জানাশোনা' লোক ছিল। তাহাদিগের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া প্রামাণিক মহাশয় দোকানে বসিলেন, এবং 'এটিকেট্' সম্বন্ধে একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া মিসেস্ এণ্ড্রুজকে বলিলেন, 'আমার বোধ হয় যে, আমরা এখনও সভ্যতার কিছুই শিখি নাই।'

মিষ্টার ব্যানার্জি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যানভাস্ ক্ষেত্রে অভিনব মূর্তিতে বিচরণ করিতেছেন। সুতরাং সন্ধান লইবার জন্য গোলাম আলিকে বাজারে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রায় বিশ ত্রিশ জন লোক প্রামাণিক মহাশয়কে ঘিরিয়া ছিল। সেই ভিড় ঠেলিয়া হাকিম গোলাম আলি প্রামাণিক মহাশয়কে সেলাম করিল।

প্রামাণিক। খবর কি? আমি শুনছি, তুমি ও দলে মিশে গেছ? তোমার ওষুধ বিক্রয় হচ্ছে কেমন? আমাদের বাড়ী গোটাকতক পুরিয়া পাঠিয়ে দিও।

গোলাম আলি। হুজুর! তাও কি কখনও হয়? আপনি হচ্ছেন জমীদার। তবে আমায় ঔষধ বিক্রয় করার একটা পথ চাই ত? তাই লোক যোগাড় কচ্ছি।

মিসেস্। দেখ গোলাম আলি, নেমকহারাম হয়ো না। তুমি বরাবর মিশন থেকে বিনা পয়সায় মুরগী ও তার ডিম নিয়ে গেছ। এমন কি, তোমার খুসরু খানসামা সেইগুলো আবার রেঁধে দিয়ে ডবল দাম নিয়ে গেছে। যদি ধর্ম থাকে, তবে তোমার ও দলে যাওয়া উচিত নয়।

ইত্যবসরে পার্শ্বস্থ দোকান হইতে এক জন দুই পেয়ালা চা লইয়া আসিল। প্রামাণিক মহাশয় বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার এক পেয়ালা মিসেস্ এণ্ড্রুসকে দিয়া, নিজে এক পেয়ালা পান করিতে বসিয়া গেলেন, এবং মধ্যে মধ্যে 'এটিকেট'এর বহির পাতা উল্টাইয়া পড়িতে লাগিলেন।

প্রামাণিক। আমি দেখ্‌ছি যে, খাইবার সময় দাঁত খোঁটা অত্যন্ত অসভ্যতা।

মিসেস্। প্রথমতঃ টেবিলে ব'সে না খাওয়াই অসভ্যতা, এবং যদি বসেন, তবে স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া বসিবেন।

প্রামাণিক। তাই স্থির হয়ে গেল। দেখ গোলাম আলি! তুমি আমার জন্য একটা ডাইনিং টেব্‌ল কিনিয়া ফেল, এবং একসেট্ চার পেয়ালা।

গোলাম আলি। আর, প্লেট?

প্রামাণিক। এখন সেগুলো থাকুক। এই ইলেকশনে কমিশনর হয়ে গেলে সেগুলো কিনব।

প্রামাণিক মহাশয়ের এই পরিবর্তন দেখিয়া গোলাম আলি চমৎকৃত হইয়া গেল।

গোলাম আলি চলিয়া গেলে প্রামাণিক মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার বোধ হয়, তোমারও গাউন পরা উচিত।'

মিসেস্ এনড্রুজ। দেখ বোন্, আমি পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছিলুম, ইনি এক জন ক্ষণজন্মা

মহাপুরুষ। এক দিন সকালে বেরিয়েই অনেক কাজ হয়ে গেছে। আর এক দিন বেরুলে মুসলমান-পাড়া আমাদেরই হস্তগত হবে।

প্রায় তখন দশটা। মিসেস্ চলিয়া গেলে প্রামাণিক মহাশয় নানাবিধ কল্পনায় উৎফুল্ল হইয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, কলতলার সম্মুখের স্থান পিচ্ছিল থাকাতে তিনি পদ-স্খলিত হইয়া উল্‌টাইয়া পড়িয়া গেলেন।

সেই পতনশব্দে বাটীর লোক আসিয়া প্রামাণিক মহাশয়কে খাড়া করিয়া তুলিল, এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। গিরিবালা দ্রুতগতি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'লাগে নাই ত?'

প্রামাণিক মহাশয় সকলের মুখের দিকে চাহিয়া এবং কাহারও হাসির উদ্রেক হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বিরক্তিসহকারে বলিলেন, 'না। কিন্তু বোধ হয়, কলারের চাপে গলার খানিকটা কেটে গিয়েছে।'

গিরিবালা। উপরে চল।

দ্বিতলে গিয়া প্রামাণিক মহাশয় শীঘ্র নূতন সজ্জা খুলিয়া ফেলিলেন, এবং তাঁহার অভ্যস্ত ফরাস-ডাঙ্গার ধুতি পরিধান করিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

তাঁহার চক্ষু নিমীলিত দেখিয়া গিরিবালা জিজ্ঞাসা করিলেন 'কোনও অসুখ কচ্ছে না ত?'

প্রামাণিক (ক্ষীণ-স্বরে)। বোধ হয়, মাথার একটু গোলমাল হয়েছে। তোমার কাছে গোলাম আলির সেই 'নবীন পুরিয়া' আছে। আমি তাকে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলুম।

গিরিবালা। আছে।

প্রামাণিক মহাশয় তাহা সেবন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

৬

মিষ্টার ব্যানার্জি ক্যান্‌ভাস্ করিতে খৃষ্টানপাড়ায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। খৃষ্টান 'ভোটার' যে তাঁহার পক্ষভুক্ত হইবে, এমন কোনও আশা ছিল না, কিন্তু তাঁহার বিপক্ষে কতগুলি 'ভোটার' দাঁড়াইবে, তাহার তদন্ত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।

গোলাম আলির সমভিব্যাহারে ব্যানার্জি প্রথমতঃ মিশন স্কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মিষ্টার এন্‌ড্রুসের নামে অক্সফোর্ড মিশন হইতে একখানি পত্র যোগাড় করিয়াছিলেন। সেই 'ইন্‌ট্রোডিক্‌শন্ লেটার' লইয়া তিনি সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

বারান্দায় সাহেব ও মিসেস্ ও সুধা বসিয়াছিলেন। সাহেব তাঁহার সহিত উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন। গোলাম আলি ঘরের ছবিগুলি দেখিতে লাগিল।

ব্যানার্জি। আমি শুনে আশ্চর্য্য হয়েছি। ইনি মিষ্টার প্রামাণিকের কন্যা? আমি এ খবর কিছু জানিতে পারি নাই।

মিসেস্। অতি চমৎকার মেয়ে। যেমন রূপ, তেমনই গুণ। মা সুধা! মিষ্টার ব্যানার্জিকে এক পেয়ালা চা খাইয়ে দাও।

সুধা চা তৈয়ারী করিতে গেলে ব্যানার্জি গোলাম আলির সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ ঘরের ছবিগুলি দেখিতে লাগিলেন, এবং সুযোগ পাইয়া বলিলেন, 'কি চমৎকার মেয়ে! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই, সেটা নিশ্চয়, এবং রূপের মধ্যে গলাই সর্ব্বপ্রধান—ঠিক হংসের মত কণ্ঠ—আমি অনেক দিন ধ'রে কল্পনায় এমনি একটি মেয়ে খুঁজছিলুম।'

গোলাম আলি গম্ভীরভাবে তাহার লম্বা দাড়ি ইতস্ততঃ দোলায়মান করিয়া বলিল, 'কথাটা শক্ত। আপনি ব্রাহ্মণ, এবং উনি প্রামাণিক। আপনাদের সমাজে এ বিবাহ কখনও হ'তে পারে না। আবার দেখুন, উনি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর মেয়ে। আপনি ওদের দিকে ঝুঁকলে ক্যানভ্যাসিংটা মাটী হয়ে যাবে।'

মিষ্টার ব্যানার্জি। দেখ, গোলাম আলি! প্রেমের কাছে কিছুই না। প্রথম দৃষ্টিতে প্রেমে পড়িয়া যাওয়াই আসল প্রেম। সেটা খুব গভীর। আমি সেটা বিশেষ রকম দেখতে পাচ্ছি। এ রকম অবস্থায় জাতি, সম্বন্ধ ও ক্যানভ্যাসিং—সবই তুচ্ছ।

গোলাম আলি বুঝিতে পারিল যে, ব্যানার্জির মনের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ; এমন কি, বাধা দিলে চটাচটি হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সে ধীরে ধীরে বলিল, 'একটা উপায় আছে। আপনি এন্‌ড্রুস্ সাহেবের কাছে কথাটা উত্থাপন করুন।'

ব্যানার্জি। দরকার কি?

গোলাম আলি। দু'জনে খৃষ্টান হ'লে আর কোনও বাধা থাকবে না।'

কথাটা ব্যানার্জির মনে খুব উপযোগী বলিয়া বোধ হইল। সুধা চা লইয়া আসিলে, ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে আমি যে কত খুসী হয়েছি, তা কি ক'রে জানাব? আমার নিতান্ত ইচ্ছা, আপনাদের বাড়ীতে একবার যাই।'

সুধা। সে ত খুব ভাল কথা। বাবা ও মা, দু'জনেই খুসী হবেন। শুনতে পাচ্ছি, আপনি আমাদের বিরুদ্ধে ক্যানভ্যাসিং কচ্ছেন।

ব্যানার্জি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'আপনাদের সঙ্গে পূর্ব্বে আলাপ হ'লে কখনও এ কাজে হাত দিতুম না।'—ইহাতে তাঁহার মুখ এত রক্তিম হইয়া পড়িল যে, সুধার মুখও সেই রকম হইয়া গেল, এবং সুধা আবার এক পেয়ালা চা ও দুখানা ওমলেট আনিয়া দিল।

মিসেস্ এনড্রুস্ উভয়ের ভাব দেখিয়া পরম প্রীতা হইলেন, এবং বলিলেন, 'আপনার একবার প্রামাণিক সাহেবের সঙ্গে দেখা করা উচিত। যা সুধা। তুমি বাড়ীতে খবর দাও গে।'

সুধা চলিয়া গেলে মিসেস্ এনড্রুস বলিলেন, 'কেমন মেয়ে বলুন ত ?'

ব্যানার্জি। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতী। আমি যদি অমন মেয়ে পাই ত এখনই বিবাহ করি। এমন কি, যদি খৃষ্টান হ'তে হয়—

মিষ্টার এনড্রুস অতিশয় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, 'এমন দিন কি হবে ? একটু চেষ্টা করিলে যোগাড় হতে কতক্ষণ। কি বল মিয়া সাহেব ?'

গোলাম আলি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিলেন, 'তোফা প্রস্তাবনা।'

গোলাম আলির 'নবীন পুরিয়া' সেবন করিয়া প্রামাণিক মহাশয়ের বিকট নেশা হইয়াছিল নিশ্চয়, কেন না, তিনি মধ্যে মধ্যে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিতেছিলেন, 'এর মধ্যে সিদ্ধি কিংবা গাঁজা আছে নিশ্চয়, অন্ততঃ আফিং।'

ইহাতে গিরিবালার ভয় হইল, এবং তিনি গোলাম আলির কম্পাউণ্ডার খুসরুকে ডাকাইয়া বলিলেন, 'এর মধ্যে কি আছে বল্, নচেৎ পুলিসে খবর দেব।'

খুসরু অতিশয় সত্যবাদী ছোক্‌রা। সে বলিল, 'পুরিয়ার মশলা ফুরিয়ে যাওয়াতে প্লেগের সময় মিউনিসিপ্যালিটী ইঁদুর মার্‌বার জন্য যে পুরিয়া দিয়াছিল, তাই খানিকটা মিশিয়ে দিইছি।'

ইহাতে বাটীর সকলের ভয় হইল, এবং ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল। বাটীর ডাক্তার আসিয়া প্রামাণিক মহাশয়ের নাড়ী ও জিহ্বা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বিশেষ কিছুই হয় নাই, নেশা শীঘ্রই ছুটিয়া যাইবে, আমি 'মিক্‌চার' লিখে দিচ্ছি।"

তাহার কিয়ৎক্ষণ পরেই সুধা আসিয়া বলিল, 'মা, বাইরে মিষ্টার ব্যানার্জি ও গোলাম আলি ডাক্তার এসেছেন।'

সুধার মা বলিলেন, 'ওঁদের শীগ্‌গির ডাক্। তোর বাবার পুরিয়া খেয়ে নেশা হয়েছে। আমার কপালে কি আছে, জানি না। ওষুধ আন্‌তে গেছে।'

সুধার মুখ শুকাইয়া গেল। সে পিতার শিয়রে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা! তোমার হয়েছে কি ?'

প্রামাণিক। বোধ হচ্ছে, হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। হয় ত সেই কলার্ ও বুট-জুতোর কষ্টে, কিংবা পুরিয়াতে। ঠিক্ বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে।

মিষ্টার ব্যানার্জি ও গোলাম আলি গৃহে প্রবেশ করিয়া, কথাগুলি শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, 'কোন্ ইঁদুর-মারা পুরিয়া রে ? –'

খুসরু। সেগুলোর মধ্যে কাবাবচিনির গুঁড়ো ছিল।

গোলাম আলি (হাসিয়া)। বেটা কি বেকুফ। একটা বেফাস্‌কা কথা ব'লে সকলের চক্ষু উল্‌টাইয়া দিয়াছিল আর কি। ও বেটা জানে না যে, পুরিয়ার কাগজগুলো (ল্যাবেল) কেবল মিউনিসিপ্যালিটীর, মালমশলা যে আমার।

খুসরু প্রভুর নিকট গোটাকতক কানমলা খাইয়া চলিয়া গেল, মিষ্টার ব্যানার্জি, এবং সুধা, উভয়ে প্রামাণিক মহাশয়ের শুশ্রূষায় রত হইল।

গিরিবালা মিষ্টার ব্যানার্জির কথা শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহার 'সম্পত্তি' ও 'পসারে'র সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, সুতরাং উভয়ের মধ্যে একটা সখ্যভাব দেখিয়া আহ্লাদিতা হইলেন।

'মিক্‌চার' সেবনের পর প্রামাণিক মহাশয়ের চক্ষু উন্মীলিত হইলে তিনি প্রথমে ব্যানার্জির হ্যাটকোট ও টাই দেখিয়া পূর্ব্বস্মৃতিবশতঃ ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

'তোমরা ওগুলো সহ্য কর কি ক'রে ?'

ব্যানার্জি। (নম্রভাবে) অভ্যাস হয়ে গেছে। যদি বলেন ত ওগুলো ছাড়্‌তে কতক্ষণ ?

প্রামাণিক (সুধার দিকে তাকাইয়া)। বড় নম্র ছেলে। কি মিষ্টি কথাগুলি।

সুধা তাহার কোনও উত্তর না দিয়া মার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গিরিবালা। বড় শান্ত ছেলে! কি রূপ ও গুণ! (দীর্ঘনিঃশ্বাস) কিন্তু শুন্‌তে পেয়েছি— যে, উনি আমাদের ভোটারগুলোকে ভাগিয়ে নিচ্ছেন।

সুধা (দৃঢ়স্বরে)। না। উনি বলেছেন যে, আর অমন কাজ করবেন না।

গোলাম আলি। ঠিক তাই।

ইহাতে গিরিবালা বুঝিলেন যে, পূর্ব্বে উঁহাদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কথা হইয়া গিয়াছে, এবং ব্যানার্জির উপর সুধার বিলক্ষণ আধিপত্য জন্মাইয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনি সুধাকে বলিলেন, 'দেখো, তুমিই এর জন্য দায়ী।'

ব্যানার্জি। আমিই দায়ী থাক্‌লুম। কাল্‌কে ইলেক্‌শনের দিন। কি হবে, জান্‌তে পারবেন।

এই সকল কথাবার্ত্তা শুনিয়া প্রামাণিক মহাশয়ের যেটুকু নেশা ছিল, তাহা ভাঙিয়া গেল, এবং তাঁহার এক মাসের উত্তম বিফল হইয়া যাইবে বলিয়া যে ভয় হইয়াছিল, তাহাও তিরোহিত হইল। গোলাম আলি অল্পসময়ের মধ্যেই বুঝিল যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আর আশা-ভরসা নাই।

৮

ইলেক্‌শনের দিন ভোটারবৃন্দ ময়দানে একত্র হইয়া সারি সারি বসিয়া গেল। খৃষ্টানমণ্ডলী ব্যাণ্ড বাজাইয়া তাম্বুর মধ্যে বসিল। মহকুমার হাকিম নিজের তাম্বুর মধ্যে বসিলেন।

চা, বিস্কুট, পান, তামাক, কচুরী ও সন্দেশের দোকান সারি সারি বসিয়া গেল। গোলাম আলি ডাক্তার নিজের সরবতের দোকান প্রামাণিক মহাশয়ের ক্যাম্পের দিকে লইয়া আসিলেন, এবং সেই সঙ্গে মুসলমানেরাও চলিয়া আসিল।

প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাণ্ডিডেট্‌ বিভূতি উকীল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ডাকিয়া বলিলেন, 'ব্যাপারখানা কি বল ত ? কেবল মুসলমান নয়, অনেক হিন্দুরাও ওদের দিকে চ'লে যাচ্ছে।'

সত্রাসে মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, 'বাঁড়ুয্যে কোথায় ?'

এক জন বালক আসিয়া বলিল, 'তিনি মিস্‌ প্রামাণিকের সঙ্গে চা খাচ্ছেন।'

বিভূতি। কি আশ্চর্য্য ! এই কি চা খাবার সময় ?

বালক। জল খাচ্ছেন, সন্দেশ খাচ্ছেন, পান খাচ্ছেন, সিগারেট্‌ খাচ্ছেন। মিস্‌ প্রামাণিক তৈরি ক'রে দিচ্ছেন, সেজে দিচ্ছেন, দেশালাই ধরিয়ে তাঁর মুখে আগুন দিচ্ছেন।'

মুখোপাধ্যায়। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। ছেলেটা কি গোল্লায় গেল ?

বিভূতি। সে সেরকম ছোক্‌রা না। (বালকের প্রতি) তুমি ভাল ক'রে দেখে এসে বল যে, তারা ভোটারদের সঙ্গে, বিশেষতঃ গোলাম আলির সঙ্গে পরামর্শ কচ্ছে কি না।

বালক চলিয়া গেল।

বিভূতি। যদি সত্য সত্যই সে মেয়েটাকে দেখে ভুলে গিয়ে থাকে, তবে উপায় ?

মুখোপাধ্যায়। ঘোরতর জঞ্জাল।

বিভূতি। তবে এই সময় অপমান হওয়ার চেয়ে পাততাড়ি গুটানো ভাল।

মুখোপাধ্যায় (সরোষে)। এমন জান্‌লে আমি ওকে আমার ত্রিসীমানা মাড়াতে দিতুম না।

বিভূতি। আপনার স্ত্রীকে এ সব কথা বল্লে ভাল হয় না ?

মুখোপাধ্যায়। সেও একটা জঞ্জাল ! তার ভ্রাতার মত। যদি এ খবর পায়, তবে আহ্লাদে নেচে উঠ্‌বে।

বালক ফিরিয়া আসিল।

বিভূতি। খবর কি ?

বালক। ভাল নয়। সেখানে খৃষ্টানেরা ব্যাণ্ড বাজিয়ে বাজিয়ে বল্‌ছে যে, তাদের দু'জনের বিয়ে
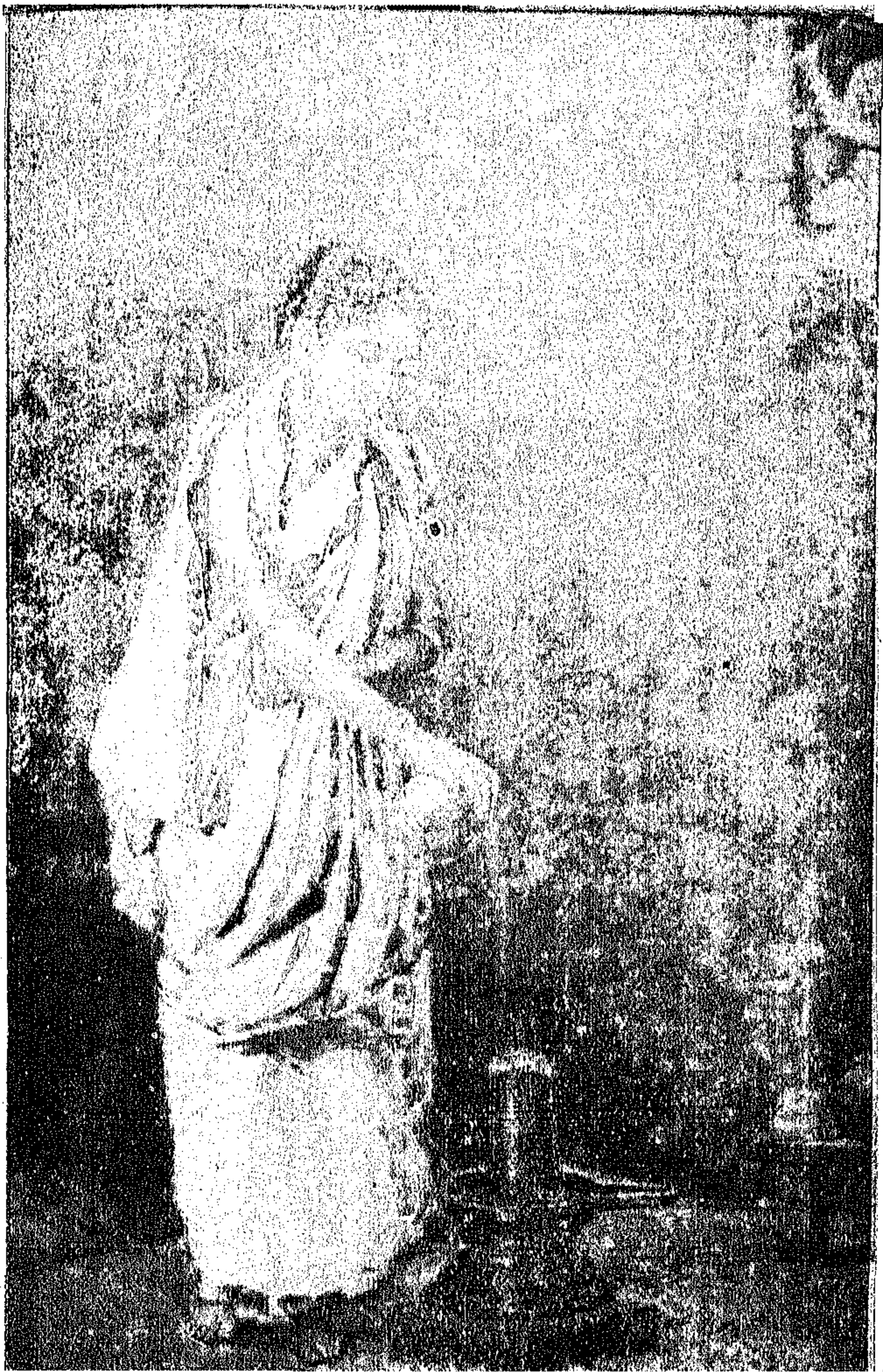
শিবপূজা

চিত্রকর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার সৌজন্যে

হবে। গাঁই দেখচে সব ভোটার গিয়ে জুটেছে, আর সবাকে পান ও সিগারেট দিয়ে তাদের আশীর্ব্বাদ করচে।

মুখোপাধ্যায়। ভোটারগুলো, এমন কি, এই ইলেকশনের ব্যাপারটাই একটা জঞ্জাল। বিভূতি, তাম্বু তোলো। ওরে, তোরা কে আছিস্ রে? আমার পাল্কী নিয়ে আয়।

ইলেকশন ক্ষেত্রে মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই শেষ কথা বলিয়া, পাল্কী আরোহণপূর্ব্বক চলিয়া গেলেন, এবং বিভূতি উকীলও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইয়া পড়িলেন। এ দিকে জনরব উঠিয়া গেল যে, তাম্বুর মধ্যে প্রামাণিক মহাশয় সপরিবারে খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এবং তাঁহার কন্যা সুধার সহিত ব্যানার্জ্জি সাহেবের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলিল যে, 'না। ব্রাহ্মমতে।' এবং কেহ কেহ বলিল, 'ওটা সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট অনুসারে।' কেহ কেহ বলিল, 'এখনও হয় নাই। প্রামাণিক মহাশয়ের এখনও সম্পূর্ণ মত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর মত আছে, এবং তিনি নোলক নাকে গাউন পরিধানপূর্ব্বক মাঠের মধ্যে সগর্ব্বে বেড়াইতেছেন। হাকিমের কথায় প্রামাণিক মহাশয়ের ইলেকশন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিবাহ এখনও বাকি আছে।' এই প্রকার, মাঠের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কেহই সত্য নিরূপণ করিতে না পারিয়া আহ্লাদে ও ঔৎসুক্যে মাতিয়া উঠিল। কেহ সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিল; কেহ গান ও বাদ্য, এবং কেহ 'হিপ্ হিপ হুর্‌রে।'

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

কোওার সাহেব।

চৌরঙ্গীর উপরে বড় গির্জার নিকটে একখানি ছোট অথচ সুসজ্জিত বাড়ীর ফটকে দাঁড়াইয়া এক জন মান্দ্রাজী বেয়ারা অনেকক্ষণ এক ট্যাক্সির প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহার কর্ত্রীও পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার কন্যার চোখে মুখে একটু ব্যস্ততার ভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। মোটরের হর্ণ শুনিয়া তাঁহারা নামিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু আসিয়া দেখেন যে, তখনও কোনও ট্যাক্সি আসে নাই। সাড়ে সাতটার সময়ে বালিগঞ্জে চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে পার্টী আছে; সাতটা বাজিয়া দশ মিনিট হইল, অথচ ট্যাক্সি পাওয়া যাইতেছে না। চৌরঙ্গী দিয়া অকারণ ব্যস্তভাবে অসংখ্য মোটর-গাড়ী আনাগোনা করিতেছে; কিন্তু তাহার একখানিও খালি নহে। মিসেস বানার্জি ও মিস্ বানার্জি মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঞ্চিত করিতেছেন।

গ্যাসের আলোয় মান্দ্রাজী বেয়ারার নিকষ কালো রঙের উপর সাদা পাগড়ীটি পার্কের টুপীর মত শুভ্র দেখাইতেছিল, এবং তাহার দুই কানের ক্ষুদ্র কুণ্ডল দুইটিও চিক্‌মিক্ করিতেছিল। মিসেস্ বানার্জি চল্লিশের ভাঙ্গা কোঠায় পা দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ললাটের উপর ঈষৎ শ্বেতাভ অলকদাম ঢেউতরঙ্গ খেলিয়া যাইতে আজিও অভ্যস্ত ছিল। তাহার ফলসা ক্রেপের শাড়ীর অভ্যন্তর হইতে অতি শুভ্র সুগোল দু'খানি হস্ত সবলভাবে বাহির হইয়াছে। স্থূল অঙ্গুলিগুলি আংটীর হীরক-দ্যুতিতে মণ্ডিত। মিস্ বানার্জির বেশভূষাও অনেকটা মায়ের মত। তাহার সুগৌর কান্তি বসনের শাসন যথাসম্ভব অতিক্রম করিয়া যৌবনশ্রীর পেলব্‌তা প্রকাশ করিতেছিল। মেমেদের ডিনারের পোষাকের স্বল্পতা অনুকরণ করিয়া একটি অতি সূক্ষ্ম সিল্কের জামায় আবক্ষ কোনওরূপে আবৃত করিয়াছেন, এবং তাহার উপর একখানি চিকণ ঢাকাই শাড়ী অনেকটা গাউনের মত করিয়া পরিয়াছেন। উভয়েরই পদে বহুমূল্য (কিড্) ছাগচর্ম্মের বিলাতী জুতা। অজস্র পাউডার উভয়েরই গৌর দেহকান্তিকে বিকট রকমে শুভ্রতর করিয়াছে। উভয়েরই হস্তে স্বর্ণমণ্ডিত হাতপাখা।

হঠাৎ একখানি মোটর শব্দ করিতে করিতে আসিল। মান্দ্রাজী বেয়ারা হাঁকিল—"ট্যাক্সি, ট্যাক্সি।" চালক তাহা শুনিতে পাইল কি না সন্দেহ। কারণ, তাহার বেগ কমাইবার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। তখন মিস্ বানার্জি একটু অগ্রসর হইয়া হস্তসঙ্কেতে তাহাকে ডাকিলেন। মোটর বেগ সামলাইতে সামলাইতে কিছু দূর চলিয়া গেল। মিসেস্ ও মিস্ বানার্জি একবার ব্রেসলেটের মধ্যস্থিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দ্রুতপদে গাড়ীর নিকটে আসিলেন। চালকের আসনে যে দুই জন বসিয়া ছিল, তাহার মধ্যে এক জন গাড়ী থামিতেই নামিয়া পড়িল এবং আরোহিণীর জন্য দরজা খুলিয়া দিল। মিসেস্ বানার্জি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া হাঁফাইতে লাগিলেন। শরীরের অনাবশ্যক ভারে তাঁহাকে প্রপীড়িত করিয়াছিল।

মিস্ বানার্জি উঠিবার সময়ে হঠাৎ গাড়ীর সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "ওম্ মা—এ কি রকম ট্যাক্সি ? এ যে প্রাইভেট মোটর !"

মিসেস্ বানার্জি "তাই নাকি, তা এ এল কেন ?" বলিয়া নাবিতে উদ্যত হইলেন। তখন শোফেয়ার বলিল, "নেহি নেহি মেমসাহেব, আব কেও উৎরেঙ্গে ? ম্যায় পৌঁছায় দেউঙ্গা। যো বখশিশ আবকী খাহেশ হো, এনায়েৎ করেঁ।"

মিস্ বানার্জি তাহাকে বাঙ্গালা হিন্দুস্থানীতে বলিলেন, "তোমকো কোন্ বোলায়া ? তুম্ কেঁও আয়া ? তোমারা মনাবকো ঠকায়কে য্যায়সা জুয়াচুরী কাম করতা হায়। আভি তোমার মনীব টের পানেসে তোমকো জেলমে দে দেগা।"

শোফেয়ার বলিল, "গোস্সা মৎ কীজিয়ে। আব নে মুঝ্‌কো বোলায়া। ইস্ লিয়ে ম্যায় হাজির হুয়া। মেরে মালেকনে ভি এ্যায়সা হি হুকম কিয়া হায়। আভি আপকী মরজি ; কসুর হুয়া কুছ, ত মাফ ফরমাইয়ে, মেমসাব।"

মিসেস্ বানার্জি অবতরণের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আপোষের সুরে বলিলেন, "মিনি, কেন মিছে ঝগড়া কচ্ছ ? কেডী মিট্‌ফোর্ড হয় ত এতক্ষণ এসে গেছেন। আর এখন ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে, শেষটা যাওয়াই হয় ত হবে না। হলই বা প্রাইভেট্ কার—আমরা ত আর জোর ক'রে উঠিনি। আর ওর মনীব না বল্লেই কি ও এমন কাজ করতে পারে ? মনীব হয় ত কোথাও বাহিরে গেছেন, ও বেচারী খরচপত্রের অভাবে এমনি ক'রে কোনও গতিকে চালিয়ে দিচ্চে। ওরই বা অপরাধ কি ? তুমি চট্ ক'রে উঠে পড় ; ও ত আগে আমাদের পৌঁছে দিক্। তার পরে সে দেখা যাবে এখন।"

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া মিসেস্ বানার্জি একেবারে হাঁফাইয়া উঠিলেন। মিস্ বানার্জি যাই-কি-না-যাই করিতে করিতে চড়িয়া বসিলেন, এবং কতকটা অনুযোগের স্বরে—কতকটা প্রশ্নের স্বরে বলিলেন—"তা যেন হ'ল, ভাড়া দিতে হবে কি হিসাবে ? মিটার যে নেই !"

শোফেয়ারের দোসর দ্বার খুলিয়া দিতেছিল, এবং শোফেয়ার চাকাটি হাতে লইয়া বেশ ভাল হইয়া বসিতেছিল, সে পিছন দিকে না ফিরিয়াই বলিল, "যো কুছ আপ্‌কো খুসী হো, উও দিজিয়ে।"

শোফেয়ার বাঙ্গালা ভাষা বোঝে দেখিয়া মিসেস্ বানার্জি মনে মনে তারিফ করিলেন। কারণ, হিন্দীটা তাঁর একেবারেই আসিত না। অনেক দিন বেহারে থাকিয়াও তিনি ঐ কটমট ভাষার ধাঁজটি ধরিতে পারেন নাই। তাহার মেয়েও যে ঐ 'হোগা' 'যাগা' করে, ইহাও তাঁহার বড় একটা পছন্দ হইত না। কিন্তু মেয়ের কাছে তিনি জোর করিয়া কিছু বলিতে পারিতেন না। মেয়েকে বাড়ীতে মেম রাখিয়া চার বৎসর রীতিমত পড়াইয়াছেন। তার পর লোরেটোতে পাঁচ বৎসর পড়িয়া সে একেবারে খাঁটী মেম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মিসেস্ বানার্জির পড়া-শুনা বেশী ছিল না, তবে স্বামীর সাহেবিয়ানার পাল্লায় পড়িয়া ঘসিয়া মাজিয়া যাহা কিছু হইয়াছে, কিন্তু সেটা এখনও তাঁহার মজ্জাগত হইতে পারে নাই। মিসেস্ বানার্জি টেবিলে কাঁটা-চামচে ধরিয়া কোনও গতিকে কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু অথাদ্য দেখিলে এখনও তাঁহাকে কাসিতে কাসিতে সারা হইতে হয়। একবার মেয়ের ধমক খাইয়া তিনি অশ্রু-সজল-নেত্রে

স্বীকার করিয়াছিলেন যে, "বামুনের মেয়ের ও সব যা তা খাওয়া কি সয় বাপু ? ঐ লাল লাল মাংসগুলো প্লেটে দেখিলেই গায়ের ভিতর কেমন যেন করে! ভয় হয়, পাছে ন্যাকার ক'রে বসি।"

মিস্ বানার্জি সে কথা শুনিয়া মায়ের প্রতি সেই দিন হইতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। টেবিলে মাকে কাসিতে সুরু করিতে দেখিলেই তিনি জোর করিয়া তাঁহাকে জানালার কাছে পাঠাইয়া দিতেন। সহভোজনকারী ও ভোজনকারিণীদিগকে বলিতেন, "মা আমার হৃদ্‌রোগে অনেক দিন থেকে কষ্ট পাচ্ছেন কি না, তাই ও রকম মাঝে মাঝে হয়। একটু খোলা হাওয়া পেলেই এক্ষুনি ভাল হয়ে যাবেন।" ভাবটা অথচ এই যে, যদি বমি ফমি হইয়া যায়, তবে সেটা টেবিলে ঘটিলেই বিপত্তি ঘটিবে; জানালা থেকে সারিয়া আসাই নিরাপদ্।

যাহা হউক, মিস্ বানার্জির ন্যায় শিক্ষিতা বিদুষী, প্রখরা কন্যার নিকট মাতার 'সেকেলে' ধরণের চাল-চলন বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত। মাতাও কন্যার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া নিজ ত্রুটী ও শিক্ষার অভাব গোপন করিবার সুবিধা পাইতেন। মিসেস্ বানার্জি মনে মনে কন্যার বিদ্যাবুদ্ধির যতই তারিফ করিতেন, ততই তাঁহার কল্পনার চক্ষুতে একটি খাঁটী সাহেব সিভিলিয়ান জামাইয়ের করমর্দ্দন ফুটিয়া উঠিত।

দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের গাড়ী চৌধুরী সাহেবের ফটকে প্রবেশ করিল। সেখানে লাট-পত্নীর সংবর্দ্ধনা ও ডিনার উপলক্ষে ফটকের উভয় পার্শ্ব বহু দূর পর্য্যন্ত গাড়ী ও মোটরকারের সারি প্রলম্বিত হইয়াছে। অশ্বারোহী সার্জ্জন গাড়ীর সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছে।

মোটর ফটক পার হইয়া গাড়ীবারান্দার ভিতরে প্রবেশ করিল। উজ্জ্বল আলোকে বিলাতী পাম ও এরিকা ঝাড়ের গাঢ় সবুজ যেন নীল রেশমী শাড়ীর মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। হাস্যকলরবে সে স্থান মুখরিত করিয়া মেয়ের দল বিচিত্র পোষাকের বাহার দিয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিতেছেন। চৌধুরী সাহেবের কন্যা ও আত্মীয়ারা অভ্যর্থনা করিয়া সকলকে নামাইয়া লইতেছেন, গাড়ীগুলি আরোহীদিগকে নামাইয়া দিয়া ফটকের বাহিরে যাইতেছে। বানার্জিদের মোটরগাড়ী বারান্দায় ঢুকিতেই চতুর্দ্দিক্ হইতে রমণীরা কলকণ্ঠে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। গাড়ী থামিতেই মিস্ চৌধুরী 'এই যে, আসুন মিসেস্ বানার্জি, আসুন মিস্ বানার্জি' বলিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন, এবং মিস্ বানার্জিকে প্রায় টানিয়া নামাইলেন— তাঁহারা একসঙ্গে লোরেটোতে পড়িতেন। মিসেস্ বানার্জি আস্তে আস্তে পরে নামিলেন। মিস্ বানার্জি মিস্ চৌধুরীর সহিত কথা কহিতে কহিতে তিন চারিটি সিঁড়ি উঠিয়া গেলেন। শোফেয়ারকে "যো কুছ বখশিশ্" দিতে পারিলেন না। মিসেস্ বানার্জি কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। কন্যা না বলিয়া দিলে কত দিতে হইবে, তাহা তিনি কি করিয়া ঠিক করিবেন? ইতস্ততঃ করিতে করিতে তিনিও কন্যার অনুবর্ত্তিনী হইলেন, মিস্ বানার্জি ইচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ী বিদায় করিতে পারিলেন না। এক জন ভদ্রলোকের ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া আসা কিছু দোষের কথা নয়। কিন্তু তাহাকে ভাড়া দিতে যাওয়া বড়ই কেমন কেমন দেখায়। বন্ধুবান্ধবের সম্মুখে শোফেয়ারের জুয়াচুরীর সহিত জড়িত হওয়ার লজ্জা মিস্ বানার্জিকে বিব্রত করিয়া তুলিল। বখশিশ হিসাবে কিছু দেওয়া যাইত না যে, এমন নহে; কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ শোফেয়ার যদি পাঁচ টাকার স্থলে সাত টাকা চাহিয়া বসে! তবেই ত সব [illegible]

হইয়া যাইবে। এমনই কিছু ভাবিতে ভাবিতে মিস্ বানার্জি কয়েকটি সিঁড়ি অতিক্রম করিলেন। এমন সময় সশব্দে মোটরের দরজা বন্ধ করিয়া শোফেয়ার উচ্চ স্বরে সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া বলিল, "গাড়ী ফাটককে বাহার ম্যায় লে যাতা হুঁ, আউর সিং ফাটকমে ঠারেঙ্গে মেম সাব।"

মিস্ বানার্জি আশ্বস্ত হইয়া, মেমসাহেবনিন্দিত সুশ্রী আওয়াজে বলিলেন, "বহুৎ আচ্ছা।"

কিছু পরেই লাট-পত্নী লেডী মিটফোর্ড আসিয়া পড়িলেন। অভ্যর্থনা সঙ্গীত, ঐকতান বাদন, মাল্যদান ইত্যাদি যথারীতি সম্পন্ন হইল। তার পর খানা আরম্ভ হইল; সে দিন মিসেস্ বানার্জি সন্দেহক্রমে দু' তিনটা কোর্স প্রত্যাখ্যান করিয়া কাশির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় পার্টি ভাঙিল। লেডী মিটফোর্ড বিদায় লইবার পরে একে একে অন্যান্য মহিলারাও রওনা হইলেন। মিসেস্ বানার্জি এক জন বেয়ারাকে আউধ সিং বলিয়া হাঁকিতে আদেশ করিলেন। আউধ সিং গাড়ী লইয়া আসিল। মিসেস্ ও মিস্ বানার্জি হাসির ফোয়ারা ছুটাইয়া পুনঃ পুনঃ অভিবাদনাদির পর যখন গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন, তখন শোফেয়ার গাড়ীর দরজা বন্ধ করিতে ভুলিয়া মিস বানার্জির হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল। মিস্ বানার্জি ধমক দিয়া বলিলেন, "কেয়া? আউর কেয়া দেখা হায়? দরজা বন্ করো, আউর ষ্টার্ট দেকে বোলো। তোমারা হুঁস কাঁহা গিয়া?" একটু বাহাদুর ভাবে ইংরেজিতে মিস্ চৌধুরীকে বলিলেন, "Just look at the idiot. As if I was t.lking to him. Oh these chauffers..."

মিস্ চৌধুরী একটু নিম্ন স্বরে বন্ধুকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, Your face, your face, my dear. That is to blamo.

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে ফটক পার হইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। বালিগঞ্জের মাঠের পাশে একবার গাড়ীখানিকে একটু দাঁড় করাইয়া চুরুটে অগ্নিসংযোগ করিয়া আবার শোফেয়ার গাড়ী চালাইয়া দিল। চলনশীল গাড়ীর প্রতিকূল বাতাসে চুরুটের গন্ধ ও ভস্ম মিস্ বানার্জির দিকে বাহিত হইয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল; তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং শোফেয়ারের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইলেন। "এ বহুৎ খারাপ হোতা হায়। হাম্ গাড়ীসে আবি উতার যায়েঙ্গে। খাড়া করো। হাম একঠো ট্যাক্সি লেগা।"

শোফেয়ার হাসিয়া বলিল, 'বহুৎ আচ্ছা, মেমসাব, ম্যায় আভি আপকো উতার দে সক্তা হুঁ। হাম লোগ্ আগর হাওয়ামে চুরুট না পিয়ে ত কেও কর কাম্ কর্ সেকেঙ্গে? রাত বহুৎ গুজার গয়ী, খেয়াল কিজিয়ে। আপকা যব খাহেশ হোগা, ত ম্যায় জরুর আপকো উতার দেওঙ্গা। ট্যাক্সি যব্ তক্ নেহি মিলে গা, তব তক্ ইহা আপ অঁধিয়ারে মে ঠেঁহরে রহেঁ, আউর ম্যায় গাড়ী লেকে চলা যাঁও!"

"আচ্ছা যাও; হামলোক্ তোমকো বখশিশ কুছ নেহি দেঙ্গে।"

"কুছ পরোয়া নেহি, গরীব পরবর। জল্দি এক ট্যাক্সি পাকড় লিজিয়ে, নেহি ত পানি আ যায়েগা। আসমান কী হালৎ দেখিয়ে, কে ঘটাঘোর হায়।"

মিসেস্ বানার্জি গাড়ী হইতে মুখ বাহির করিয়া একবার আকাশের অবস্থা দেখিয়া লইলেন পশ্চিমদিকে মেঘের উপর মেঘের স্তর বেশ জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ খেল-

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত কালো বোর্ডের গায়ে খড়ি দিয়া কষি টানিয়া দিতেছে। তিনি আসন্ন বিপদের পরিমাণ বুঝিয়া মেয়ের গা টিপিয়া দিলেন। বলিলেন, "বাপু, ওরা ছোট লোক, একটু আধটু চুরুট না খেলে বাঁচ্‌বে কেন ?"

শোফেয়ার তরজমা করিয়া সায় দিল, "হাঁ হুজুর, কাস্তরে বাচোঙ্গা।"

"তোমার বড় বাড়াবাড়ি, মিনি! আচ্ছা, তুমি এ দিকে এসে ব'স। আমি ঐ দিকে যাচ্ছি। কেমন, তা হ'লে ত হবে ?"

তাহা না হইলেও হইত; কেন না, শোফেয়ার যখন ধমক খাইয়া দমিল না, তখন মিস্ বানার্জি একটু নরম কাটিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মায়ের কৃপায় সব দিক্ রক্ষা হইল। শোফেয়ার ঈষৎ হাসিয়া একবার আরোহিণীদ্বয়কে দেখিয়া লইল।

কিছু পরেই চৌরঙ্গীর আলোক দেখা গেল, এবং বানার্জি মহিলারা বাড়ীর ফটকে অবতীর্ণ হইলেন। মিস্ বানার্জি ব্যাগটি খুলিয়া একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিলেন, এবং স্মিত-মুখে জিজ্ঞাসিলেন "কেৎনা দেনে হোগা ?"

শোফেয়ার "দো চার রূপেয়া—যো আপকী খুসী" বলিয়া সেলাম করিল। মিসেস্ বানার্জি চট্ করিয়া কন্যার হাত হইতে নোটখানি আত্মসাৎ করিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন, "Change হ্যায় ?" শোফেয়ার মাথা নাড়িল। তখন মিসেস্ বানার্জি উপায়ান্তর না দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল আবার আসিতে পার ? কাল আমাদের শ্যামবাজারে ডিনারের নিমন্ত্রণ আছে, সাতটায় বেরুব। আস্‌তে পার্‌বে বাপু ?"

শোফেয়ার ইঙ্গিতে সঙ্গীকে 'ষ্টার্ট' দিতে বলিয়া একবার কলটা পরীক্ষা করিয়া লইতে লইতে বলিল, "কাঁহে নেই সেকেঙ্গে ?"

মিসেস্ বানার্জি একটু হাসির রসে কথাগুলিকে ভিজাইয়া বলিলেন, "তবে কালই তোমার ভাড়া নিও। কেমন ?"

শোফেয়ার দীর্ঘ হস্তে দৈনিক-প্রথায় সেলাম ঠুকিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া চাকা ঘুরাইয়া দিল। গাড়ী ধীরে ধীরে চৌরঙ্গীর রাস্তা বাহিয়া চলিয়া গেল। মিস্ বানার্জি উপেক্ষাভরে সে দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না। মিসেস্ বানার্জি পশ্চাতের গমনপ্রাপ্ত ধূলি হইতে গামলাইতে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইয়া পড়িলেও গাড়ীর দিকেই বার বার চাহিয়া দেখিলেন। তার পর যখন গাড়ী দৃষ্টি-সীমা ছাড়াইয়া গেল, তখনও শোফেয়ারের বলিষ্ঠ অথচ সুকুমার গঠন ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

তার পরদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় বানার্জি সাহেবের ড্রয়িংরুমে সেই মাদ্রাজী বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, "মোটর আয়া।" মিসেস্ বানার্জি হাঁচিতে হাঁচিতেও উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। মিস্ বানার্জি মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া হাসিয়া আকুল হইলেন। পার্শ্বে একখানি বেতের চেয়ারে মিঃ ডুই বসিয়াছিলেন। তিনি কিছু না বুঝিতে পারিলেও হাঁটুতে দুই তিন বার চপেটাঘাত করিয়া সেই সঙ্গে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। মিস্ বানার্জি হাসির মধ্যে পুনঃ পুনঃ থামিয়া বলিলেন,—

"ও ! সেই—সেই মোটরকার—যার কথা আপনাকে বলছিলুম—সেই কালকার adventure মিঃ হুই !"

"My goodness" বলিয়া মিঃ হুই একেবারে লুটাইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন।

"কেমন মিঃ হুই—এটাকে একটা adventure নই আর কি বলা যেতে পারে ? চাইছি ট্যাক্সি ; এল একটা প্রাইভেট্ মোটর—কি মজা বলুন ত !"

"মজা ব'লে মজা ! ভয়ঙ্কর আশ্চর্য্য !" বলিয়া হুই পুনরায় হাসিতে হাসিতে লুইয়া পড়িলেন। মিঃ হুই এক জন ব্যারিষ্টার, এবং মিস্ বানার্জির পাণিপ্রার্থীদিগের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁহারই পালে জোর বাতাস বহিতেছিল। রায়, গুহ ও শাসমল সাহেবেরা একরূপ বুঝিয়া ফেলিয়াছেন যে, তাঁহাদের মানব-জন্ম এ যাত্রা বিফলে গেল। বিজয়ের গৌরবে মিঃ হুইয়ের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে।

মিসেস্ বানার্জি বলিলেন, "দেখ পিয়ারী, লোকটা কিন্তু খাঁটা। আমরা চৌধুরীর বাড়ীতে নেমে তাদের অভ্যর্থনায় এমন বিব্রত হ'য়ে পড়লাম যে, তখন ভাড়া দিতে যাওয়াটা কেমন vulgar ঠেক্‌তে লাগল। তারা এক দিক থেকে 'আসুন আসুন, আসতে আজ্ঞা হো'ক' ব'লে এগিয়ে হাত ধ'রে টান্‌ছে, আর এ দিকে তুমি ব্যাগের ভিতর থেকে সিকিটা দুয়ানিটা পর্য্যন্ত খুঁটে তুলে ভাড়া চুকিয়ে বস্‌লে, এ সত্যিই বড় কেমন কেমন দেখায় ! নয় ? তুমিই বল, মিকিনি। তার পরে আমার সত্যি কথা বল্‌তে কি, একটু বাধো বাধোও ঠেক্‌লো। প্রাইভেট্ মোটরে চ'ড়ে গেছি, ও যেন নিজেদের 'কার'। ওকে ভাড়া দিতে কি বকশিশ দিতে গেলে অভিনয়টা যেন সব মাটা হয়ে যায়। কে কি মনে করবে, ভাব দেখি। আমরা ইতস্ততঃ করছি, আমার ত বাপু পা উঠে না। মিনি ত টপ্-টপ্ ক'রে উঠে গেল। কিন্তু সোফেয়ারটা কি ভদ্রলোক—সে তক্ষুণি সেটা বুঝে নিলে, বল্‌লে, আমি ফটকের বাইরে গাড়ী রাখ্‌ছি, আউধ সিং ফটকে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। পাছে আমরা ওর 'কার' ঠিক ক'রে উঠ্‌তে না পারি ; নম্বর নেই কি না—তাই আমাদের সম্মানে আঘাত না লাগে, এমন ভাবে বুঝিয়ে দিয়ে গেল, গাড়ীটা আবার কি ক'রে খুঁজে নিতে হবে।" মিসেস্ বানার্জি হাসিতে লাগিলেন।

মিস্ বানার্জি মাতার উচ্ছ্বাসটি সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিতেছিলেন না। মিষ্টার হুইকে মাতা যেমন আত্মীয় মনে করিয়া নিজেদের গোপন কথা সব বলিয়া ফেলিতেছিলেন, কন্যা তাহাকে এখনও ততটা আত্মীয় মনে করিতে পারেন নাই। প্রাইভেট কারে চড়িয়া সান্ধ্য ভোজনে যাওয়ার মধ্যে এমন একটি অপরাধের আভাস ছিল, যাহার জন্য তাঁহার মাথা হেঁট করিতে হইতেছে। সেই জন্যই মিস্ বানার্জি একটু অন্যমনস্ক হইবার ভাণ করিয়া একখানি বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অঞ্চলের ঘড়ি-ব্রোচটি ঠিকমত আটকাইয়া দিতেছিলেন। আয়নায় নিজের ঢল-ঢল পরিপূর্ণ পাউডার-চর্চ্চিত মুখখানি দেখিয়া যে একটু আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আর কেহ না দেখিলেও মিষ্টার হুই সতৃষ্ণভাবে দেখিয়া লইয়াছিলেন। মিস্ বানার্জি ভাবিলেন আমি কি সুন্দরী ; মিষ্টার হুই ভাবিলেন "এত আমারি ; আজ না হয়, দু'দিন পরে।"

মিসেস্ বানার্জির একমাত্র চেষ্টা ছিল, কথার জাল ফেলিয়া মিষ্টার হুইকে গ্রেপ্তার তিনি যে পিয়ারীকে তাঁহার কন্যার খুব উপযুক্ত ভাবী বর বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিলেন মোটেই নয়। তবে সিবিলিয়ান বা ঐরূপ কোনও মনোমত ব্যক্তি উপস্থিত না থাকায়

হুইয়ের প্রতি কন্যার পক্ষপাতপ্রসন্ন দৃষ্টি দর্শনে মিসেস বানার্জি হুইকে যথারীতি উৎসাহ দান করিতেছিলেন।

ঘড়িতে মৃদু-গম্ভীর স্বরে সাতটা বাজাইয়া দিল। মিস্ বানার্জি বলিলেন "তা হ'লে মিঃ হুই—"

মিষ্টার হুই বলিলেন, "চলুন না, আপনাদের গাড়ীতে তুলে দি। আমি অমনি মাঠে একটু বেড়িয়ে ট্রোকাডেরোতে গিয়ে উঠবো।"

হুই সাহেব রাত্রের আহারটা ঐ স্থানে সম্পন্ন করিয়া বিলাতী অভ্যাস ও সাহেবী চাল কথঞ্চিৎ বজায় রাখেন।

মিসেস্ বানার্জি একটু বেশী মাত্রায় হাঁচিতে আরম্ভ করিলেন। মিষ্টার হুই উঠিয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু হাঁচির বাধা পাইয়া সোফার উপর একবার ধাঁ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। পরক্ষণেই তিনি লাফাইয়া উঠিয়া, হাত বাড়াইয়া মিসেস্ বানার্জিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মিসেস্ বানার্জি হাঁচিয়া হাঁচিয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তথাপি তিনি ভাবী জামাতার বাহু অবলম্বন করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু আবার তাঁহাকে হাঁচিতে আক্রমণ করিল। কন্যা জানিতেন যে, মাতার এইরূপ অবস্থায় নড়া চড়া করা বিপজ্জনক হইতে পারে। তিনি বলিলেন—

"মাম্মি, তোমার শ্যামবাজারে আজ গিয়ে কাজ নেই। আজ weatherটাও ভাল নয়, হয়ত এখনি বৃষ্টি নামবে। তোমার শেষটা ঠাণ্ডা ফাণ্ডা লেগে একটা অসুখ হতে পারে। থাক, আমি তোমার হয়ে তাঁদের গিয়ে বলুব এখন।"

মিসেস্ বানার্জি একটু আশ্বস্ত হইয়া নিকটস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার শারীরিক দৌর্বল্য তিনি কন্যা ও ভাবী জামাতার নিকট গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কন্যার বিরক্তির আশঙ্কায় তিনি বলিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, তাঁহার পক্ষে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হইবে। মিষ্টার হুইয়ের তত্ত্বাবধানে মেয়েকে ছাড়িয়া দিয়া বানার্জি-গৃহিণী নিশ্চিন্ত হইলেন। উভয়ের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যেরূপ আকর্ষণ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার সঙ্গ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যে তাহারা একত্র ভ্রমণ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিবে না, এই স্বাভাবিক অনুমানের আশ্রয় লইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন।

মাতাকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া মিস্ বানার্জি বক্ষপাশে লগ্ন ঘড়িটি উল্টাইয়া একবার সময় দেখিয়া লইলেন পরমুহূর্তেই মিষ্টার হুইকে ইঙ্গিত করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ফটকের নিকটেই গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। মিস্ বানার্জিকে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আসিতে দেখিয়া শোফেয়ার কিছুক্ষণ সেই দিকেই চাহিয়া ছিল। সে তাহার মুখের চুরুটটি অর্দ্ধদগ্ধাবস্থায়ই ফেলিয়া দিল। আউধ সিং হৰ্ট দিয়াছিল; গাড়ীখানি ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া ফুলিয়া উঠিল। মিস্ বানার্জি বিদায় লইবার জন্য হুই সাহেবের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন। মিঃ হুই অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সে করপল্লব পেষণ করিয়া বলিলেন, "আমিও আসি না? আপনি একলা যাবেন,—আমি আপনাকে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে আসতে পারি না কি?"
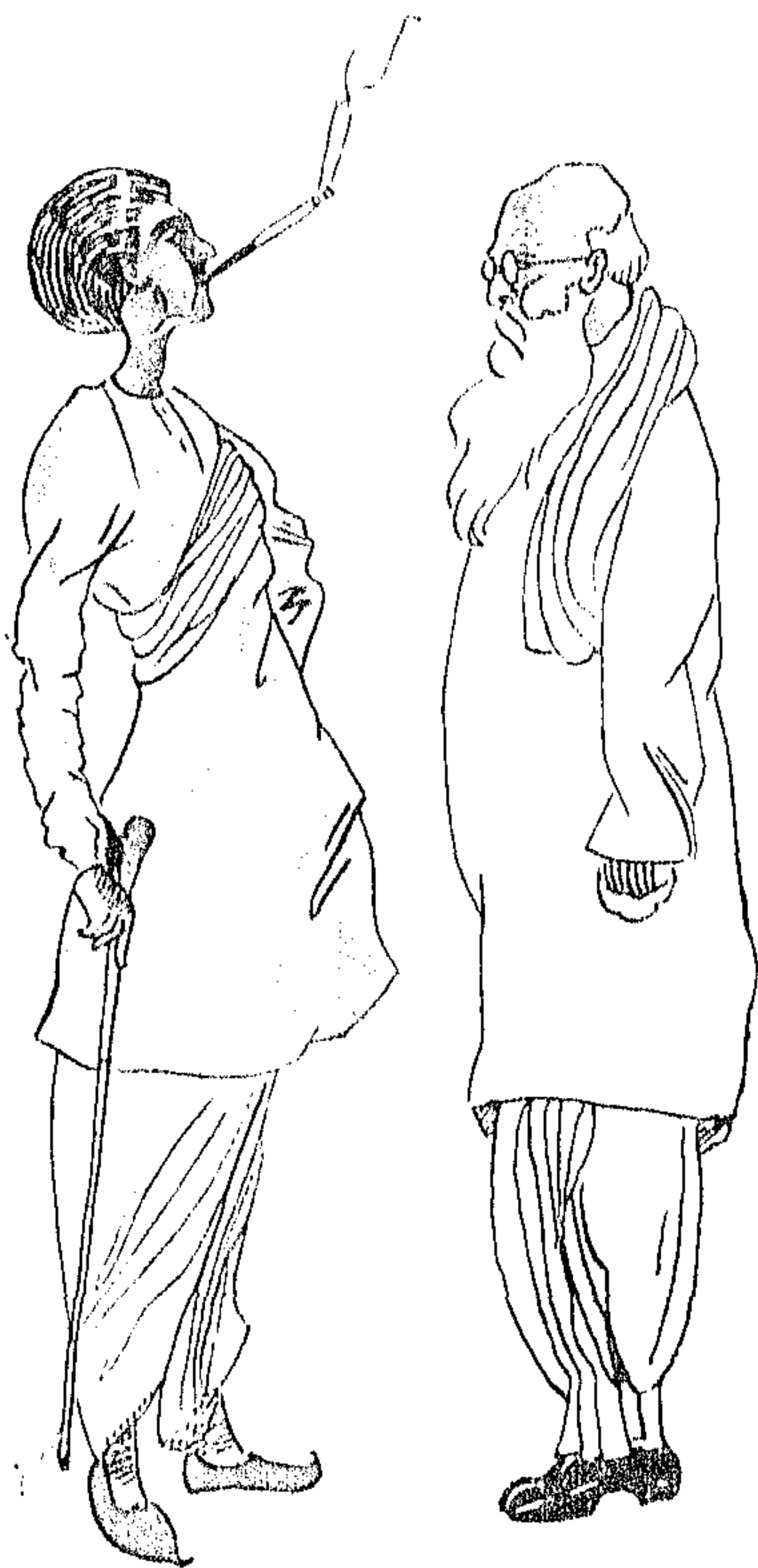
"আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, মিষ্টার হুই। আপনি শুধু আমাকে হেফাজত করবার জন্যে এত কষ্ট স্বীকার করতে চাইছেন। কিন্তু একেবারে তার কোনও প্রয়োজন নেই, আমি পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একলাই Travel করতে পারি; তাতে কারও সাহায্যের দরকার করে না। আপনি কি মেয়েদের এখনও একলা যেতে দেখেন কি? Bye Bye Mr. Hue—"

বলিয়া আপনার হস্ত মুক্ত করিয়া লইয়া মিস্ বানার্জী গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ হুই সবেগে হস্তসঞ্চালন পূর্ব্বক ধাবমান গাড়ীর দিকে পুনঃ পুনঃ সঙ্কেত করিলেন। কিন্তু আউধ সিং ব্যতীত কেহই তাহা লক্ষ্য করিল কি না সন্দেহ।

* * * * *

মিসেস্ বানার্জীর হাঁচির গতিকেই হউক, বা যে কারণেই হউক, আজ যাত্রাটা তেমন ভাল ছিল না। শোফেয়ার আজ উন্মাদ বেগে গাড়ী ছুটাইয়া দিয়াছে। তাহার সুনিপুণ হস্তের কৌশলে গাড়ীখানি স্রোতের টানে হাল্কা সোলার মত পিচ্ছিল পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ভয়ানক গুমোট হইতেছে। দুরন্ত বেগশীল গাড়ীতে বসিয়াও মিস্ বানার্জি হস্তস্থিত পাখা দ্রুত সঞ্চালন করিতেছিলেন। শোফেয়ার তাহা লক্ষ্য করিয়া, এবং হঠাৎ চাকা ঘুরাইয়া একেবারে মাঠের মধ্যে কাস্থরিণা বর্ত্মে আসিয়া পড়িল।

পূর্ব্বে গাড়ী এত বেগে চলিতেছিল যে, মিস্ বানার্জির মেমসাহেবনিন্দিত সাহসও টলিয়া যাইতেছিল, সুতরাং কাস্থরিণার মৃদুমন্দ হাওয়ার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে বেগ যখন কিঞ্চিৎ শিথিল হইল, তখন তিনি প্রতিবাদ করিলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে ইডেন-গার্ডেনের পার্শ্ব দিয়া গাড়ী ষ্ট্রাণ্ডে পড়িল। গঙ্গা-বিধৌত শীতল বাতাসের স্পর্শ লাভ করিয়া মিস্ বানার্জি ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। পশ্চিমাকাশে বিদ্যুৎ বিকাশ হইল, গঙ্গার বক্ষ সে আলোকে শীতল গাম্ভীর্য্যে মণ্ডিত হইল। মিস্ বানার্জি বলিলেন, "ইধার কেঁও আয়া? শ্যামবাজারকা রাস্তা দোসরা হ্যায়।" তুম্ ক্যা নিন্দ যাতা?"

শোফেয়ার বিনয়ের সহিত বলিল, "নেহি হুজুর, ইস্ রাস্তে ভি যা সেক্তে। উস্ রাস্তেমে ত ভিড় হ্যায়।"

"নেই নেই, হামারা দেরী হো যায়েগা, তুম্ জল্দি সিধা রাস্তা সে লে চলো।"—বলিয়া মিস্ বানার্জি একবার গ্যাসের আলোয় বক্ষঃস্থিত ঘড়ি দেখিয়া লইতে চেষ্টা করিলেন। শোফেয়ার তাঁহার ব্যর্থ চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া একটি সুইচ টানিয়া দিল। গাড়ীর ভিতরের ২।৩টা আলো একসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল। মিস্ বানার্জি দেখিলেন যে, ৭টা বাজিয়া মাত্র ১৫ মিনিট হইয়াছে। তিনি শোফেয়ারকে আজ ভাল মত পুরস্কার করিবেন বলিয়া মনে মনে স্থির করিলেন।

গাড়ী নিমতলা দিয়া চিৎপুরে প্রবেশ করিয়াছে। ভিড়ের ভিতর দিয়া সাবধানে গাড়ী অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় শোফেয়ার ও আউধসিং যুগপৎ "আহা হা" শব্দ করিয়া উঠিল, এবং গাড়ী থামাইয়া দিল, একখানি মোটর দ্রুতবেগে পাশ দিয়া চলিয়া গেল।

শোফেয়ার নামিয়া পড়িল, এবং পকেট হইতে নোট-বই বাহির করিয়া জিজ্ঞাসিল, "কেৎনা নম্বর হ্যায় আউধসিং?"

আউধসিং বলিল, "দো হাজার চার শ' তেষট্টি নম্বর।" শোফেয়ার চলিয়া গেল। মিস্ বানার্জি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্যা হুয়া?"

শোফেয়ার জবাব দিল না। আউধ সিং বুঝাইয়া দিল যে, আর একখানা মোটরে মানুষ চাপা দিয়াছে। মিস্ বানার্জি দেখিলেন, রাস্তার উপর একটা জড়পিণ্ডের মত কি পড়িয়া রহিয়াছে। শোফেয়ারের ইঙ্গিতে আউধ সিংও ছুটিয়া গেল, এবং দুজনে ধরাধরি করিয়া সেই মৃতপ্রায় দেহ গাড়ীর নিকটে লইয়া আসিল। পুলিসও আসিয়া জুটিল। শোফেয়ার বলিবার পূর্ব্বেই মিস্ বানার্জি গাড়ী হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; সেখানে এক একটি করিয়া লোক জমিতেছিল।

শোফেয়ার বিনা বাক্যব্যয়ে আহত বালককে গাড়ীর ভিতরে গদীর উপরে শোয়াইয়া দিল। আউধ সিং ও কনেষ্টেবল গাড়ীর ভিতরেই বসিল। শোফেয়ার মিস বানার্জিকে সম্মুখের দিকে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া নিজে অপর দিক হইতে উঠিয়া বসিল। তখন ইতস্ততঃ করিবার সময় ছিল না; আর একটি প্রাণীর এই আকস্মিক মৃত্যুসঙ্কটে মিস্ বানার্জি ডিনারের কথা তখনকার মত ভুলিয়া গেলেন।

শোফেয়ার আউধ সিংকে মেডিক্যাল কলেজের রাস্তা জিজ্ঞাসা করিয়া গাড়ী ঘুরাইয়া দিল। অনতিবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজের গাড়ীবারান্দার নিম্নে মোটর প্রবেশ করিলে, শোফেয়ার নামিয়া গেল, এবং হাঁসপাতালের বাহকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া আহতকে ধীরে ধীরে লইয়া গেল। মিস্ বানার্জি জিজ্ঞাসিলেন, "বহুৎ দেরী হোগা?"

"নেহি সাব" বলিয়া অন্যমনস্কভাবে শোফেয়ার চলিয়া গেল। মিস্ বানার্জি আউধ সিংকে গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতে বলিলেন; ইচ্ছা যে, গাড়ীর ভিতরে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসা যাক্; কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি পড়িতে পড়িতে, গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরিয়া কোনও গতিকে রক্ষা পাইলেন। গাড়ীর গদী, ফুটবোর্ড, ভিতরের সাজসজ্জা সব রক্তে ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে শোফেয়ারের পার্শ্বের আসনে গিয়া বসিলেন।

শোফেয়ারের ফিরিতে বিলম্ব হইল। মিস্ বানার্জি পুনঃ পুনঃ ঘড়ি দেখিতে লাগিলেন। শেষে যখন আধ ঘণ্টাও অতীত হইতে চলিল, তখন একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। ডিনারের জন্য তত নহে; যে সকল ঘটনাপরম্পরার ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন এই গত কয়েক মিনিট ধরিয়া চলিতেছে, তাহার তুলনায় ডিনার কিছুই নয়। একাকী অপরিচিত লোকের সঙ্গে সমস্ত কলিকাতাটা প্রদক্ষিণ করা; তার পর চক্ষুর সমক্ষে মোটর-দুর্ঘটনা; গাড়ীর মধ্যে রক্তের ঢেউ; ডিনারের আনন্দ কোলাহলের পরিবর্ত্তে হাঁসপাতালের রোগীর অব্যক্ত আর্ত্তস্বর; তার পর —তার পর সেইটি একটু লজ্জার বিষয়, এক জন অপরিচিত হিন্দুস্থানী অথবা শিখ যুবকের সঙ্গে একাসনে উপবেশন এ যে গল্প করিবার মত ব্যাপার। এ যে কোনও মেম সাহেবের পক্ষে গর্ব্ব করিবার মত Adventure। মিস্ বানার্জির মনে মেম সাহেব ও Adventure এ দুইটি জিনিস এতই কাছাকাছি যে, একটিকে বাদ দিলে আর একটির কিছুই থাকে না।

বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। মধ্যে মধ্যে আকাশভুবন বিদীর্ণ করিয়া বজ্রনাদ হাঁসপাতালের বৃহৎ অট্টালিকা কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনি তুলিতেছে। মিস্ বানার্জি পুনরপি ঘড়িটি ফিরাইয়া দেখিলেন।

শোফেয়ার আসে না কেন? লোকটি কিন্তু খুব পরোপকারী। সে এত করিতে না গেলেও ত পারিত। চাপা দিলে এক জন, বাঁচাইতে চেষ্টা করিতেছে আর এক জন। মিস্ বানার্জি দেখিয়াছিলেন যে, আহত ব্যক্তি একটি বাঙালী যুবক। বাঙালী যুবকের জন্য পঞ্জাবী শোফেয়ারের এত কি দায় পড়িয়াছিল? সত্যই শোফেয়ারটি খাঁটি লোক। গরীব মানুষ, পরের চাকরী করিতেছে। কিন্তু তবুও তাহার ভিতরে প্রাণ আছে। পঞ্জাবের মানুষগুলা সবাই কি এর মত? পঞ্জাবের লোকগুলা বেশ সুন্দর হয় কিন্তু। শোফেয়ারের দেশে সে বোধ হয় খুব সুন্দর। এর বোধ হয় বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এর স্ত্রীও বোধ হয় খুব সুন্দরী। আহা, এর স্ত্রীর কত কষ্ট। এমন স্বামী ছাড়িয়া থাকা—সেই কোন্ দূর দেশে। কি করিবে বেচারা? কাজ না করিলে খাইবে কি?

মিস্ বানার্জি একটি ছোট রকমের দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া শোফেয়ারের স্ত্রীর উদ্দেশে সমবেদনা প্রকাশ করিলেন। আউধ সিং সিঁড়ির দিকে চাহিয়া সর্দার প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। মিস্ বানার্জি বলিলেন—"আউধ সিং, দেখ না জি, শোফেয়ার ক্যা করতা হ্যায়। হামারা ত টাইম্ হো গিয়া।"

আউধ সিং ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সামরিক রীতিতে অভিবাদন করিল, এবং "হামেরা গাড়ী ছোড়কে যানে কা হুকুম নেহি হ্যায় হুজুর!" বলিতে বলিতে গাড়ীর নিকটে আসিল।

"আউর গাড়ী, ট্যাক্সি, আউর ঘোড়াগাড়ী—কুছ্ মিল্ সক্তা?"

"ইঁয়া কাঁহা মিলে গা, এৎনা পানি মে?"

"তাই ত—বহুত মুস্কিল কী বাত হ্যায়।"

একটু পরেই সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে মিস্ বানার্জি আউধ সিংএর সহিত কথাবার্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কাজটা ঠিক মেমসাহেবের মত হয় ত হইল না। কিন্তু মিস্ বানার্জির অদ্ভুত চরিত্র সব সময়ে অপরের অনুকরণ করিতে অক্ষম।

"আচ্ছা, আউধ সিং, তোম লোককা ঘর কাঁহা?"

"পিণ্ডীমে।"

মিস্ বানার্জি মনে মনে তাহারও জন্মস্থানের ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, "লাহোর কে পাছ?"

"লাহোরসে থোড়া দূর উত্তর তরফ হ্যায়।"

"শোফেয়ার তোমারা ভাই হ্যায়?"

"হামারা মনীব হ্যায় সাব।"

মিস্ বানার্জি মনে করিলেন, তাই ত, আউধ সিং গাড়ীর সহিস মাত্র। শোফেয়ারের আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য সে ত বটেই।

"ঘরমে শোফেয়ারকো কোই হ্যায়?"

"হাঁ হুজুর, উন্‌কো বাপ হ্যায় আউর মা হ্যায়।"

"সাদি হুয়া হ্যায়?"

প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিয়া মিস্ বানার্জি লজ্জিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহার সে লজ্জারক্ত বদনমণ্ডল কেহ দেখিতে পাইল না বলিয়া শীঘ্রই সামলাইয়া লইলেন।

"নেহি মেমসাব।"

এমন সময় কলরব করিতে করিতে রেসিডেণ্ট সাহেব ডাক্তার, দু' তিন জন কলেজের ছাত্র আসিয়া গাড়ীখানিকে তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলেন। তাঁহাদের সকৌতুক দৃষ্টি বানার্জিকন্যাকেও বিব্রত করিয়া তুলিল। ডাক্তার সাহেব গাড়ীর নম্বর ও ঠিকানা ইত্যাদি টুকিয়া লইলেন।

মিস্ বানার্জি একটু বিস্মিত হইতেছিলেন। শোফেয়ার ডাক্তার সাহেবের সব কথাগুলির উত্তর বেশ সপ্রতিভ ভাবে ইংরেজিতে দিতেছিল। তাহাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কারণ, অনেক যুবক ইংরেজি লেখাপড়া কিছু শিখিয়া মোটর-চালকের কাজ করে। কিন্তু এমন বিশুদ্ধভাবে, এমন সুরে ইংরেজি কথা যে একজন সাধারণ পঞ্জাবী যুবক কহিতে পারে, ইহা তাঁহার ধারণায়ও কখনও আসে নাই।

রেসিডেণ্ট ফিজিশিয়ান সাহেবের অনুমতি লইয়া শোফেয়ার গাড়ী চালাইয়া দিল।

মিস্ বানার্জির মনে হইল, শোফেয়ার তাঁহার বড় কাছ ঘেঁসিয়া বসিয়াছে। তিনি একটু ভাল হইয়া, একটু সোজা হইয়া বসিয়া শোফেয়ারের সংস্পর্শ-দোষ এড়াইবার চেষ্টা করিলেন।

মিস্ বানার্জি বলিলেন —"আবি ৮ বাজ গিয়া ; হামারা বহুৎ দের্ হুয়া।"

"কুছ পরওয়া নেহি ; দো মিনিটমে পঁহুচায় দেউঙ্গা" বলিয়া শোফেয়ার গাড়ী ছুটাইল। বৃষ্টি তখনও থামে নাই। মিস্ বানার্জির পিঙ্ক রঙ্গের বেনারসী শাড়ী বর্ষায় ভিজিয়া সাদা হইয়া গেল। কালীতলার মোড়ে আসিয়া গাড়ী হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। কারবোরেটারে জল ঢুকিয়া আগুন নিভাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং গাড়ী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া মিস্ বানার্জি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোনও উপায়ই কি নাই ?"

"না, কোনও উপায় নাই ; অত্যন্ত দুঃখিত।"

শোফেয়ারের স্বরে দুঃখের কোনও চিহ্ন বুঝা গেল না। বরং একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুক যেন তাহার চোখে মুখে খেলিয়া গেল। শোফেয়ার গাড়ীতে উঠিয়া বসিল ; বৃষ্টির ধারায় তাহার সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছিল। সে মিস্ বানার্জির বসন আর্দ্র হইবার আশঙ্কায় যথাসম্ভব সঙ্কুচিত হইয়া বসিল। বর্ষার ধারা তাঁহার গায়েও শলাকার মত প্রবেশ করিতেছিল। কিন্তু তাহাতে তাঁহার রক্তকে ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারিল না। নূতন রকমের কিছু হইলেই মিস্ বানার্জির রক্ত তালে তালে নাচিতে থাকিত। সুতরাং আশঙ্কা ও অসুবিধার গুরুত্বের অনুপাতে মিস্ বানার্জির কৌতূহলের মাত্রা বাড়িয়াই যাইতেছিল। পল্লীগ্রামে তাঁহার পিতার সহিত প্রথম প্রথম পাখী ও খরগোস শিকার করিতে যাইতে তিনি আমোদ বোধ করিতেন। দু'চারবার চেষ্টার পর যখন হাতের লক্ষ্য ঠিক হইয়া গেল, তখন আর ঘুঘু, সজারু, খরগোস শিকার করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হইত না। বাঘ-ভালুক পাইলে বরং সেখানে যাইতে তাঁহার আমোদ হইত ; কিন্তু বাঘ-ভালুক সব সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে মিলে না।

শোফেয়ার পকেট হইতে চুরুটের বাক্স্ বাহির করিয়া মিস্ বানার্জির দিকে চাহিয়া আজ সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার আপত্তি আছে কি ?"

মিস্ বানার্জি শুধু ঘাড় নাড়িলেন। শোফেয়ার চুরুট ধরাইয়া তাহার ধূমে আপনাকে, কিছুক্ষণ নিমজ্জিত করিয়া দিল। মিস্ বানার্জি কল্পনা করিতে চেষ্টা করিলেন, সে কি ভাবিতেছে। বোধ হয়, তাহার

বিপদের কথা ভাবিতেছে। তাঁহাকে গাড়ীতে উঠাইয়াই তাহার যত বিপদ্! কিন্তু সে ত তাহার জন্য টাকা পাইবে। তবুও মিস্ বানার্জি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে লইয়াই যে সে বেচারী এই দুর্য্যোগের মধ্যে পড়িয়াছে, এই চিন্তা তাঁহাকে কিঞ্চিৎ পীড়া দিতে লাগিল। পরক্ষণেই তিনি ভাবিলেন যে, এক হিসাবে তাহার তেমন দুঃখের কারণ নাই। সামান্য এক জন মোটর গাড়ীর চালক তাঁহার মত এক জন সম্ভ্রান্ত, বিদুষী, রূপসী বঙ্গ-মহিলার পার্শ্বে বসিতে পাইয়া নিশ্চয়ই অদ্যকার সন্ধ্যার ভ্রমণ হইতে এমন একটি মাধুর্য্যের স্মৃতি সঞ্চয় করিয়া লইতেছে—যাহা তাহার সারাজীবনে একটা বিপুল আনন্দের প্রবাহ বহাইবে! মিস্ বানার্জির রূপের অভিমান ছিল, সকল রমণীরই থাকে। এবং মিস্ বানার্জি একটি চোখের কোণে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার রূপের প্রভাব গরীব শোফেয়ারের প্রতি একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

ঘণ্টা কয়েক পরে জল কমিয়া গেলে অনেক কষ্টে মোটরের উদ্ধারসাধন করিয়া লইয়া শোফেয়ার মিস্ বানার্জিকে বাড়ীতে পঁহুছিয়া দিল। মিস্ বানার্জি ২০ টাকার দুখানা নোট তাহাকে দিতে গেলে সে দীর্ঘ সেলাম করিয়া বলিল—"বখশিস চাহি, মেমসা'ব।"

মিস্ বানার্জির নিকট কুড়ি টাকার অধিক ছিল না; তিনি একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া প্রসন্নমনে অভিবাদন করিয়া শোফেয়ার গাড়ী চালাইয়া দিল। বলিয়া গেল—"কাল সাম কো লেগা।"

* * * *

পর দিন মিস্ বানার্জির চায়ের পার্টী বেশ জমিয়া গিয়াছিল। বৃদ্ধ মিঃ বানার্জি আফিস হইতে সকাল সকাল ফিরিয়া, কন্যার বন্ধুগণকে সংবর্দ্ধনা করিতে ব্যস্ত ছিলেন। মিসেস্ বানার্জির হাঁচি কমিয়া গিয়া হাঁফা-নিতে পরিণত হইয়াছিল। তিনি একখানি কুশন চেয়ার দখল করিয়া দুই সাহেবকে আতিথেয়তাসূত্রে, উচ্ছ-লিত ভাবী শ্বশ্রূস্নেহের পূর্ব্বাস্বাদ দিতে দিতে কয়েক পেয়ালা চা ও কেক-বিস্কুটের সৎকার করিতেছিলেন।

খানসামারা মিস্ চৌধুরী, মিস্ বোস প্রভৃতির দিকে পুনঃ পুনঃ চায়ের ট্রে বাড়াইয়া দিয়া আপ্যায়িত করিতেছিল। মিস্ বোসকে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে চকলেট তুলিয়া লইতে দেখিয়া মিস্ বানার্জি ছুটিয়া আসিলেন, এবং দু তিন রকমের কেক তুলিয়া লইতে তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

মিস্ বোস্ বলিলেন, "আমি ত তোমার নেমন্তন্ন রাখ্তে আসিনি; শুধু দেখ্তে এসেছি তোমার কোনও অসুখ করেচে কিনা। কাল তুমি যাও নি দেখে আমি ভাব্লুম যে, নিশ্চয়ই তোমার ব্যামো-ট্যামো কিছু হয়েছে।"

মিস্ বানার্জি পুনশ্চ দুঃখ প্রকাশ করিয়া কাতরভাবে বলিলেন, "আমি তোমার ডিনারে যাব ব'লে যে রকম অসুবিধা কাল ভোগ করেছি, তা জীবনে কখনও ভুলবো না। একবার ভাব দেখি, চোখের উপর মোটরে মানুষ চাপা পড়্‌ল আর সেই মানুষকে আমরা মোটরে তুলে নিয়ে হাঁসপাতালে নিয়ে এলুম—মোটরে রক্তের বন্যা বয়ে গেল—এতে মনে কর, কোনও মেয়ের nerve হ'লেও দমে যেত! তোমার বাড়ীতে পেয়ালা পিরীচের ঠুন্ ঠুন্ শব্দে আর রোষ্ট-কারীর গন্ধে তোমাদের হল যখন ভরপুর, তখন we were roughing it out in the streets—the poor Shauffer and I."

সকলে অবাক্ হইয়া মিস্ বানার্জির উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। মিস্ চৌধুরী চাপা গলায় বলিলেন,—"মিনি, তোমার সেই শোফেয়ার নাকি, যে সেদিন তোমার মুখ দেখে অজ্ঞান হয়েছিল ?"

মিস্ বানার্জি তাঁহাকে একটি কিল দেখাইয়া ও ভঙ্গী করিয়া শাসন করিলেন। মিষ্টার হুই একটু অস্থির হইয়া উঠিলেন। মিষ্টার রায় ও মিষ্টার শাশমল হুইয়ের নিকটে মুখ আনিয়া বলিলেন, Buck up, old Chap." |

মিস্ বানার্জি আবেগের সহিত গত রজনীর ঘটনা বিবৃত করিলেন। সকলে বিস্ফারিত-নেত্রে মিস্ বানার্জির দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিসেস্ বানার্জি পুলক হইতেছ হুইয়ের কর্ণকুহরে শোফেয়ারের সুখ্যাতির তীব্র আরক ঢালিয়া দিতেছিলেন। হুই আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"কাল অমন ভাবে ঐ একটা পঞ্জাবী ভূতের সঙ্গে আপনার যাওয়া উচিত হয় নি—ও লোকটার বিটকেল চেহারা দেখেই আমার মেজাজ বেজায় বিগড়ে গেছ্লো—তা নইলে আমি আপনার সঙ্গে কাল যেতুম, আপনাকে একলা কোনও ক্রমে ঐ হতভাগাটার সঙ্গে যেতে দিতাম না।"

মিষ্টার শাশমল কাছেই বসিয়াছিলেন। তিনি হুইয়ের কানে কানে বলিলেন,—"Bravo, our Kinght Templar !"

মিস্ বানার্জি মিঃ হুইকে একটু রাগাইবার জন্য বলিলেন, "এ দেশে এমন অনেক প্রেত আছে, যাদের চেয়ে পঞ্জাবের ঐ ভূতটি অশেষ গুণে ভাল।" শাশমলের উৎসাহপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"দেখুন, মিষ্টার শাশমল, সত্যি অমন আর এক জনও শোফেয়ার আপনি দেখেন নাই। কাজ ক'রে যাচ্ছে, অথচ মুখে কথাটি নেই। শক্তির সীমা নেই, অথচ সংযম আছে। পুলিসকে দুই ধমকে সিধে ক'রে দিলে, আবার আহতকে কত যত্ন ক'রে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে হাঁসপাতালে ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে এল! আমাদের মত সভ্যতার বার্নিশ ওর না থাক্তে পারে, কিন্তু ও লোকটা একটি সত্যিকার রক্তমাংসওয়ালা মানুষ। অসভ্য, বর্ব্বর হ'তে পারে, কিন্তু ওর হৃদয় আছে। ভাবুন, মুসলধারে বৃষ্টি পড়ছে—কালীতলার মোড়ে এক হাঁটু জল জ'মে গেছে—তার মাঝে মোটর আট্‌কে গেছে, রাস্তার আলো প্রায় নিভে গেছে, এই অবস্থায় আমি তার সঙ্গে তিন তিনটি ঘণ্টা একলা কাটাতে বাধ্য হয়েছিলুম; কিন্তু তাতে আমার একটুও কষ্ট বা অসুবিধা সে হ'তে দেয় নি। বেচারী একটা চুরট ধরাবে, তাও আমার অনুমতি না নিয়ে করবে না।"

মিষ্টার হুইয়ের সহিত রায়, শাশমল প্রভৃতির একবার চকিতে চোখোচোখি হইয়া গেল। মিসেস্ বানার্জির বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে শোফেয়ারের গুণপণা আরও অতিরঞ্জিত করিয়া গল্প করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। খানসামারা চায়ের সরঞ্জাম সরাইয়া লইতেছে এবং আইসক্রিম পরিবেশন করিতেছে। এমন সময় বেয়ারা আসিয়া সংবাদ দিল, "মোটর আয়া।"

সকলে পরস্পর চাওয়াচাওয়ি করিলেন। মিস্ বানার্জি বলিলেন, "ওঃ, সেই মোটর এসেছে। কাল ওকে টাকা দিতে গেছ্‌লুম—তা ও বখশিশ চাইলে। আমার কাছে বেশী টাকা ছিল না, আর রাত্রি তখন ১টা। কে আবার তখন বখশিস আন্‌তে যায়—আমি তাই ওকে আজ আস্‌তে বলেছিলুম।"

মিঃ বানার্জি বেয়ারাকে বলিলেন, "যাও, মোটরওয়ালাকে সেলাম দাও। মিস, আমি ওকে বখশিস করবো। কাল তোমায় অত রাতে ভালয় ভালয় পৌঁছে দিয়েছে, এর জন্যে আমি ওকে নিজে ধন্যবাদ দিতে চাই। তুমি যতক্ষণ না ফিরে এলে, ততক্ষণ আমি কাল ঘুমোতে পারিনি।"

মিসেস্ বানার্জি প্রতি কথায় ঘাড় নাড়িয়া অনুমোদন করিলেন।

শোফেয়ার দরজার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। পরদার লেসের ভিতর হইতে তাহার মুখের কতকাংশ দেখা যাইতেছিল। সে মিসেস্ বানার্জির দিকে চাহিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। খাকীর শার্টের উপর খাকীর একটা শার্ট ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে। গলার বোতাম না থাকায় মাংসপেশীবহুল বক্ষ ঈষৎ উন্মুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। পায়ে স্থূল বুটের উপর পটি জড়ান। যবকের সর্ব্বাঙ্গে পরিপূর্ণ যৌবন ও স্বাস্থ্য যেন উথলিয়া পড়িতেছিল। তাহার দৃষ্টি সকলকে অতিক্রম করিয়া মিষ্টার হুইয়ের প্রতি অর্পিত হইয়াছিল।

বানার্জি সাহেব বুকপকেট হইতে একখানি নোটবুক বাহির করিলেন, এবং তাহার মধ্য হইতে কয়েকখানি নোট লইয়া তাঁহার স্ত্রীর হস্তে দিলেন; বলিলেন, "ননী, তুমি ওকে দেও। আমা অপেক্ষা তোমার দেওয়া পুরস্কার ও বেশী সম্মানের ব'লে মনে করবে।"

ইহাতেই মুস্কিল বাধিল, মিসেস্ বানার্জির পক্ষে আসন ত্যাগ করিয়া অতটা যাওয়া শ্রমসাপেক্ষ। বানার্জি সাহেব আগে সেটা ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি পত্নীর উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন এবং বিনা আড়ম্বরে দরজার নিকট গিয়া শোফেয়ারকে টানিয়া তাঁহার নিকট লইয়া আসিলেন। মিসেস্ বানার্জি সস্মিতমুখে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার হাতের মধ্যে নোটগুলি গুঁজিয়া দিলেন। সে গম্ভীরভাবে অভিবাদন করিল। মিস্ বানার্জি হাস্যমুখে তাহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন। হুই সাহেব ত রাগে গরগর্ করিতে লাগিলেন। তিনি আইসক্রিমের কাচপাত্র ও চামচে সশব্দে টিপয়ের উপর ফেলিয়া ইংরেজিতে বলিয়া উঠিলেন;—"কি যে মিছে হৈ চৈ আপনারা কচ্চেন, তার ঠিকানা নেই। কাল ও যা করেচে, তার জন্যে এক বাণ্ডিল নোটের পরিবর্ত্তে ঘোড়ার চাবুকের ব্যবস্থা করলেই সুব্যবস্থা হ'ত। ও একটা জানোয়ার। এক জন ভদ্রমহিলাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে না দিয়ে সারা সহর ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে—মিস্ বানার্জিকে অনর্থক সারা রাত কষ্ট দিয়েছে—engagement রাখতে দেয় নি, তাকেই আবার আস্কারা দিয়ে আপনারা একেবারে মাথায় তুলচেন। এর বখশিস দেবার ব্যবস্থাটা আমার উপরে দিলে ভাল হ'ত।" বলিয়া হুই সাহেব শোফেয়ারের দিকে কটমট ভাবে চাহিয়া রহিলেন—ভাবটা এই যে, এখনই উহাকে হাতে হাতে পুরস্কার দিতে পারিলেই ভাল হইত।

মিস্ বানার্জি লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন, এবং হুইয়ের ব্যবহারে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন।

শোফেয়ার সকলের দিকে চাহিয়া দেখিল। তার পর নোটের তাড়া হুয়ের মুখের উপর ছুড়িয়া দিয়া স্পষ্ট ইংরাজিতে বলিল, "আচ্ছা মহাশয়, তাহাই হউক, পুরস্কারের ভার আপনার হস্তেই রহিল। আমি নীচে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব, একখানি ঘোড়ার চাবুকও ভাল দেখিয়া যোগাড় করিয়া রাখিব। কি বলেন? বিদায় ভদ্রমহিলাগণ, বিদায় ভদ্রমহোদয়গণ; আমার গোস্তাকি মাফ করবেন।"

শোফেয়ার গর্ব্বিত পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। সকলেই স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। হুই সাহে

অপমানের জ্বালায় তত না হউক, আপাততঃ চোখের জ্বালায় একটু বিব্রত হইয়া উঠিলেন। নোটের তাড়া তাঁহার চোখে আসিয়া লাগিয়াছিল। তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ চোখে রুমাল দিতে দেখিয়া অনেকেই মুখে রুমাল দিয়া একটু হাসিয়া লইলেন।

মিষ্টার তুই থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "ভদ্রলোকের গৃহ মন্দিরের ন্যায় পবিত্র, ঐ এক গুণ্ডার সহিত গুণ্ডামি করিয়া ত মিষ্টার বানার্জির গৃহ কলঙ্কিত করিতে পারি না।"

মিষ্টার বানার্জি শোফেয়ারের সহিত বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, এবং তিন চার মিনিট পরে আবার তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। একখানি বেতের চেয়ার তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"Please take this chair, Ladies and Gentlemen, allow me to introduce to you the Koer Saheb of Balakot."

মিস্ চৌধুরী বলিলেন, "ইনি বালাকোটের কোঙার সাহেব!"

মিস্ বোস্ বলিলেন, "তাই ত সেদিন কুচবিহারের বাড়ীতে এঁকে দেখেছি যে। কুচবিহার টিমের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে এসেছেন—ইনি যে এক জন বিখ্যাত ক্রিকেটার।"

মিষ্টার বানার্জি বলিলেন, "হাঁ, তিনিই।"

মিসেস্ বানার্জ্জি হাঁচিতে আরম্ভ করিলেন। তথাপি তিনি মিষ্টার তুইকে ঠেলিয়া দিলেন, "পিয়ারী, ক্ষমা চাও, ক্ষমা চাও। তুমি ওকে ভারি অন্যায় বলেছ।"

মিষ্টার তুই আরক্তবদনে টলিতে টলিতে তাহার নিকট গিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন। কোঙার সাহেব গর্ব্বিতভাবে তাহার করমর্দ্দন করিয়া হাসিলেন।

মিষ্টার বানার্জি বলিলেন, "আমি উঁহার সহিত করমর্দ্দন করতে গিয়াই বুঝিলাম যে, উনি আমারই ন্যায় এক জন কি যেন, Grand Lodge-এর Member। তখন ঠিক ঠাওর করতে চেষ্টা করছি যে, কে উনি। তার পর ওঁর গাড়ীতে মোনোগ্রাম দেখে আর ওঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে ওঁর পরিচয় পেলুম। তবে শোফেয়ারের ভূমিকাটা একটু আশ্চর্য্যের বটে।"

মিষ্টার বানার্জির এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে কোঙার সাহেব সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কি বলিবেন, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় মিস্ বানার্জি আইস্ক্রিম্, কেক প্রভৃতি স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া তাঁহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিলেন। মিসেস্ বানার্জি অতি কষ্টে আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে আহারের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। কোঙার সাহেব প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন। কিন্তু মিস্ বানার্জি বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত বকশিস না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। কাজেই কোঙার সাহেবকে আহারে বসিতে হইল।

তার পর চেয়ার হইতে উঠিয়া মিস্ বানার্জ্জিকে সৈনিক প্রথায় সেলাম করিয়া কোঙার সাহেব বলিলেন,—"গাড়ী হাজির হায় মেমসাব!"

সকলেই হাসিতে লাগিলেন। মিস্ বানার্জ্জি "অভি হাম আতা" বলিয়া ছুটিয়া অন্য ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই একটি ছাতা ও রুমালের ব্যাগ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,— "হাম, তৈয়ার হায়, শোফেয়ার।"

অন্যান্য নিমন্ত্রিতেরাও গৃহে যাইবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। মিস্ ব্যানার্জ্জির সহিত সকলে নামিয়া গেলেন। ফটকের ধারে একখানি প্রকাণ্ড Rolles Royce Car অপেক্ষা করিতেছিল। মিস্ ব্যানার্জ্জি বন্ধুবান্ধবকে তাহাদের গাড়ীতে তুলিয়া দিল, কোডার সাহেবের সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইলেন। আজ উভয়েই ভিতরে বসিলেন। আডম সিং শোফেয়ারের বদলী কাজ করিল।

*   *   *   *

সেবারে সীমান্তের টিম্ শীল্ড খেলিতে পারিল না, এবং সে জন্য খেলোয়াড়রা মনে মনে চটিয়া যাইতে পারিল না, কারণ, তাহাদের সর্বজনপ্রিয় ক্যাপ্টেনের ভাগ্যে বধূলাভ হওয়ায় তাহারা "অল্ ইণ্ডিয়া কাপ" না পাওয়ার দুঃখ বিস্মৃত হইয়াছিল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

শূন্য ও পূর্ণ।

১

লোক কথায় বলে, লক্ষ কথা নহিলে বিবাহ হয় না। কিন্তু যখন লক্ষ লক্ষ কথার পরও মালতীর বিবাহ স্থির হইল না, তখন তাহার মা বিশাখা ক্ষোভে ও রোষে একান্তই অধীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্ষোভের ও রোষের প্রধান কারণ, এই যে লক্ষ লক্ষ কথা, এ সব প্রায় তিনিই কহিয়াছেন, এবং তাঁহার স্বামী অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে শুনিয়া গিয়াছেন—যেন কথাগুলা তাঁহার এক কানে প্রবেশ করিয়া অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। সে দিন রবিবার। বিশাখা একজন ঘটকীকে আসিতে বলিয়া দিয়াছিলেন—এক স্থানে "মেয়ে" দেখানর ব্যবস্থা করিতে হইবে। স্বামী সুরেশচন্দ্র সপ্তাহের মধ্যে এই ছুটার দিনটা প্রায়ই কোথাও বাহির হইতেন না—বাড়ীতেই থাকিতেন, সে দিনও ছিলেন। বিশাখার কথামত ঘটকী যাইয়া সুরেশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, আজ তাঁরা মেয়ে দেখিতে আসিবেন ত?"

সুরেশচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়?"

"কেন, মা আপনাকে বলেন নাই?"

"বোধ হয় বলিয়াছেন। ঠিক মনে নাই। তুমি বল ত শুনি।"

ঘটকী মেজের উপর বসিয়া ভবানীপুরের মল্লিকদের ছেলের "ঘরের" ও টাকার কথা "প্রকাশ করিয়া" বলিতে লাগিল। তাহার কথা শেষ হইলে সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "ছেলে লেখাপড়া করে না?"

ঘটকী বলিল, "করে বৈ কি? ঘরে তিন তিনটি মাষ্টার। তবে মল্লিকরা বনেদী ঘর—ছেলেরা গরীব-দুঃখীর ছেলের মত স্কুলে যায় না। আর পাশ করা ত পয়সার জন্য—তা তা'দের ত আর পয়সার অভাব নাই!"

সুরেশচন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা ত বটেই।"

"তবে ত আজই মেয়ে দেখান ঠিক?"

"এত তাড়াতাড়ি কেন?"

"ওমা! এ সম্বন্ধ কি 'ব'সে থাকে?' বলে—ঘটক-ঘটকীতে বাড়ীর ধূলা রাখিতেছে না—কেহ দশ হাজার, কেহ পনের হাজার—হীরার বালা, মোতীর মালা লইয়া সাধাসাধি করিতেছে। মা কত করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তাই আমি কত কষ্টে তাহাদের মেয়ে দেখিতে রাজি করাইয়াছি।"

"তুমি অতটা কষ্ট না করিলেই পারিতে।"

"সে কি গো?"

"ও ঘরে আমি মেয়ে দিব না।"

মেয়ের বাপের এত বড় কথায় ঘটকী অত্যন্ত বিস্মিত হইল, বলিল, "মা ত আমাকে বলেন, ঐ ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ ঠিক করিয়া দিলে নগদে এক শত টাকা আর গরদের কাপড় দিবেন।"

"তবে সে সব দেওয়া আর তাহার ভাগ্যে ঘটিল না।"

"সত্য কি আপনি ভবানীপুরের মল্লিকদের ঘরে মেয়ে দিবেন না?" যেন কথাটা বিশ্বাসযোগ্যই নহে।

সুরেশচন্দ্র স্থিরভাবে বলিলেন, "না।"

ঘটকী রাগে গরগর করিতে করিতে যাইয়া বিশাখাকে বলিল, "মা, মেয়ের বিবাহ যদি না-ই দিবে, তবে কেন আমাদের মিথ্যা কষ্ট দাও?" সে সিঁড়ির দিকে গেল।

কি হইয়াছে বুঝিতে না পারিয়া বিশাখা বলিলেন, "বলি, ও ঘটক ঠাক্‌রুণ, কি হইয়াছে?"

ঘটকী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "বাপ্ বলিলেন, ও ঘরে মেয়ে দিবেন না।"

বিশাখা বলিলেন, "বল কি? যে ঘরে মেয়ে পড়া তপস্যার ফল, সে ঘরে মেয়ে দিবেন না?"

"তাই ত বলিলেন।"

বিশাখা স্বামীর ঘরে গমন করিলেন। সুরেশচন্দ্র নিশ্চিন্তভাবে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন। বিশাখা তাঁহার পদের কাছে মেঝেয় মাথা ঠুকিয়া বলিলেন, "আমার ঘাট হইয়াছে; আমি আর মেয়ের বিবাহে কোনও কথা বলিব না; তুমি যাহা ইচ্ছা কর।"

সুরেশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "দেখ, ঠিক ত?"

মেঝেয় পুনরায় মাথা ঠুকিয়া বিশাখা বলিলেন, "হাঁ গো হাঁ।"

সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "এখন তুমি মাথা ঠোকা বন্ধ রাখ—আমি খাটিয়া খাই, অনেক কষ্টে মেয়ের বিবাহের টাকা জমাইয়াছি—তাহার মধ্য হইতে যদি আবার তোমার চিকিৎসার টাকা বাহির হইয়া যায়, তবে এখন আর মেয়ের বিবাহ দিতে পারিব না।"

"সত্য কি তুমি মল্লিকদের ঘরে মেয়ে দিবে না?"

"নিশ্চয়ই দিব না। আমার ঠাট্টা করিবার কোনও কারণ নাই—মল্লিক মহাশয়রা ত তোমার ভাই নহেন।"

"তবে কি করিবে?"

"তুমি তিন বৎসর চেষ্টা করিলে, আমাকে না হয় তিন দিনের সময় দাও।"

বিশাখা আর কোনও কথা বলিলেন না। তিন দিন কেন, তিন মাস সময় দিতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না—কারণ, গত তিন বৎসরে তিনি এ বিষয়ে স্বামীর উৎসাহ উদ্দীপ্ত করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেন যে সুরেশচন্দ্র এত দিন কন্যার বিবাহবিষয়ে ঔদাসীন্য দেখাইয়াছেন, বিশাখা তাহা বুঝিতে পারেন নাই। প্রকৃত কথা এই যে, পাত্রের যোগ্যতা-বিষয়ে স্বামীর মতে ও স্ত্রীর মতে কিছুমাত্র ঐক্য ছিল না। সুরেশচন্দ্র স্বভাবতঃ বিরোধের বিরোধী—যে দিকে বিরোধ সর্বাপেক্ষা অল্প, তিনি সেই দিকে যাইতে চাহিতেন; বিশেষ কন্যার বিবাহসম্বন্ধে তিনি এক দিকে যেমন স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, আর এক দিকে তেমনই আপনার মত হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইতে অসম্মত ছিলেন—কেন না, কন্যার

প্রতি পিতার কর্ত্তব্য তিনি পবিত্র বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—বিশাখা যখন স্বয়ং চেষ্টা করিয়া কন্যার বিবাহ স্থির করিবার আশা ত্যাগ করিবেন, তিনি তখন পাত্র বাছিয়া লইবেন। তিনি যে পাত্রের সন্ধান রাখিতেছিলেন, বিশাখা তাহাও জানিতেন না।

বিশাখার আপনার বিবাহের সময়ও এমনই হইয়াছিল। তাঁহার মাতা আপনি মধ্যবিত্ত সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের কন্যা—অসাধারণ রূপের জন্য অনায়াসে ধনীর বধূ হইয়া যে পরিবারে আসিয়াছিলেন, সে পরিবার কেবল কলিকাতায় নহে, পরন্তু সমগ্র বঙ্গদেশে ধনী পরিবার বলিয়া পরিগণিত। তাঁহার পিত্রালয়ে বিদ্যাই পুরুষের অলঙ্কার বলিয়া বিবেচিত হইত—ধনের অহঙ্কার ছিল না। কিন্তু তিনি যে পরিবারে আসিয়াছিলেন, সে পরিবারে ধনের অহঙ্কার এত অধিক যে, তাঁহারা মনে করিতেন, ধনীর কোনও দোষই দোষ নহে—দারিদ্র্যই দারুণ অপরাধ। তাঁহাদের চালচলন নিতান্তই "বাদশাহী" রকমের—মেয়েদের গতায়াতে গাড়ী ব্যবহৃত হইত না—পাল্কীতে আবার ঘেরাটোপ দেওয়া হইত—বধূরা পিত্রালয়ে এক সঙ্গে "তেরাত্তির" বাস করিতে পাইত না—ইত্যাদি। সে সবও মানুষের অভ্যাসে সহ্য হয়। কিন্তু বিশাখার মাতা যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং শৈশবে ও বালিকাবয়সে যে পরিবারের আদর্শে শিক্ষালাভ করিয়া সে শিক্ষা আপনার প্রকৃতিগত করিয়া লইয়াছিলেন, সে পরিবারের কন্যা হইয়া তিনি পতিগৃহের একটা ব্যাপার কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন নাই—সে পরিবারের পুরুষদিগের ব্যসন তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারেন নাই। বড় বাড়ীতে যেমন পেচক-পারাবত বাসা করে—সে পরিবারে তেমনই আলস্য ও বিলাস বাসা বাঁধিয়াছিল, এবং তাহার ফলে ব্যসনাসক্তি সঞ্জাত হইয়াছিল। বদ্ধ গৃহে যে দীপ প্রজ্বালিত হয়, তাহা যেমন বাহিরে আলোকবিস্তার করিতে পারে না, এবং ঘরের মধ্যে জিনিসগুলা খুব উজ্জ্বল করিয়া দেখায়, আমাদের অন্তঃপুরিকাদিগের বুদ্ধি তেমনই বাহিরে প্রযুক্ত হইতে পারে না বটে, কিন্তু ঘরের ব্যাপারটা খুব ভাল করিয়া বুঝে। বিশাখার মাতা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন—স্বামীর ধন থাকিলেই স্ত্রীর সুখ হয় না, পরন্তু সে অর্থ অনেক সময় অনর্থেরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তাই তিনি শিশু কন্যার মুখ চাহিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাকে ধনীর ঘরে দিতে দিবেন না। কন্যার কল্যাণকামনায় মাতার হৃদয়ে এই সঙ্কল্প এমনই দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়াছিল যে, সে সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে কত বাধাবিঘ্ন থাকিতে পারে, তাহা তিনি মনেই করেন নাই। কন্যার বয়স যত বাড়িয়াছিল, তাঁহার সঙ্কল্পও তত দৃঢ় হইয়াছিল। শেষে তাঁহার দৃঢ়তারই জয় হইয়াছিল, এবং পরিবারের আর সকলের আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বিশাখার পিতা তাহাকে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে একমাত্র ছেলের হাতে দিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি স্বয়ং অপমানিত বোধ করিয়াছিলেন এবং স্ত্রীর উপর রাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাকে স্ত্রীর কাছে পরাভব মানিতে হইয়াছিল। লক্ষ লক্ষ কথার পর তাঁহার স্ত্রীর কথাতেই কাজ হইয়াছিল—নিজের কথা তিনি রাখিতে পারেন নাই। তিনি তখন কন্যা-জামাতাকে যে সব আসবাব দিয়াছিলেন, জামাতার গৃহে সে সকল রাখিবার স্থানও ছিল না। তবে পরে জামাতা আপনি—শ্বশুরের সাহায্যমাত্র না লইয়া যে গৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহা সজ্জিত করিতে সে সব আসবাবেও কুলায় নাই।

বিশাখা কিন্তু এ বিষয়ে পিতার মতেরই উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন—ধনিকন্যার মনের আকর্ষণ দূর হয় নাই। সুরেশচন্দ্র তাহা জানিতেন, এবং জানিতেন বলিয়াই এত দিন কন্যার বিবাহে উদাসীনভাব প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি আপনার মত কিছুতেই ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না—আবার পারিবারিক শান্তি নষ্ট করিতেও নিতান্ত অনিচ্ছুক ছিলেন। তাই প্রত্যক্ষভাবে স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কন্যার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন নাই; জানিতেন, বিশাখা যখন কন্যার বিবাহ স্থির করিতে অক্ষম হইবেন, তখন তাঁহার পক্ষে মনোমত সম্বন্ধ স্থির করা সম্ভব হইবে। স্বামী যে ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করিয়া যশ ও অর্থ অর্জন করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিশাখার "মন উঠিত" না—কেন না, সে পয়সা খাটিয়া রোজগারের পয়সা—তাহা পর্ব্বতের উপর হইতে গড়াইয়া আসা জলের মত পূর্ব্বপুরুষ হইতে পরম্পরাক্রমে আইসে নাই। স্বামী বড় উকীল—কিন্তু বনিয়াদী "বড়মানুষ" নহেন। বনিয়াদী ঘরে—ধনীর ঘরে মেয়ে দিবেন, ইহাই বিশাখার আকাঙ্ক্ষা ছিল। আর ঠিক তাহাতেই সুরেশচন্দ্রের আপত্তি ছিল। তিনি বাড়ী, গাড়ী, অর্থ ও গর্ব্ব দেখিয়া মেয়ে দিতে একেবারেই অসম্মত ছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসার জন্য তিনি স্ত্রীর দৌর্ব্বল্যটুকু কখনও বিশেষ দোষের মনে করিতেন না—তাহা দৌর্ব্বল্যমাত্র, অপরাধ নহে, সুতরাং উপেক্ষার ও ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও বিচক্ষণ সুরেশচন্দ্র ক্ষমার যোগ্য বলিয়া যাহাকে উপেক্ষা করিতেন, তাহা যে অন্যরূপে অনিষ্ট উৎপাদন করিতেও পারে, তাহা বুঝিতে পারেন নাই। মাতার মনের ভাব যে কন্যায় সংক্রামিত হইতে পারে, সে সম্ভাবনা তিনি বিচার করিয়া দেখেন নাই।

আজ যখন স্ত্রী কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিবার চেষ্টা ত্যাগ করিয়া "হাল" ছাড়িয়া দিলেন, তখন সুরেশচন্দ্র মনে করিলেন, তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহাই হইল; এইবার তিনি আপনার মনোমত পাত্র দেখিয়া মালতীর বিবাহ দিতে পারিবেন।

আজ উপযুক্ত পাত্রের কথায় সঙ্গাপ্রসঙ্গেই অমলেন্দুকে তাঁহার মনে পড়িল। তাঁহার কথা মনে করিয়াই তিনি বিশাখাকে বলিলেন, "তুমি তিন বৎসর চেষ্টা করিলে, আমাকে না হয় তিন দিনের সময় দাও।"

বিশাখা স্বামীর এই কথায় ততটা আশ্বস্থাপন করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু স্বামী যে মেয়ের বিবাহ দিবার কথায় উৎসাহ দেখাইলেন, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, তিনি জানিতেন—স্বামী যে কাজে হাত দেন, সে কাজ কখনও ফেলিয়া রাখেন না। স্বামীর এত দিন উৎসাহের অভাব দেখাইবার কারণ বিশাখা কল্পনা করিতেও পারেন নাই—সুরেশচন্দ্রও এ বিষয়ে আপনার মত লইয়া কোনও দিন স্ত্রীর সহিত আলোচনা করেন নাই।

সাধারণ বাঙ্গালীর মেয়ে যেমন সংসারের সব ব্যবস্থা যেমন হয়, তেমনই লইয়া সন্তুষ্ট থাকিবার চেষ্টা করে—তাহাকে ভাঙ্গিয়া আপনার মনের মত করিয়া গড়িয়া লইবার শ্রম ব্যর্থ ও অনাবশ্যক বিবেচনা করে, এবং শেষকালে নিতান্তই অদৃষ্টবাদী হইয়া উঠে, বিশাখাও তেমনই ছিলেন। বিশেষ, সংসারে তাঁহাকে কোনরূপ ব্যথা বা বিঘ্ন ভোগ করিতে হয় নাই। সুরেশচন্দ্র যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে

পরিবারে সকলে আত্মনির্ভরশীল না হইলে চলে না—আপনার ক্ষমতায় সব বাধাবিঘ্ন দৃঢ়ভাবে অতিক্রম না করিলে সাফল্য করতলগত করা সম্ভব হয় না। বিশেষ, দরিদ্র ঘরে বিবাহ করিয়া সুরেশচন্দ্রের আত্ম-নির্ভরশীলতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুরেশচন্দ্রের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে শ্বশুরালয়ে তিনি যে স্নেহ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কেবল তাঁহার শাশুড়ীর স্নেহ ও সম্মানই আন্তরিক ও কৃত্রিমতা-শূন্য; আর সকলের স্নেহে দরিদ্রের প্রতি সদয় কৃপার ভাবটা ছিল। দিদি শাশুড়ী নাতজামাইকে খাওয়াই-বার সময় তাঁহাদের সব কষ্টের যে নজির দিতেন, তাহার মধ্যে কেহই "উপমান" ব্যতীত আর কিছুই নহেন। এমন কি, একদিন নাতজামাইয়ের আহারের অভাবের জন্য আক্ষেপ প্রকাশ করিতে করিতে তিনি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "তা দেখ দাদা, যে খাবার তোমার ভাল লাগে না সে খাবার খাওয়ানো কাজিয়া—দিয়া তোমাকে কেবল কষ্ট দেওয়া। তুমি যাহা খাইতে ভালবাস, বলিও, আমি তাহাই রাঁধিব।" তাহার পর তিনি বধূর উপর "ঠেস দিয়া" বলিয়াছিলেন, "মেয়েছেলে যে ঘরে পড়ে, সেই ঘরের মত অভ্যাস করে। বিশাখারও অভ্যাস হইয়া যাইবে।" অর্থাৎ বৌমা যখন মেয়েটাকে তোমার মত দরিদ্রের হাতেই দিয়াছেন, তখন তাহাকে "রাজভোগ" ছাড়িয়া "রাখালভোগই" অভ্যাস করিতে হইবে, শ্বশুর দুই একবার বলিয়াছিলেন, "দেখ, তোমার যখন যাহা দরকার হয়, আমাকে বলিও—লজ্জা করিও না।" কিন্তু জামাতা উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার কোনও অভাবই নাই।" কিন্তু তিনি তাঁহাকে যে আসবাব দিয়াছিলেন, তাহা যে তাঁহার গৃহেই ছিল, সে কথা তিনি একাধিকবার জামাতাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। সুরেশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "ও সব ত আমি চাই নাই। ও সব আমার অবস্থার উপযোগীও নহে। কাজেই আমাকে সাজে না।" ইহার পর শ্বশুরালয়ে জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিবার সময় সুরেশচন্দ্র একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীও ভাড়া করিয়া আইসেন নাই—হাঁটিয়াই আসিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কাহারও সাহায্য না লইয়া কেবল আপনার চেষ্টায় আপনি সব অর্জন করিবেন,। হইয়াছিলও তাহাই।

কিন্তু যাহারা আত্মমর্য্যাদায় আত্মনির্ভরশীল হয়, তাহারা সব বড় আঘাত আপনি সহ্য করিয়া আপনার আশ্রিত—অনুগত—স্নেহভাজনদিগকে আড়াল করিয়া রাখে। তাহারা তাহাদের স্নেহভাজনদিগকে কোন রূপে কষ্ট দিতে চাহে না। তাই সুরেশচন্দ্র স্ত্রীর মতপরিবর্তনের চেষ্টাই করিতেন, কিন্তু কখনও তাহার সঙ্গে মত লইয়া তর্ক করেন নাই।

বিশেষ, তাঁহার জানা ছিল, এ বিষয় লইয়া স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক করিলে তিনি স্ত্রীর মতপরিবর্তন করা-ইতে পারিবেন কি না, সন্দেহ, অথচ তর্কের ফলে পারিবারিক সম্বন্ধের শান্তিটুক নষ্ট হওয়া যাইতে পারে। অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া তুলিলে যদি আলোক পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ থাকে, অথচ গৃহদাহের আশঙ্কার কারণ থাকে, তবে ছাইচাপা আগুন ছাইচাপা রাখাই যে সুবুদ্ধির কাজ, বুদ্ধিমান্ সুরেশচন্দ্রের সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না। আবার তিনি এক দিকে যেমন স্বস্তি ও শান্তি ভালবাসিতেন, আর এক দিকে তেমনই স্ত্রীর মতপরিবর্তনের কোনরূপ প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। যাহাকে সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতে হয়, সে তাহার বিরলপ্রাপ্ত অবকাশকাল শান্তিতেই কাটাইতে চাহে—তাহাতেই সুখ পায়। তাই তিনি সর্ব্বপ্রযত্নে গৃহে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিতেন, এবং সে জন্য স্ত্রীর বিভিন্ন মত অনা-

গ্রামে উপেক্ষা করিতেন — তাহাকে আমলেই আনিতেন না। ইহাকে দৈন্য বা সাহসিকতা বলা যায় কি না সন্দেহ, কিন্তু এই কারণে কখনও সুরেশচন্দ্রের সংসারে ও দাম্পত্য সম্বন্ধে কখনও অশান্তির উদ্ভব হয় নাই। সুরেশচন্দ্র এই শান্তিতেই সুখে ছিলেন। বিশাখার বিশ্বাস ছিল, তিনি যেমনই "পাকা গৃহিণী" যে, তাঁহারই গুণে স্বামিস্ত্রীতে কখনও মতান্তর হয় নাই, নহিলে কোন্ সংসারে স্বামিস্ত্রীতে মতান্তর না হয়?

কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে যাহাই কেন হউক না, কন্যার বিবাহ বিষয়ে স্বামিস্ত্রীতে পূর্বাহ্নে মতের আলোচনা হইলে ভাল হইত। তাহা হইলে হয় ত মধ্য পথে উভয়ের মতের একটা সামঞ্জস্য হইত, এবং তদনুসারে কাজ হইলে কাজটা উভয়েরই মনোমতরূপে সম্পাদিত হইত। কিন্তু খাপের মধ্যে তরবারি থাকিলে যেমন তরবারের অধিকারী ব্যতীত আর কেহ তাহার স্বরূপ জানিতে পারে না, এবং তাহা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে হয়ত আহত হয়, — তেমনই বিশাখা স্বামীর মতের কিছুই জানিতে পারেন নাই, এবং শেষে তাহার ব্যবহারে কি ফল ফলিবে, তাহা অনুমান করিতেও পারেন নাই। সে কথার আলোচনা যথাস্থানে হইবে— ঘটনা ঘটিবার পূর্বে তাহার আলোচনা করা অসঙ্গত।

আজ যখন স্বামী সত্য সত্যই কন্যার বিবাহে উপেক্ষা ও ঔদাস্য পরিহার করিয়া, চেষ্টা করিবেন, বলিলেন, —তখন বিশাখার মনে হইল, তিনি পরাজিত হয়েন নাই, পরন্তু তিনিই জয়ী, কেন না, কন্যার বিবাহদান সম্বন্ধে এত দিনে স্বামীই তাহার মত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহার পরাজয়কে তিনি জয় বলিয়াই মনে করিলেন, কিন্তু যাহাকে তিনি জয় বলিয়া মনে করিলেন, তাহা যে প্রকৃতপক্ষে পরাজয়, এবং সে পরাজয়ের ফল তাঁহার পক্ষেই বেদনার কারণ হইবে, তাহা জয়গর্বোৎফুল্লা বিশাখা কল্পনাও করিতে পারিলেন না।

২

মালতীর বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রের কথায় সুরেশচন্দ্রের প্রথমেই যে অমলেন্দুকে মনে পড়িল, সে তাঁহার পরিচিত এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের পুত্র। পিতার সহিত সুরেশচন্দ্রের পরিচয় পশ্চিমে "হাওয়া খাইতে" যাইয়া। প্রথম পরিচয়েই সুরেশচন্দ্র তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ওকালতী ব্যবসায়ে সুরেশচন্দ্র ব্যবসায়ী লোকদিগের সহিত ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন — তাঁহাদের মধ্যে সরলতার ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দেখিতে পায়েন নাই। বোধ হয়, সেই জন্যই সরল সত্যনিষ্ঠ—ধর্মবিশ্বাসী অতুল বাবুকে সুরেশচন্দ্রের এত ভাল লাগিয়াছিল। অতুল বাবু সুরেশচন্দ্রেরই মত আপনার মতে দৃঢ় ও অবিচলিত হইলেও নির্বিরোধী ও অপরের মতে শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি আপনি ব্রাহ্ম, কিন্তু বোধ হয়, আপনার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা হেতুই স্বীয় প্রচলিত হিন্দুধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসে কোনরূপ বিরোধিভাব প্রকাশ করিতেন না। "কালাপাহাড়ে"র ভাব তাঁহার প্রকৃতিতে ছিল না। তাহার পত্নীর একটু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। জ্ঞাতিরা তাহা অধিকার করিয়া ভোগদখল করিতেছিলেন। নির্বিরোধী অতুলবাবু তাহার উদ্ধারচেষ্টাও করেন নাই। তিনি আপনার সামান্য আয়ে সংসার চালাইতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, বিশেষ, গৃহিণীর সুগৃহিণীপনা গুণে তিনি কখনও সংসারে কোনরূপ অভাব বা বিশৃঙ্খলা অনুভব করেন নাই। মামলা মোকদ্দমা করিয়া সম্পত্তি-উদ্ধারের ইচ্ছাই তাঁহার হয় নাই। উকীল সুরেশচন্দ্রের সহিত সে বিষয়ে এক দিন কথায় কথায় তাঁহার আলাপ হয়, এবং তাহার পর গৃহিণীর আগ্রহে তিনি সে বিষয়ে সুরেশচন্দ্রের মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। শেষে সুরেশচন্দ্র স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া চেষ্টা করিয়া সে সম্পত্তি উদ্ধার করিয়া দেন, এবং সেই সম্পত্তি

বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যায়, তাহাও সুরেশচন্দ্রের আফিসে খাটিতেছে। সেই সময় হইতে সুরেশ-চন্দ্রের সঙ্গে অতুলবাবুর ঘনিষ্ঠ পরিচয়—অতুলবাবুর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার পুত্র অমলেন্দু সকল বিষয়েই সুরেশচন্দ্রের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, এবং এইবার ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়া বাহির হইয়াছে।

সুরেশচন্দ্র কিছু দিন হইতেই অমলেন্দুকে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, এবং যতই লক্ষ্য করিতে-ছিলেন, ততই তাহার গুণে মুগ্ধ হইতেছিলেন।

বিশাখার সঙ্গে কথার পর তিনি গাড়ী আনিতে বলিলেন, এবং গাড়ী আসিলে অমলেন্দুর গৃহে গমন করিলেন। বাড়ীর জমী কেনা হইতে মিস্ত্রীর হিসাব মিটান পর্য্যন্ত সবই অতুলবাবু তাঁহার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া করিয়াছিলেন। এ দিকে অনেক দিন তিনি আর সে গৃহে আইসেন নাই—কারণ, অমলেন্দুই তাঁহার কাছে যাইত। আজ তিনি পরিচিত গৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিলেন—বাড়ীখানি তেমনই ছবির মত সুন্দর, পরিচ্ছন্ন। গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, সর্ব্বত্র পরিচ্ছন্নতা—ছোট উঠানে টবে গাছে ফুল ফুটিয়াছে—বারান্দায় খাঁচায় পাখীরা ডাকিতেছে, চন্দ্রপুটে পাবক পরিস্নুত করিতেছে, গামলার জলে স্নান করিতেছে।

অমলেন্দু গৃহে ছিল। আসিয়া প্রণাম করিয়া সুরেশচন্দ্রকে বসিবার ঘরে লইয়া গেল।

সে ভবিষ্যতে কি করিবে, সে বিষয়েও সে সুরেশচন্দ্রেরই পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল—অস্ত্রাদি, যন্ত্র প্রভৃতি কিনিয়া পসারের জন্য বসিয়া ছিল। সেই সকল কথার আলোচনার পর সুরেশচন্দ্র বলিলেন, "তোমার মা বাড়ীতে আছেন ?"

অমলেন্দু বলিল, "হাঁ। তিনি ত প্রায় কোথাও যায়েন না।"

"আমি একবার তাঁহার সঙ্গে দেখা করিব।"

অমলেন্দু উপরে গেল, এবং আসিয়া বলিল, "চলুন।"

যখন তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধারচেষ্টা হয়, সেই সময় হইতেই অতুলবাবুর স্ত্রী সুরেশচন্দ্রের সম্মুখে "কত্তকটা" বাহির হইতেন—হয় ত দ্বারের অন্তরালে থাকিতেন, কিন্তু কথা কহিতেন। কারণ, নির্ব্বিরোধী অতুলবাবু তাঁহাকেই তাঁহার সম্পত্তির সব কথা উকীলকে বুঝাইয়া দিতে বলিতেন। আজ অমলেন্দুর সঙ্গে সুরেশচন্দ্র উপরে উঠিয়া অতুল বাবুর বসিবার ঘরে বসিলেন। অমলেন্দু নিয়তবে বসিত—এ ঘর তাহার মা সর্ব্বদা ঝাড়িয়া মুছিয়া যেন মন্দিরের মত যত্নে রাখিতেন। কক্ষ-প্রাচীরে ভক্তিমূলক চিত্র—একটি আলমারীতে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ।

অমলেন্দু বলিল, "মা, পাশের ঘরে—দ্বারের পাশে আছেন।"

সুরেশচন্দ্র সেই দিকে ফিরিয়া বলিলেন,"অমলের পড়া ত শেষ হইল। এবার ছেলের বিবাহ দিবেন ত ?"

অমলেন্দুর মাতা বলিলেন, "আমি এখনই দিতে চাহি ; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ—কে আমার হইয়া চেষ্টা করে ?"

"আপনি যদি দিতে চাহেন, তবে সে ব্যবস্থা হয়।"

"আমি ত অমলকে বলি, তুই বিবাহ কর।—তোর যদি ব্রাহ্মবিবাহ করিতেই ইচ্ছা হয়, তাহাই কর। আমি আর কয় দিন ? যাহাতে তোর সুখ, তাহাতেই আমার তৃপ্তি।"

"আপনি যাহার সেবা শুশ্রূষা লইতে পারিবেন না, তেমন মেয়েকেই বা অমল বিবাহ করিবে কেন? আপনার যেমন অমলই সম্বল—উহারও ত তেমনই আপনিই সম্বল।"

"ও ত তাহাই বলে। আপনি কর্তার বন্ধু—আমাদের যে কত উপকার করিয়াছেন, বলিয়া শেষ করা যায় না। বিশেষ, কর্তার শেষ অসুখের সময় হইতে আপনার সাহায্য না পাইলে আমরা ভাসিয়া যাইতাম।"

সুরেশচন্দ্র বাধা দিয়া বলিলেন, "ও সব কথা বলিবেন না। যদি মেয়ে দেখেন, তবে একবার আমার মেয়েটিকে দেখুন।"

"সে ত আমার পরম ভাগ্যের কথা।"

"ভাগ্য আপনার নহে—যদি সত্য সত্যই সৌভাগ্য থাকে, তবেই মালতী আপনার ঘরে আসিতে পারিবে। কিন্তু আমার একটি কথা। যদি এ সম্বন্ধে আপনার বা অমলের কিছুমাত্র আপত্তি থাকে, বা অসুবিধা হয়, তবে আপনি আমাকে তাহা জানাইবেন। নহিলে আমি বড় রাগ করিব। মালতী আমার মেয়ে; কিন্তু কন্যার জন্য আমি যেন অমলের প্রতি আমার কর্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হই।"

অমল পাশেই দাঁড়াইয়া ছিল। মুখ নত করিয়া ছিল। সুরেশচন্দ্র তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন, "অমল যেন সব ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া উত্তর দেয়। আমার তাড়াতাড়ি নাই। আমি পরে সংবাদ লইব। কিন্তু দেখিবেন, যেন আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য আপনাদের সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করিতে বিরত হইবেন না। সে কথাটা যেন মনে থাকে।"

তাহার পর সুরেশচন্দ্র বিদায় লইলেন।

অমল তাঁহাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলে মা বলিলেন, "শুনিলি ত, অমল! সুরেশবাবুকে কি কখন 'না' বলা যায়?"

অমল উত্তর দিল না দেখিয়া মা বলিলেন, "তবে, তুই ভাবিয়া দেখ্। তুই যাহা ভাল বুঝিবি, তাহাই হইবে।"

৩

এত দিন মা মধ্যে মধ্যে বিবাহের কথা বলিতেন বটে, কিন্তু অমল সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিত। আজ ব্যাপারটা যেরূপ দাঁড়াইল, তাহাতে হাঁ—না—একটা স্থির না করিয়া উপায় নাই। যতক্ষণ পথ সোজা থাকে, ততক্ষণ চলিয়া পথিক যখন তেমাথায় আইসে, তখন তাহাকে আবার কোন্ পথ লইতে হইবে, স্থির করিতে হয়। আর কেহ এ প্রস্তাব করিলেও না হয় "না-তা" একটা জবাব দিয়া দেওয়া চলিত। কিন্তু সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে ত সে ব্যবহার করা যায় না! তিনি অতুল বাবুর অবলম্বন ছিলেন, অমলের অভিভাবক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অমল তাঁহার কাছে নানা উপকারের জন্য কৃতজ্ঞ—বিশেষ, স্নেহের ঋণে বদ্ধ। সে বিবাহে অমত জানাইতে পারে—কিন্তু তিনি হয় ত দুঃখিত হইবেন; বিশেষ, সে কি কারণ দেখাইয়া অমত জানাইবে? মালতীকে সে দেখিয়াছে, অপছন্দ করিবার কারণ দেখান চলিবে না; অন্য সব হিসাবে এ সম্বন্ধ বাঞ্ছনীয়, তাহার পক্ষে প্রলোভনীয়। তবে?

রাত্রিতে অমল তাহাই ভাবিতে লাগিল। কিন্তু এত ভাবনার মূলে কি ছিল, তাহা ত কাহাকেও বলা যায় না! অতুল বাবু ও রতন বাবু—বহুদিনের বন্ধু; উভয়ে একই সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন

হিন্দু-সমাজের বন্ধন শিথিল হয় নাই ; কাজেই ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা উৎপন্ন হইত। সেই হিসাবে দুই বন্ধুতে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল—দুই পরিবারেও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। কিন্তু রতনবাবুর স্ত্রী যদিও স্বামীর ধর্ম্ম বিনা বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন, অতুলবাবুর স্ত্রী তাহা করেন নাই। সে জন্য রতনবাবুও সময় সময় অতুলবাবুর কাছে অনুযোগ করিতেন ; কিন্তু অতুলবাবু বলিতেন, জোর করিয়া কাহাকেও ধর্ম্মবিশ্বাস পরিবর্ত্তন করাইলে তাহাতে কি সুফল ফলে ? ধর্ম্ম ত হৃদয়ের জিনিস—বাহিরের অর্থাৎ উপাসনা-মন্দিরের নহে। যত দিন উভয়ের অবস্থায় বিশেষ প্রভেদ ছিল না, তত দিন বন্ধুত্বও অক্ষুণ্ণ ছিল, এবং অমল রতনবাবুর কন্যা মনীষার সঙ্গে বাল্যকালাবধি খেলা করিয়া আসিয়াছে। শেষে খেলা করিতে করিতে কখন্ যে তাহারা পরস্পরের মন লইয়া খেলা করিয়াছিল, তাহা প্রথমে তাহারাও জানিতে পারে নাই—শেষে বুঝিয়াছিল। উভয়েরই পিতামাতা তাহাদের ঘনিষ্ঠতায় কোনরূপ আপত্তি করেন নাই ; তাহার কারণ, রতনবাবু মনে করিতেন, অমলের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিতে পারিলে তিনি তাহা ভাগ্য বলিয়া মনে করিবেন ; এবং অতুলবাবু মনে করিতেন, যে মনীষাকে তিনি কোলে করিয়াছেন, তাহাকে বধূ করিয়া আনিতে পারিলে তিনি কন্যার অভাব আর অনুভব করিবেন না।

কিন্তু তাহার পর উভয়ের অবস্থার একটু বৈষম্য ঘটে। রতন বাবু গিরিডির কাছে একটা অভ্রের খনি নামমাত্র দামে কিনিয়া তাহাতে কাজ আরম্ভ করেন, এবং প্রচুর লাভ করিতে থাকেন। তাঁহার দুই ছেলে বিলাতে যাইয়া—এক জন ব্যারিষ্টার ও এক জন সিভিলিয়ান হইয়া আইসেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে "জাতিভেদ" নাই বটে, কিন্তু অর্থের হিসাবে ভেদ আছে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে যেমন মহাযান ও হীনযান, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তেমনই দুই ভাগ—এক ভাগ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের দক্ষিণে "সাহেবপাড়া"র বাসন্দা, এক ভাগ উত্তরাংশের বাসন্দা। রতন বাবুর ছেলেরা যখন বিলাতে যায়, মেয়েরা বেথুন কলেজ ছাড়িয়া লরেটোয় ভর্ত্তি হয়—তখন তিনিও পূর্ব্ববাস ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মতলাষ্ট্রীটের দক্ষিণে গিয়াছিলেন। অমলকে মেয়ে দেওয়া তিনি তখন আর ভাল বলিয়া মনে করিতেছিলেন না। কিন্তু দুই কারণে সে সম্বন্ধে আপত্তিও করেন নাই—প্রথম, অমলকে তিনিও ত খরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইতে পারেন ; দ্বিতীয়, এত দিনের ঘনিষ্ঠতায় চক্ষুলজ্জা।

অতুল বাবুর মৃত্যুতে সেই দুই কারণই দূর হইয়া গেল। প্রথম, চক্ষুলজ্জার আর কারণ রহিল না। দ্বিতীয়, অমল যে বিধবা মাকে একা রাখিয়া বিলাতে যাইবে না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। সুতরাং রতন বাবুও অমলের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে আর আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না ; পরন্তু সে যাহাতে আর সে কথা মনেও না করে—এমন ব্যবহার করিতে লাগিলেন। অতুল বাবুর সঙ্গে তাঁহার ভাবান্তর অতুল বাবু লক্ষ্য করেন নাই বটে, কিন্তু অমল করিয়াছিল। এখন আপনার প্রতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য সে বেশ বুঝিল, এবং বুঝিয়া তদনুসারে কাজ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সেও যে মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিতে অনিচ্ছুক ছিল, মার প্রতি তাহার কর্ত্তব্যে কিছুমাত্র অবহেলা করিতে অসম্মত ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিশেষ, যে পিতা কন্যার মনোগত অভিপ্রায়কে আপনার গর্ব্বের জন্য পদদলিত করিতে প্রস্তুত, তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধেই বা সে কেন আগ্রহ করিবে ? মনীষাও পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইতে প্রস্তুত ছিল না, এবং অমলের ভাবপরিবর্ত্তনে সে মনে করিল, সে যদি তাহাকে ভাল না বাসে, তবে সে-ই বা কেন ভালবাসা ভিক্ষা করিতে যাইবে ? কি লজ্জা ! কিন্তু এই চিন্তার উদ্ভব যে অভিমানে, এবং ভালবাসা

প্রগাঢ়তা প্রাপ্ত না হইলে যে তাহাতে অভিমান উৎপন্ন হয় না, তাহা কিশোরী মনীষা বুঝিতে পারে নাই। কারণ, সে অমলকে যতই কেন ভালবাসুক না, তাহার সংস্কার ছিল—প্রেম পরিণয় ব্যতীত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না—পরিণয় ছাড়া প্রেম প্রেমপদবাচ্যই নহে।

অমল স্থির বুঝিয়াছিল, মনীষার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইবে না; সে বিবাহের কল্পনা কখনই কল্পনা-রাজ্য হইতে বাস্তবে উপনীত হইবে না, এবং তাহার হৃদয়পটে সে আশার ছবি অল্পদিনেই মিলাইয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবে। সে সে কথার আর বড় আলোচনাও করে নাই। কিন্তু এতদিন বিবাহের কথাও কখনও এমন ভাবে হয় নাই। মা সময় সময় সে প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছে।

আজ যখন কর্ত্তব্য স্থির করিবার সময় উপনীত হইল, তখন অমল বুঝিল—সে স্মৃতি বিস্মৃতির প্রলেপে অদৃশ্য হয় নাই। বিনিদ্র হইয়া সে যতই ভাবিতে লাগিল, ততই কত দিনের কত কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সে আপনার দৌর্ব্বল্যে আপনি লজ্জিত হইতে লাগিল এবং শেষে সেই দৌর্ব্বল্য জয় করিবার জন্যই স্থির করিল—সে বিবাহ করিবে। সে এই সঙ্কল্পের অনুকূল কয়টি যুক্তিও আপনার কাছে আপনি উপস্থিত করিল—মার প্রতি তাহার কর্ত্তব্যই জীবনে তাহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য; সে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করিলে মার সেবাশুশ্রূষা, কোনরূপ সাহায্য হইবে না। আবার এই বিবাহে যদি সুরেশ বাবুর কাছে তাহার কৃতজ্ঞতার ঋণভার একটুও লঘু হয়—সেও ভাল; তিনি যে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে কেবলই তাহাদের উপকার করিয়া আসিয়াছেন! এই সব যুক্তির মূলে রতন বাবুর ব্যবহারে আহত আত্মসম্মানের জন্য যে অভিমান ছিল, তাহা সে তখনও বুঝিতে পারিল না।

সে যাহাই হউক, সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে অনিশ্চয়ের চাঞ্চল্য হইতে অব্যাহতি লাভ করিল, এবং শেষ-রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুরেশ বাবু আসিলে কি বলিব—কিছু ঠিক করিলি?"

অমল উত্তর দিল, "দেখ মা, সুরেশ বাবুর অনুরোধ বা অভিপ্রায় আমাদের পক্ষে আদেশ।"

মার মুখে আনন্দদীপ্তি দেখা দিল—"তবে মেয়ে দেখিবার কি হইবে?"

অমল হাসিয়া বলিল, "মেয়ে কি আবার দেখিতে হইবে? তুমিও দেখিয়াছ—আমিও দেখিয়াছি; অনেকবারই ত দেখা হইয়াছে। এখানে যে মেয়ে ভালমন্দের কথাই উঠিতে পারে না মা।"

"কিন্তু দিব্য মেয়ে বাবা।"

বুধবারে আদালত হইতে ফিরিবার পথে সুরেশ বাবু একবার অমলের বাড়ীতে আসিলেন। অমলের মা তখন বলিলেন, তিনি মালতীর সঙ্গেই অমলের বিবাহ দিবেন।

৪

রাত্রিকালে সুরেশচন্দ্র আহারে বসিলে বিশাখা বলিলেন, "তিন দিন ত হইয়া গেল। মেয়ের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন?"

তিনি যে উত্তর পাইবেন, তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। সুরেশচন্দ্র সেই উত্তর দিলেন, "সব ঠিক।"

বিশাখা ভাবিলেন, স্বামী বিদ্রূপ করিতেছেন; তিনিও ঠাট্টার সুরে বলিলেন, "কোথায়?"

"অমলেন্দুর সঙ্গে।"

বিস্মিতভাবে বিশাখা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ?"

স্থিরভাবে স্থরেশচন্দ্র বলিলেন, "অতুল বাবুর ছেলে—ডাক্তার।"

বিশাখার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ; তিনি কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন —"এই—সম্বন্ধ !!"

"হাঁ।"

"মেয়েটাকে তা'র চেয়ে হাত-পা বাঁধিয়া জলে ফেলিয়া দাও না কেন ?"

"কেন ?'

"এ ছেলের কি আছে ?"

"কি নাই ? তোমার বাবা যখন আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়াছিলেন, তখন আমার যাহা ছিল—অমলের তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী আছে—টাকায়ও বটে—বিত্তায়ও বটে।"

সে বিবাহ যে তাঁহার মাতার একান্ত জিদেই হইয়াছিল, এবং তাহাতে বাড়ীর আর সকলেরই আপত্তি ছিল, সে কথা বিশাখার মনে হইল। কিন্তু এ পৃথিবীতে যাহা মনে হয়, সব সময় তাহাই বলা চলে না। তাই বিশাখা সে কথা না বলিয়া বলিলেন, "আমি ওখানে মেয়ের বিবাহ দিব না।"

স্থরেশচন্দ্র বলিলেন, "আমি এখানেই মেয়ের বিবাহ স্থির করিয়া আসিয়াছি।"

তাহার পর বিশাখার জিদ—অশ্রু—কিছুতেই স্থরেশচন্দ্র বিচলিত হইলেন না। বিশাখা এ বিষয়ে একটু অস্থবিধায়ও পড়িলেন—তিনি তাঁহার মাতার কাছে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি পাইলেন না। কারণ, এ বিষয়ে মার মতে ও তাঁহার মতে ঐক্য ছিল।

স্থরেশচন্দ্র স্ত্রীর কোনও কথায় কান না দিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন—কেবল যে যে কথাটা বিশাখাকে জানান প্রয়োজন মনে করিলেন, তাহাই জানাইতে লাগিলেন।

বিশাখা যখন দেখিলেন, তাঁহার কথা কিছুতেই থাকিল না—তখন অগত্যা কন্যার বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে সে অপ্রসন্নচিত্তে ও অনিচ্ছায়। তিনি পাত্রের অযোগ্যতা সম্বন্ধে যে সব কথা বলিলেন, তাহা স্বামীকে শুনাইয়াই বলিলেন ; স্থতরাং তাহা যে মালতীর কর্ণগোচর হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। আসল কথা, বিশাখা বরাবরই স্বামীর কোমল ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন. তাই আজ এই দৃঢ়তায় কেবল যে বিস্মিত হইলেন, তাহা নহে—পরন্তু মর্মাহত হইলেন, এবং সেই আঘাতবেদনায় আপনার কাজের পরিণামও চিন্তা করিলেন না। "সোমথ" মেয়ের সম্মুখে জামাইয়ের সম্বন্ধে অমন কথা বলায় তাঁহার মাতা তাঁহাকে তিরস্কার করিলে, তিনি তাঁহার কথায় এমন উত্তর দিলেন যে, সেই উত্তরের ফলে তিনি মালতীর বিবাহের দিন "যৌতুক করিতে" আসা ছাড়া আর সে বাড়ীতে আসিলেন না।

এই বিবাহে স্থরেশচন্দ্রের ও মালতীর মধ্যে ভাব কিরূপ দাঁড়াইল, তাহা না বলিলেও চলে।

৫

অমলের বিবাহে দুই দিকে অসন্তোষের বিকাশ হইল—অতুল বাবুর ব্রাহ্মবন্ধুরা অসন্তুষ্ট হইলেন—কতকগুলি ব্রাহ্ম পরিবারে অমলের আর আদর রহিল না, আর অসন্তুষ্ট হইলেন বিশাখা।

রতন বাবুর এক পুত্র একদিন এক রোগীর বাড়ীতেই অমলকে বলিল, "কিহে, অমল—শেষে হিন্দু-মতেই বিবাহ করিলে ?" অমল একটু বিচলিত হইয়া উত্তর দিল, "ব্রাহ্মরা ত আমার মত পাত্রকে

কন্যাদানের উপযুক্ত বিবেচনা করেন না।" রতন বাবুর পুত্র সেই কথা বাড়ীতে যাইয়া বলিলে, রতন বাবু বলিলেন, "তুমি কেন বলিলে না—যাহারা ধর্ম্মমতেও দৃঢ় থাকিতে পারে না, তাহারা শ্রদ্ধার উপযুক্ত নহে।" মনীষা তখন সে স্থানে ছিল। সে কিন্তু সে ভাবে কথাটা বুঝিতে পারিল না। সে অমলের উত্তরে তাহার প্রতি তাহার পিতার ব্যবহারে দারুণ অভিমানই বুঝিতে পারিল। কিন্তু পুরুষ কি অভিমানকে ভালবাসার অপেক্ষা উচ্চাসনে স্থান দেয়? কেন? সে কিছুতেই অমলের উপর রাগ করিতে পারিল না—তাহার জন্য করুণায় মনীষার নারীহৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে কেবল ভাবিতে লাগিল—যদি হতাশার বেদনা জুড়াইবার আশায় অমল বিবাহ করিয়া থাকে, তবে তাহার সে আশা পুরিবে কি? সেই দিন হইতে মনীষার মনের ভাব ও চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হইল।

বিশাখা জামাতার প্রতি যে ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাহাতে সুরেশচন্দ্রের অবিচলিত ধৈর্য্যও বিচলিত হইতে লাগিল। তিনি পারিবারিক সুখের আশায় বিশাখার অনেক দৌর্ব্বল্য লক্ষ্যই করিতেন না। কিন্তু এবারে তিনি আর তাহা করিতে পারিলেন না। অমল পূর্ব্বেরই মত নানা কাজে শ্বশুরালয়ে আসিত। তখন সুরেশচন্দ্রই তাহাকে আদর-যত্ন করিতেন। বাস্তবিক তিনি যেন বিশাখার ত্রুটী পূরণ করিবার জন্যই জামাতাকে অধিক আদর করিতেন। কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিতেন না, তাঁহার আন্তরিক আদরের আতিশয্যের পার্শ্বে বিশাখার ব্যবহার অতুলের কাছে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইত।

ছয় মাস পরে মালতী যখন স্বামীর ঘর করিতে গেল, তখন মা'র অপ্রসন্নভাব তাহার হৃদয়ও রঞ্জিত করিয়াছে।

তাহার শ্বশুরবাড়ী যে কোনরূপেই তাহার উপযুক্ত হয় নাই, এই দৃঢ় বিশ্বাস লইয়াই সে তথায় গেল—এ অবস্থায় কি কেহ সুখ পাইতে পারে?

মালতীর এই ভাব অমল লক্ষ্য করিত। কিন্তু তাহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা অত্যন্ত প্রবল ছিল। সে সর্ব্বদাই মনে করিত, যাহার যাহা কর্ত্তব্য, সে তাহা করিবে—পরের কাজে কখনও আপনার কর্ত্তব্য পরিবর্ত্তিত হয় না।

বিশাখা কন্যার বিবাহে যত আপত্তিই কেন করিয়া থাকুন না, তিনি মেয়ের মা। শেষে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী যাইলে তাঁহাকে অনিচ্ছাতেও মেয়ের বাড়ী যাইতে হইল। সে বাড়ীতে যাইয়া তিনি এক দিন অমলের বসিবার ঘরে কতকগুলি ছবির মধ্যে এক জন কিশোরীর ফটোগ্রাফ লক্ষ্য করিয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কাহার ছবি, মালতী?" মালতী বলিল, "আমি ত জানি না।" মা বলিলেন, "সে কি রে, খোঁজও লইস্ নাই?" তিনি বাড়ীর পুরাতন ঝিকে জেরা করিয়া জানিলেন, সে মনীষার ছবি—অতুলবাবু বাঁচিয়া থাকিতে এই মনীষার সঙ্গেই অমলের বিবাহ একরূপ স্থির হইয়াছিল। ঝি বলিল, "তার পর কর্ত্তাবাবু মারা গেলেন। কি হ'ল জানি না, মা। সম্বন্ধের কথা আর শুনা গেল না। তার পর —ভগবান্ যা করেন, ভালই করেন, বৌদিদির সঙ্গে দাদাবাবুর বিয়ে হল। তাই ত ভাবি, মা, যদি ঐ ব্রাহ্ম মেয়ে ঘরে আন্ত, তবে মা, আমার কি হ'ত? তবে মেয়েটি রূপেও যেমন, গুণেও তেমনই, যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। দোষের মধ্যে— পায়ে জুতা দেয়—ঘোমটা দেয় না।" মা মালতীকে একা পাইয়া

বলিলেন, "আমার যেমন পোড়াকপাল! নইলে তাহারই বা এমন মতিগতি হইবে কেন? তুইও কি এমন হাবা মেয়ে! এ সব কোনও সন্ধান রাখিস্ না?" মালতী কোনও কথা বলিল না। বিশাখা বলিলেন, "উহারা ব্রাহ্ম—ওদের ছেলেমেয়ে সাহেব-বিবির মত মেশে। কি জানি, বাছা, অদৃষ্টে কি আছে!" তাহার ভাব দেখিয়া মালতীর ভয় হইল। বিশাখার বিশ্বাস ছিল, পুরুষদিগকে "চোকে চোকে রাখিতে হয়—নহিলেই সর্ব্বনাশ! কিন্তু তিনি যতই কেন সন্দিগ্ধ হউন না, সুরেশচন্দ্রের ব্যবহারে কখনও সে সন্দেহ তীব্র করিবার অবসর পান নাই। আজ তিনি মেয়ের মনে সন্দেহের বিষ ঢালিয়া দিয়া গেলেন।

মালতী সেই দিনই অমলকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার বসিবার ঘরে যে মেয়ের ছবি আছে, এ কে?"

অমল উত্তর দিল, "উহার নাম মনীষা। বাবার বন্ধু রতন বাবুর মেয়ে।"

"তোমার সঙ্গে কি উহার বিবাহের কথা হইয়াছিল?"

"হাঁ।"

মালতী একটু টানিয়া বলিল—"ওঃ—তা—ই।"

অমল ঠাট্টা করিয়া বলিলেন, "কেন—কি?"

মালতী জিজ্ঞাসা করিল, "মনীষার কাছে তোমার ছবি আছে?"

অমল সরলভাবে উত্তর দিল, "ছিল। এখন আছে কি না, জানি না। অনেক দিন তাহাদের বাড়ী যাই নাই।"

"কেন?"

"আমি হিন্দুমতে বিবাহ করায় ব্রাহ্মরা রাগ করিয়াছেন।"

"কেন, তোমার কি 'জাতি' গিয়াছে?"

"রকমটা সেইরূপই বটে।"

"তা, তোমরাও ত ব্রাহ্ম—তোমার মনীষাকেই বিবাহ করিলে না কেন?"

এই "কেন"র উত্তর সে কি দিবে? সব কথা কি বলা যায়—সব কথা কি বলা সঙ্গত হইবে? কাজেই অমল চুপ করিয়া রহিল।

মালতী বলিল, "যাহাকে এত ভালবাস, তাহাকে ছাড়িয়া অন্যকে কি বিবাহ করিতে আছে? সেও আবার বিবাহ করিয়াছে ত?"

কথাটা অমলের ভাল লাগিল না। সে কেবল বলিল, "কই, শুনি নাই ত!"

"তা সেও তোমার জন্য বসিয়া থাকিবে কি?"

তাহার পর মালতী যে সব কথা বলিতে লাগিল, সে সব অমল ভাল করিয়া শুনিতে পারিল না।

সেই দিন হইতে মালতী যখন তখন মনীষার কথা তুলিয়া অমলকে "খোঁটা" দিতে লাগিল, এবং অকারণ সন্দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আর মালতীর এই ব্যবহারে অমলের মনে, যে জীবনের যে স্বপ্ন সফল হয় নাই, এক একবার সে স্বপ্নের কথা উদিত হইত না—এমনও বলিতে পারি না। এই

সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। চারি দিনের জ্বরে অমলের মাতার হৃদ্দৌর্ব্বল্য, হৃদয়ের স্পন্দন থামিয়া গেল। মাতৃহীন অমল যে কর্ত্তব্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল মনে করিয়া কাজ করিতেছিল, তাহার অবসান হইল।

তখন মালতী সন্তান-সম্ভাবিতা। খাশুড়ীর শ্রাদ্ধের পর সে বাপের বাড়ী গেল; কেবলই মা'র কাছে শুনিতে লাগিল, "তাই ত, বাছা—বাড়ীতে জামাই একা; মাও নাই। আমার ত ভয় করে। সে দিন ঘরে সেই মেয়েটির ছবি দেখিয়া অবধি আমার ত চক্ষুতে ঘুম নাই।"

তাহার পর তিন মাসের কন্যা সলিলাকে লইয়া মালতী যখন শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল, তখন সে স্বামীর উপর সন্দেহে বুকটি ভরিয়া আনিল। সে সন্দেহের দংশনে অমলের দাম্পত্য জীবন যাতনাময় হইয়া উঠিল। অমল না পারিয়া এক দিন বলিল, "দেখ, যদি কোন দিন তোমার প্রতি কর্ত্তব্যচ্যুত হই—তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা দিতে পারিলাম না, বুঝি,—তবে সে কথা আমিই তোমাকে বলিব। ছলনার পাপে দাম্পত্য-জীবন কলঙ্কিত করিব না।" তাহার আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় তাহার এমনই বিশ্বাস ছিল। সে তখনও আশা করিতেছিল, মালতীর ভালবাসায় সে শান্তি পাইবে—মনীষার স্মৃতিও কালে লুপ্ত হইয়া যাইবে। মনীষা ত তাহার পক্ষে চক্রবালেরই মত হইয়াছে। কিছু দিনে সেও অবশ্য বিবাহ করিয়া অতীত স্মৃতি বিস্মৃত হইবে।

কিন্তু মালতীর ব্যবহারে সে শান্তি না পাইয়া যাতনাই ভোগ করিতে লাগিল। আর সেই ব্যবহারের আলোকে মনীষার স্মৃতি লুপ্ত না হইয়া যেন উজ্জ্বলই প্রতিভাত হইতে লাগিল।

তবে ব্যবসায়ে তাহার পসার বাড়িতে লাগিল, এবং তাহাতে তাহার অনেকটা সময় কাটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেও আবার এক নূতন উপসর্গ উপস্থিত হইল। সকালে—সন্ধ্যায় রোগী দেখিয়া তাহার ফিরিতে বিলম্ব হইলেই মালতীর মনে সন্দেহ হইত—সে কোনও ব্রাহ্ম বন্ধুর গৃহে গিয়াছিল।—সেখানে মনীষা ছিল না ত? প্রশ্নের পর প্রশ্নে সে অমলকে উন্মত্ত করিয়া তুলিত। শেষে তাহার কথায় অমলেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইত। শেষে অমলের মনে হইত, সে যেন আর কর্ত্তব্যের ভার বহন করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সে ভাবিত—এখন উপায় কি

৬

উলুবেড়িয়ায় একটি ব্রাহ্মপল্লী আছে। তথায় যাঁহাদের বাস, তাঁহাদের মধ্যে কয় জনের সঙ্গে অতুল বাবুর ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং তাঁহারা কেহ কেহ অমলের সঙ্গে সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই। তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাঁহারা ধনী নহেন—ধনীর গর্ব্ব তাঁহাদের ছিল না। মনীষার মাসীমা তথায় বাস করিতেন। তাঁহার অসুখের সংবাদ পাইয়া অমল সে দিন তথায় গিয়াছিল। যাইয়া দেখিল, মনীষাও তথায় গিয়াছে। মাসীমা অমলকে দেখিয়া বলিলেন, "বাঁচাইলে বাবা; আমি কেবল ভাবিতেছিলাম, মনীষা কাহার সঙ্গে বাড়ী যাইবে। আমি বাছা, আজকালকার ও মেয়েদের একা যাতায়াত ভালবাসি না—একটা বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ?"

রোগীকে দেখিয়া—স্থানীয় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অমল কলিকাতায় ফিরিবার জন্য যাত্রা করিল। মাসীমা'র কথায় মনীষা তাহার সঙ্গে চলিল।

তাহারা সে দিনের শেষ ষ্টীমারে কলিকাতায় ফিরিতেছিল। শীতের স্বল্পায়ু দিন তখন শেষ হইয়া

আসিতেছে। দুই জনে পাশাপাশি দুইখানি কেদারা টানিয়া বসিল—নদীর শোভা, দিনান্ত-আকাশের শোভা দেখিতে লাগিল। মনীষাই প্রথমে অমলের ঘর সংসারের কথা তুলিল। অমল সরলভাবে উত্তর দিতে লাগিল। সে যত উত্তর দিতে লাগিল, মনীষা ততই বিস্মিত হইতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল, অমল কত সুখী হইয়াছে—তাহার কথায় সে সেই সুখের বিকাশ বুঝিতে পারিবে। কিন্তু তাহা ত নহে। অমলের কথায় সে বুঝিল—সে বড় দুঃখী—বড় আশায় হতাশ হইয়াছে। এ কি?

শেষে অমল জিজ্ঞাসা করিল, "মনীষা, তুমি আজও বিবাহ করিলে না কেন? সুখী হইতে পারিতে।"

মনীষা কোমল দৃষ্টিতে অমলের মুখে চাহিল—জিজ্ঞাসা করিল, "অমল, তুমি কি সুখী হইয়াছ?"

মনীষার নয়নে যে অশ্রু উথলিয়া উঠিতেছিল, তাহা গণ্ড বহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

মুহূর্তে যেন কালের ও অবস্থার সব ব্যবধান মুছিয়া গেল। কেদারার হাতার উপর মনীষার একখানি হাত শিথিলভাবে ন্যস্ত ছিল। অমল সেই হাতখানি আপনার হাতে তুলিয়া লইল—শুধু বলিল, "মনীষা!"

সেই আহ্বানে হৃদয়ের কত কথা—কত রুদ্ধ ব্যথা প্রকাশিত হইল!

তাহার পর উভয়েই ভাবিল—এ কি করিলাম! তাহারা হাত সরাইয়া লইল। অবশিষ্ট পথ কেহ আর কোনও কথা কহিল না।

ষ্টীমার কলিকাতায় পৌঁছিল। তাহারা নামিয়া দেখিল, মনীষার গাড়ী আইসে নাই। কাজেই অমল তাহাকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিতে বাধ্য হইল। সমস্ত পথ উভয়ে নির্ব্বাক্।

গৃহদ্বারে মনীষা যখন গাড়ী হইতে নামিল, তখন অমল বলিল, "মনীষা, আমাকে ক্ষমা করিও।"

মনীষা কোনও কথা বলিতে পারিল না, কেবল একবার অমলের মুখে চাহিল। দ্বারের আলোকে অমল দেখিল, তাহার নয়নে অশ্রু।

৭

অমলের শরীরে ও মনে যেন আগুন জ্বলিতেছিল। সে আজ কি বলিয়া মালতীর কাছে মুখ দেখাইবে? সে মনে করিয়াছিল, ভুলিতে পারিবে; কিন্তু যখন পারিল না—তখন? আর মনীষার হৃদয়, সে ত আজ আপনার হৃদয়েই দেখিতে পাইয়াছে। মানুষের হৃদয় দুর্ব্বল—তাহাকে কি বিশ্বাস করিতে আছে?

সে যত ভাবিতে লাগিল, তত ভাবনা বাড়িতে লাগিল। কয়টি রোগী দেখিবার কথা ছিল। দুই স্থানে যাইয়াই সে বুঝিল—সে আর রোগীর অবস্থায় মন দিতে পারিতেছে না। সে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সে যে মনীষার মাসীকে দেখিতে গিয়াছিল, তাহাতেও মালতী মনে করিয়াছিল—মনীষার মাসী বলিয়াই সে উলুবেড়িয়ায় গিয়াছিল। কাজেই সে সেই কথাটার উপর জোর দিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"মনীষার মাসীকে দেখিয়া আসিলে?"

অমল কেবল বলিল, "হঁা।"

"মনীষা যায় নাই?"

নিধুবাবুর টপ্পা

চিত্রকর শ্রীযুত বীরেশ্বর সেনের সৌজন্যে

"গিয়াছিল।"

"ওঃ সেই জন্য 'খাও তাড়াতাড়ি' উলুবেড়িয়ায় যাওয়া! তা—ই ব—ল।"

অমল কোনও উত্তর দিল না। তাহাকে নিৰ্বাক দেখিয়া মালতী আরও বিদ্রূপ করিতে লাগিল। কিন্তু তখন অমলের মনের যে অবস্থা, তাহাতে কোনরূপ উত্তর দিবার প্রবৃত্তিও তাহার ছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল—অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ—সে যেন অকূলে পড়িয়াছিল, কূল পাইতেছিল না।

জীবনে অমল আর কখনও এমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় নাই। এক দিন সে বড় দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিল; সে—যে দিন সুরেশচন্দ্র মালতীর সঙ্গে তাহার বিবাহের প্রস্তাব করিতে তাহার বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। সে দিন, সে কত কথাই ভাবিয়াছিল। সে দিনও অতীতের কথা—বর্ত্তমানের কথা—ভবিষ্যতের কথা সে ভাবিয়াছিল। কিন্তু সে দিন ভাবিয়া সে একটা কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছিল, এবং এত দিন অবিচলিত বিশ্বাসে সেই কর্ত্তব্যের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। সে কি সে দিন ভুল করিয়াছিল? সে দিন সে মার প্রতি তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়াছিল—তাহার সুখসন্তোষবিধানেই তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিল। আর মা কোথায়? তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—কিন্তু মালতীর ব্যবহারে, মালতীর মাতার ব্যবহারে সুখী হইতে পারিয়াছিলেন কি? তাহার পর? তাহার পর কাহারও সেবা শুশ্রূষা না লইয়াই মা চলিয়া গিয়াছেন। আর সে দিন সে মনে করিয়াছিল, অতীত জীবন মুছিয়া ফেলিতে পারিবে কিন্তু কই—সে আশা ত পূরে নাই! কেন পূরে নাই? মালতীর ভালবাসায় সে কি সত্য সত্যই অতীত ভুলিতে পারিত না? কে বলিতে পারে? কিন্তু যাহা হয় নাই, সে জন্য আক্ষেপ করিলেও, যাহা হইয়াছে, তাহাকে ত আর "হয় নাই" করা যায় না। এখন উপায় কি?

শেষে তাহার মনে পড়িল, সে মালতীকে বলিয়াছে—সে কখনও ছলনার পাপে দাম্পত্য-জীবন কলঙ্কিত করিবে না। তাহা হইলে আজিকার এই ঘটনা মালতীকে বলিতে হয়। কিন্তু বলিলে ফল কি হইবে, তাহাও সে অনুমান করিল—অনুমান করিয়া শঙ্কিত হইল।

আহারে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না। তাহাতেও মালতী বিদ্রূপ করিল—"কেন, মনীষাকে দেখিয়াই কি ক্ষুধাতৃষ্ণা সব গিয়াছে?"

অনাহারে—অনিদ্রায় অমলেন্দু সমস্ত রাত্রি বসিয়া ভাবিল।

পরদিন সকালে—অন্য দিনেরই মত—অমল বাহির হইয়া গেল। মধ্যাহ্নে গাড়ী ফিরিয়া আসিল। কোচম্যান মালতীকে জানাইল, সে "বাবুকে" ষ্টেশনে ছাড়িয়া আসিয়াছে। তিনি গাড়ী বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিতে বলিয়া গিয়াছেন। মালতী মনে করিল, কোথাও রোগী দেখিতে গিয়াছেন।

সন্ধ্যার সময় ডাকে মালতী অমলের পত্র পাইল—

"আমি অপরাধী। এক দিন তোমাকে বলিয়াছিলাম, যদি কোন দিন তোমার প্রতি কর্ত্তব্যচ্যুত হই, তবে আমি তোমাকে বলিব। ছলনার পাপে দাম্পত্য-জীবন কলঙ্কিত করিব না। আজ সে কথা বলিতে হইতেছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি আমার অতীত ভুলিতে পারিব—স্ত্রীর ভালবাসায়, কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্ররোচনায় সে চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিব। কিন্তু তাহা পারিলাম না। আমার অতীত

আমার বর্ত্তমানকে অভিভূত করিতেছে। তাই পাছে—জীবনের আদর্শ নষ্ট হই, সেই ভয়ে আমি পলায়ন করিতেছি। মানুষকে বিশ্বাস নাই। কিন্তু আমি ভ্রান্ত—পাপী নহি।"

সেই দিন মনীষাও অমলের একখানি পত্র পাইল—

"আমাকে ক্ষমা করিও। মনে করিয়াছিলাম, হৃদয়ের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইব। ভুল করিয়াছিলাম—যাহার সাহায্যে ও সহায়তায় জয়ের আশা করিয়াছিলাম, সে-ই বড় আশায় হতাশ করিয়াছে। আজ আমি পরাজিত—এ পরাজিত জীবনে সুখ নাই। কিন্তু আশঙ্কার অন্ত নাই। তাই পরাজিত হইয়া আমি পলায়ন করিতেছি। আমি দুর্ব্বল—আমি ভ্রান্ত—আমি কাপুরুষ। তবুও যদি পার, আমাকে ঘৃণা করিয়া ক্ষমা করিও। আমি জগতে কেবল অসুখেরই কারণ হইয়াছি।"

পত্র পাইয়া মালতী প্রথমে রাগ করিল—তাহার পর স্তম্ভিত হইল। তার পর যত দিন যাইতে লাগিল, তত সে আপনার জীবনের বিরাট্ শূন্যতা অনুভব করিতে লাগিল—তাহাতে পীড়িত হইতে লাগিল। হায় মানব-জীবন! মানুষ না বুঝিয়া—ভবিষ্যৎ বিচার না করিয়া কত সময় কত ভুলই করে!

৮

সুরেশচন্দ্রের পরিবারের ও মালতীর জীবনের শান্তি হরণ করিয়া অমলেন্দু চলিয়া যাইবার পর প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কন্যার দুর্দশায় ভগ্নহৃদয় সুরেশচন্দ্র মৃত্যুর পরপারে শান্তির রাজ্যে গিয়াছেন। যত দিন গিয়াছে, তত মালতী বুঝিতে পারিয়াছে, স্বামী নারীর জীবনের কতখানি পূর্ণ করিয়া থাকেন—তাঁহাকে হারাইলে ব্যর্থ নারীজীবন কত শূন্য হয়। এক দিন মাতার ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া সে মনে করিয়াছিল, দরিদ্রে কন্যাদান কখনই সুখের হইতে পারে না। তাহার পর পিতার মৃত্যুর পর যখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল, পিতৃহীন পিতৃগৃহে বাস কেবল অসুখের, তখন সে দরিদ্র পাত্রে সলিলাকে দান করিয়া জামাতাকে আপনার গৃহে আনিয়া বাস করাইয়াছে—দৌহিত্র-দৌহিত্রীদিগকে লইয়া শূন্য হৃদয়ের বিরাট্ ব্যর্থতার বেদনা ভুলিয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।

সলিলার জ্যেষ্ঠা কন্যা পুষ্পের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্র বিবাহের পর বিদ্যালাভের জন্য বিলাতে গিয়াছে—কন্যাকে "বিলাত-ফেরৎ" স্বামীর "উপযুক্ত" করিবার চেষ্টায় সলিলা তাহাকে লেখাপড়া শিখাইবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছে। বহু সন্ধানে এক জন উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী পাওয়া গিয়াছে। তিনি ধর্ম্মে—ব্রাহ্ম; কুমারী; শিক্ষয়িত্রীর কাজ লইয়া থাকেন—সে জন্য একটি সমিতির সৃষ্টি করিয়াছেন, সকলেই শিক্ষাদান করেন। তিনি প্রৌঢ়া। কিন্তু বয়সে তাঁহার রূপের প্রভা নির্ব্বাপিত হয় নাই—কেবল কোমল ও স্নিগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মুখে গাম্ভীর্য্যের আভাস—ব্যবহারে স্নেহ সর্ব্বদা সপ্রকাশ। তিনি অতি যত্নে পুষ্পকে পড়াইয়া থাকেন। কিন্তু সলিলা লক্ষ্য করিয়াছে, তিনি দুঃখের কবিতা—বেদনার কথা পড়াইতেই ভালবাসেন। তিনি যখন ইংরাজ কবি শেলীর কবিতা আবৃত্তি করেন—

"যে সঙ্গীতে বাজে যত বিষাদের সুর,
সে সঙ্গীত ততই মধুর"

তখন তাঁহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আইসে। তিনি যখন 'অশ্রু-কণা'র কবিতা আবৃত্তি করেন—

"এ নহে সে অশ্রু, সখা, দীর্ঘ বিরহের পরে
ফুটিয়া উঠিত যাহা হাসির কোমল থরে।
এ শোকাশ্রু।"

তখন তাঁহার নয়নে অশ্রু দেখা দিত।

এক দিন পুষ্পের পড়িবার ঘরের সংস্কার হইতেছিল; তাই পুষ্প শিক্ষয়িত্রীকে আর একটি ঘরে লইয়া গেল। সে ঘর পূর্ব্বে অতুল বাবুর বসিবার ঘর ছিল। তাহার প্রাচীরে দুইখানি তৈলচিত্র—একখানি অতুলবাবুর প্রতিকৃতি, অপরখানি অমলেন্দুর। সহসা সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রাচীরের দিকে চাহিয়া শিক্ষয়িত্রী থমকিয়া দাঁড়াইলেন—বসিয়া পড়িলেন; তাহার পর তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল—তাঁহাকে ডাক্তার সঙ্গে দিয়া তাঁহার গৃহে পাঠান হইল। ডাক্তার বলিলেন, পক্ষাঘাত।

পর পর দুই দিন পুষ্প শিক্ষয়িত্রীর সংবাদ লইল—অবস্থা ভাল নহে। তৃতীয় দিন সে জিদ ধরিল, সে একবার তাঁহাকে দেখিতে যাইবে। শেষে সলিলা মেয়েকে লইয়া শিক্ষয়িত্রীকে দেখিতে গেল। তিনি শিক্ষয়িত্রীসঙ্ঘের গৃহেই থাকিতেন। ত্রিতলে—এক কোণে তাঁহার ঘর। তাঁহার পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহার এক দিদিও তথায় আসিয়াছিলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই সলিলা দেখিল—কক্ষের এক পার্শ্বে—যে স্থানে শয্যায় শয়ানা শিক্ষয়িত্রীর দৃষ্টি পড়ে, সেই স্থানে একটি শ্বেত-মর্ম্মরের টেবল; তাহার উপর তাহার নিরুদ্দিষ্ট পিতার প্রতিকৃতি; ছবির নিম্নে কতগুলি ফুল সাজান। শিক্ষয়িত্রীই যে মনীষা, তাহা বুঝিতে সলিলার আর বিলম্ব হইল না।

সলিলা গৃহে ফিরিয়া তাহার মাকে সে কথা বলিল। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের কত ব্যথা মালতীর বুকে বাজিয়া উঠিল। এই মনীষাই তাহার সকল ব্যথার কারণ—ইহার জন্যই তাহার জীবন ব্যর্থ হইয়াছে। মনীষার প্রতি ক্রোধে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইতে লাগিল। কিন্তু সে ক্রোধ স্থায়ী হইতে পারিল না। মনীষার জীবনেই বা কি রহস্য আছে? সে কি তাহা জানিতে পারিবে? সমস্ত রাত্রি সে ভাবিল। তাহার পরদিন সে বলিল, সে মনীষাকে দেখিতে যাইবে। সলিলা শঙ্কিতা হইল। কি জানি, যদি মা বেদনার আতিশয্যে আত্মসংবরণ করিতে না পারেন। মনীষা মরণাহতা—তাহার মৃত্যুশয্যায় মা কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিবেন না ত? কি জানি—ব্যর্থ জীবনের বিষম বেদনা। কিন্তু সে মালতীকে নিবারণ করিতেও পারিল না।

৯

মালতী যখন মেয়েকে সঙ্গে লইয়া মনীষার কক্ষে উপনীত হইল, তখন মনীষার আর কথা কহিবার ক্ষমতা নাই। তাহার দৃষ্টি—জীবনের শেষকালেও সতৃষ্ণভাবে অমলেন্দুর চিত্র দেখিতেছিল। সে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই মালতীর হৃদয়ের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল, সে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে; দেবতার বেদীমূলে পূজারী দেবমূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে জীবনত্যাগ করিতেছে।

মালতীর মনে হইল, মনীষায় ও তাহাতে কি প্রভেদ। সে যাহাকে পাইয়া হারাইয়াছে, মনীষা

তাহাকে হারাইয়া পাইয়াছে। সে হৃদয় পূর্ণ করিবার সব উপাদান পাইয়াও তাহা শূন্য করিয়াছে; আর মনীষা সে উপাদান না পাইয়াও কেবল ভালবাসার ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে হৃদয় পূর্ণ করিয়াছে। সে মনীষার চরণধূলি লইবারও উপযুক্ত নহে। সে বহুক্ষণ বসিয়া মনীষার মস্তকে হাত বুলাইল। মনীষার দৃষ্টি সেই চিত্রে নিবদ্ধ।

পরদিন মালতী যখন আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন মনীষার শবের পার্শ্বে বসিয়া তাহার দিদি অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "ভগিনী আমার ভালবাসার স্বপ্ন লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিল; একদিন সুখী হইল না।"

মালতীর মনে হইল, মনীষা ভালবাসায় যে সুখ পাইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশ পাইলে সে ধন্য হইত।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ব্যর্থ প্রয়াস।

| আত্মকাহিনী। |

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবি হয়ে জন্মেছি ধরায়।' আমার এতটা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি নাই, কিন্তু তথাপি আমার বয়োগতে কবিতাবিলাসের সাধ হইল। হঠাৎ একদিন কবি হইবার খেয়াল গজে উঠিল। (পাঠক বলিবেন, এত বিলম্বে কেন? মনে রাখিবেন, আমাদের কৈশোরে অকাল-কতার, আজকালকার মত, অতটা বাড়াবাড়ি হয় নাই।) কালিদাসের 'মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী মিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্' আমার জপমন্ত্র হইল। স্থির করিলাম, যেমন করিয়া হউক, আমাকে কবি ইতেই হইবে। কলিকাতা সহরের অনেক ফ্যাশান-দোরস্ত কবিকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। াহাদের মত ধরণধারণ চলনবলন করিতে লাগিলাম। আমার মস্তকের কেশ ছিল 'শঙ্কিত সজারুপৃষ্ঠে ণ্টক যেমতি' 'Like quills upon the fretful porpentine (porcupine)'; হেয়ার-কাটারের বাড়ী য়া উচ্চ হারে সেলামী দিয়া উগ্র যন্ত্রণা সহ্য করিয়া কেশ কুঞ্চিত করিয়া লইলাম। শরীরের ছিল ভ্রমরকৃষ্ণ, প্রত্যহ অল্প-পরিমাণে আর্সেনিক উদরস্থ করিয়া বর্ণটা মেটেমেটে করিয়া ইলাম। জীরো নম্বরের চশমা ধরিলাম, চুড়ীদার, লপেটা, ঢাকাই ধুতী, সিল্কের চাদর সবই 'ব্যব-রে আনি'লাম,—বাকী রহিল কেবল inspiration অর্থাৎ কবিপ্রেরণা।

কবিপ্রেরণার উৎস-সন্ধানে কবিগণের গ্রন্থাবলী ঘাঁটিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কেহ বলিয়া-ন—'বাশুলী আদেশে, কহে চণ্ডীদাসে'; কেহ বলিয়াছেন—'দেবী চণ্ডী মহামায়া, দিলেন চরণ-য়া, আজ্ঞা দিলেন রচিতে সঙ্গীত'; কেহ বলিয়াছেন—'ভবানীর আজ্ঞায় ভারতচন্দ্র গায়।' এমন , নব-যুগের মহাকবি মাইকেল মধুসূদন খ্রীষ্টানী মত ভুলিয়া খাঁটী হিন্দুর মত (কারে পড়িলে মুষের এমনিই হয়।) 'বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে রতি' বলিয়া বাণীর আবাহন করিয়াছেন। প্রতীচীর প্রাচীন কবিরাও Muse অর্থাৎ বিদ্যার ধিষ্ঠাত্রী দেবীর আবাহন করিয়াছেন, খ্রীষ্টান কবি মিল্টন পর্য্যন্ত সেই গোড়ে গোড় দিয়াছেন—তবে eavenly Muse বলিয়া পৌত্তলিকের দেবতাকে শোধন করিয়া লইয়াছেন। বৈদ্যসঙ্কটে রোগী মারা ইবার মত আমি এইরূপ দেবীসঙ্কটে মারা যাইবার মত হইলাম, নানাদেবীর মধ্যে একটু দিশা-রা হইয়া পড়িলাম, ঋগ্বেদের ঋষির মত 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' বলিয়া আকুল হইলাম। ছোটমুখে বড় কথা!) যাহা হউক, এই ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া কৃষ্ণনগরাধিপের সভাকবি ভারত-ন্দ্রের 'ভারতের ভারতী ভরসা' এই বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বাগ্‌দেবীর শরণগ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ-ল্প মনে করিলাম।

কালী, কলম, কাগজ লইয়া একটি সরস্বতীবন্দনা ফাঁদিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় গৃহিণী তাম্বূলসেবার জন্য সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। লেখার সরঞ্জাম দেখিয়া, কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি চেয়ারের পিঠে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, এবং দেখিলেন, বড় বড় হরপে 'সরস্বতী-বন্দনা' কথাটা লিখিয়াছি। দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ কি? এখনকার দিনেও তুমি সেকেলে সরস্বতী-বন্দনা লিখিতেছ? তুমি কি পড় নাই? হেমবাবু লিখিয়াছেন—

'দেবতা অসুরগণ, ক্রমে হয় অদর্শন,
ঈশ্বরেরই সিংহাসন উঠিতেছে কাঁপিয়া।'

তা' ছাড়া এখনকার দিনে বীণাপাণির পূজা কেবল এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক-মহলে প্রচলিত আছে, তোমার মত কৃতবিদ্যগণ এখন জীবন্ত চলন্ত পুংসরস্বতীর পূজা করেন। তুমি তাঁহার পূজায় নারাজ হইয়া কি বিশ্ববিদ্যা-জননীর ত্যাজ্যপুত্র হইতে চাও?" (শ্বশুর মহাশয় আমার মাথা খাইতে ইহাঁকে মেয়ে-কলেজে পড়াইয়াছিলেন। এখন এই 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী'র দাপটে আমি অস্থির। ইতি জনান্তিকে।) আমি গত্যন্তর না দেখিয়া কবি হইবার গুপ্তবাসনা গৃহিণীর কাছে ব্যক্ত করিলাম।

এই কথা শুনিয়া তিনি একগাল হাসিয়া 'দন্তরুচিকৌমুদী' বিকাশ করিয়া বলিলেন, "তা, এর জন্য অন্য দেবতার দুয়ারে ধর্না কেন? তুমি কি জান না, হাল আইনে পত্নীই পতির আরাধ্য দেবতা? পত্নীর প্রেমে বিভোর হও, 'সেই ধ্যান সেই জ্ঞান' কর, আপনিই কবিপ্রেরণা কাব্যকলা আসিবে। 'অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।' ঘরে বসিয়া যদি গতিমুক্তি হয়, তবে আকাশবৃত্তি হইয়া দেবতার মুখ চাওয়া কেন? দেখ, মহাজনেরা বলিয়াছেন, গৃহস্থকে 'গৃহিণীসচিব' হইতে হয়; কবি কালিদাসও স্বীকার করিয়াছেন—'গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ'। অতএব আর ইতস্ততঃ না করিয়া আমার পরামর্শ লও, সিদ্ধিলাভ হইবে।"

আমাকে সুবোধ বালকের মত তাঁহার বাক্যে মনোযোগী দেখিয়া তিনি আরও উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিলেন—"কালিদাসের কথায় আর এক কথা মনে পড়িল। কালিদাস সরস্বতীর বরে কবিশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাকার কিংবদন্তী শুনিয়া তোমার, বোধ হয়, এইরূপ মতিগতি হইয়াছে। কিন্তু এটি তোমার ঠিকে ভুল। তাঁহার কবিশক্তিলাভের মূলকারণ পত্নীর তিরস্কার। বিদুষী রাজকন্যা তাঁহাকে অপমান না করিলে তিনি কোনও দিনই কবি হইতে পারিতেন না। তাই বলিতেছি, তুমিও আমার তিরস্কারে কবি হইয়া উঠিবে। দেখ, কালিদাস অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, তিনি প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া 'ঋতুসংহার' ও 'শ্রুতবোধ' রচনা করিয়া ঋণস্বীকার ও কতক পরিমাণে ঋণ-পরিশোধও করিয়াছেন। এখনও অনেক কবি পত্নীকে পুস্তক উৎসর্গ করিয়া পত্নীর নিকট ঋণ স্বীকার করেন।

"এই ত গেল কালিদাসের কথা। তার পর 'ভারতের কালিদাস' ছাড়িয়া 'জগতের' কালিদাস—অর্থাৎ শেক্স্পীয়ারের কথা। ইংরেজবাচ্ছা শেক্স্পীয়ার বাপের সুপুত্র হইয়া কথাটা কালিদাসের মত এমন সহজে এমন সৌজন্যের সহিত স্বীকার করেন নাই বটে, কিন্তু পত্নীর প্রভাবেই যে তাঁহারও কবিত্ব-স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল, তাহা তাঁহার প্রথম মানসসন্তান ('First heir of my invention') 'ভীনাস্ এণ্ড এডোনিস্' কাব্য পাঠ করিলেই, যাহার চক্ষুঃ আছে, সে দেখিতে পাইবে। যখন রসিকা বয়োধিকা

বাগ্‌বিদগ্ধা ভীনাস্‌ দেবী লাজুক তরুণ যুবক এডোনিসের নিকট গদ্গদবচনে প্রেম জ্ঞাপন করিতেছেন, এই দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত হয়, তখন কি কাহারও বুঝিতে বাকী থাকে যে, ছদ্মনামের অন্তরালে রসিকা বয়োধিকা বাগ্‌বিদগ্ধা এন্ হ্যাথাওয়ে লাজুক তরুণ যুবক শেক্‌স্‌পীয়ারের প্রসাদনে ব্যাপৃত? অর্থাৎ কবি নিজের প্রণয়িনীর পূর্ব্বরাগ হইতেই কবিপ্রেরণা পাইয়াছেন। তাঁহার রচিত অনেক মিলনান্ত নাটকে যে প্রগল্‌ভা প্রেমিকা নায়িকা নায়কের প্রসাদনে ব্যগ্র, এইরূপ চিত্র দেখা যায়, তাহাও ইহারই পুনরাবৃত্তি।

"আবার কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থেরও পত্নীর নিকট ঋণ কম নহে। তাঁহার পত্নী তাঁহাকে শুধু কবি-প্রেরণা দিয়াই ক্ষান্ত হন্ নাই, নিজের রচিত দু'চারি ছত্র কবিতাও তাঁহার কবিতার মধ্যে গোঁজা দিয়াছেন। এমন-টুকু কালিদাসের বিদুষী পত্নীও পারেন নাই। কবিও কৃতজ্ঞহৃদয়ে একাধিক কবিতায় এ-হেন পত্নীর গুণগান করিয়াছেন। স্পেন্সার ভাবী পত্নীর উদ্দেশে সুমিষ্ট সনেট লিখিয়াছিলেন, এবং পরিণয়-উপলক্ষে এমন সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন যে, এখনকার প্রীতি-উপহারগুলি তাহার কাছে কবিতাই নহে। জার্ম্মাণ কবি গেটেও ভাবী পত্নীর উদ্দেশে সুন্দর কবিতাবলি লিখিয়াছেন। মিল্‌টন মৃত পত্নীর উদ্দেশে যে সনেট লিখিয়াছেন, তাহা কেমন প্রাণস্পর্শী! ফীল্‌ডিং কবি না হইলেও নভেল লিখিয়া কল্পনাকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, পত্নীকে আদর্শ করিয়াই তিনি নায়িকার চিত্র আঁকিয়াছেন।

"তার পর বাঙ্গালা ভাষার না হইলেও বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন কবি 'মধুর-কোমল-কান্তপদাবলী'-রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর কবিতা-সরস্বতী যে পত্নীর প্রেরণায় উৎসারিত হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেকে 'পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্ত্তী' বলিয়া পরিচয় দিয়া সগৌরবে স্বীকার করিয়াছেন। * আর বাঙ্গালার নবযুগের মনীষী ভূ-দেব ভূদেবের 'পারিবারিক প্রবন্ধে'র উৎসর্গপত্রটা একবার পড়িয়া দেখ, তিনি নূতন পুরাণে প্রচারিত কোন্ দশমহাবিদ্যা-লীলাময়ী দেবীমূর্ত্তির প্রভাবে, প্রসাদে ও প্রেরণায় জননী বঙ্গভাষাকে অমূল্য চিন্তারত্ন-রাজিতে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ 'শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত' করিয়াছেন, তিনি কবুলজবাব দিয়াছেন—"একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের—আমার পরিবারের।… তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম, বলিতে পারি না।…স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণ-স্বরূপা।' শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় যে গদ্যলেখক হইয়াও একমাত্র 'উদ্‌ভ্রান্তপ্রেমে' কবিত্বময়ী ভাষায় হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন, পত্নীপ্রেমের প্রভাবই তাহার কারণ নহে কি? ইহার পরেও কি সন্দেহ করিবে যে, পত্নীই কবিপ্রেরণার মূল উৎস, কল্পনা-কল্পতরু-মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনী?"

আমি নীরবে অবহিতচিত্তে বিদুষী বনিতার লম্বা লেক্‌চার শুনিয়া গেলাম; বুঝিলাম যে, লেক্‌চার দেওয়া আমার দৈনন্দিন কার্য্য হইলেও গৃহিণীর 'অশিক্ষিতপটুত্ব' আমাকে হারি মানাইতে পারে। 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্‌' মনে করিয়া তিনি বোধ হয় আমার উপর সুপ্রসন্ন হইতেছিলেন; কিন্তু আমি ভাবিলাম, লেক্‌চার-সমরে গৃহিণীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে আমাকে ব্যবসা ছাড়িয়া দিতে হইবে, চাই কি, মণ্ডন

---

* এইখানে গৃহিণী একটু ঠিকে ভুল করিয়াছেন। নামসাম্যে এইটুকু ঘটিয়াছে। জয়দেবের পত্নীর নাম পদ্মাবতী বটে, কিন্তু এস্থলে পদ্মাবতী শ্রীরাধার নামান্তর। (শ্লেষ নাই ত?) কিন্তু গৃহিণীর বাক্যের প্রবাহে বাধা দিয়া রসভঙ্গ করিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মিশ্রের মত মস্তকমুণ্ডন ও ডোরকৌপীন-ধারণ করিয়া গৃহত্যাগী হইতে হইবে, তাই জোরগলায় গৃহিণীর 'পূর্ব্বপক্ষে'র খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হইলাম। আরও ভাবিলাম, যিনি 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' হইবার কথা, তাঁহাকে গুরুকরণ করিতে হইলে যে বিপরীত বিপর্য্যয় ব্যাপার দাঁড়ায়। এখনই গৃহিণীর যেরূপ প্রচণ্ড প্রতাপ, তাহার উপর তাঁহাকে শুধু গার্হস্থ্যজীবনে নহে, সাহিত্যজীবনেও প্রাধান্য দিতে হইলে আর রক্ষা থাকিবে না। একেই ত তাঁহার আবদারের অত্যন্ত, তবু যতক্ষণ সাহিত্যচর্চ্চায় মগ্ন থাকিব, ততক্ষণ তাঁহার তোয়াক্কা রাখিব না, এমন ভরসা ছিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রেও যদি তাঁহাকেই ইষ্টগুরুর আসনে বসাইতে হয়, তাহা হইলে ত তাঁহাকে আঁটিয়া উঠা দায় হইবে। এইরূপে নানাভাবে বিষয়টির পর্য্যালোচনা করিয়া আমি স্পষ্টবাক্যে কান্তার উপদেশযুক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদ করিলাম। (হায়! তখন ঝোঁকের মাথায় বুঝি নাই, এই স্পষ্টবাদিতার কি পরিণাম হইবে!)

আমি বলিলাম, "দেখ, তান্ত্রিক সাধনার ন্যায় সাহিত্যিক সাধনায়ও যে একজন স্ত্রীলোকের, একজন শক্তির প্রয়োজন, তাহা তোমার কথায় বেশ বুঝিলাম। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, এ সকল ক্রিয়ায় স্বকীয়া অপেক্ষা পরকীয়া শ্রেষ্ঠ। স্বকীয়া-পরকীয়া-তত্ত্ব ছাড়িয়া দিয়া প্রসঙ্গতঃ বলিতে পারি যে, জননী ভগিনী প্রভৃতির প্রভাবে বা প্রেরণায়ও স্থানে স্থানে কবিত্বস্ফুরণ হইয়াছে। তুমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের পত্নীর প্রভাবের কথা স্বমতপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে যতই বাড়াইয়া বল না কেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, তাঁহার কবিজীবনে সহোদরা কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রভাব ও প্রেরণা অপরিসীম। তিনি পুনঃ পুনঃ এ কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার সুহৃদ্ চার্লস্ ল্যাম্বের সহোদরা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর নিকট ঋণও উল্লেখযোগ্য। স্যর ফিলিপ সিড্‌নি সহোদরা ভগিনীর প্রীতিকামনায় আর্কেডিয়া-নামক চম্পূকাব্য লিখিয়াছেন। উৎসর্গ-পত্রে ভগিনীকে 'most dear' বলিয়া সম্বোধন করিয়া এবং 'you desired me to do this, and your desire to my heart is an absolute commandment' বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়া গভীর ভগিনীপ্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। কুপার মাতৃভক্তির প্রেরণায় তাঁহার শ্রেষ্ঠ কবিতা 'জননীর চিত্রদর্শনে' লিখিয়াছেন। শেনষ্টোন্ তাঁহার গুরু-মার প্রতি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া 'Schoolmistress' নামক খণ্ডকাব্য লিখিয়াছেন। ফরাসী নভেল-লেখক বালজ্যাক তাঁহার সহোদরা ভগিনীর উৎসাহ ও সমবেদনা সম্বল করিয়াই সাহিত্যসাধনায় প্রবৃত্ত হন।

"কিন্তু এই শ্রেণীর কবির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। আবার ইঁহারাই যখন পরকীয়াপ্রেমে বিভোর হইয়া কবিতা লিখিয়াছেন, তখন সেই সব কবিতায় যে আন্তরিকতা ও তীব্রমাধুর্য্য আছে, তাহা জননী, ভগিনী, এমন কি, পত্নীর বেলায়ও দেখা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে কুপারের My Mary, To Mary কবিতাযুগল, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের লুসির উদ্দেশে লিখিত কবিতাবলি, ল্যাম্বের Hester কবিতা, Annaর উদ্দেশে লিখিত সনেটগুলি ও ব্যর্থপ্রণয়ের স্মৃতিনিদর্শন Rosamund Gray ছোট-গল্প প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়।'

"ফলতঃ শেক্‌স্‌পীয়ার হইতে এল্‌গার নি লিখিত পর্য্যন্ত বহু কবি এই পরকীয়াপ্রেমে মস্‌গুল। তুমি বলিতেছ, শেকস্‌পীয়ার বয়োধিকা পত্নীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার প্রথম কাব্য ও কয়েকখানি মিলনান্ত নাটক লিখিয়াছেন। তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেগুলিতে ত তিনি তাঁহার অন্তরের কথা প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার Sonnets অর্থাৎ চতুর্দ্দশপদী কবিতাগুলিতেই তিনি হৃদয়ের অন্তর্গূঢ় বেদনা

প্রসাধন

চিত্রকর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ লাহার সৌজন্যে
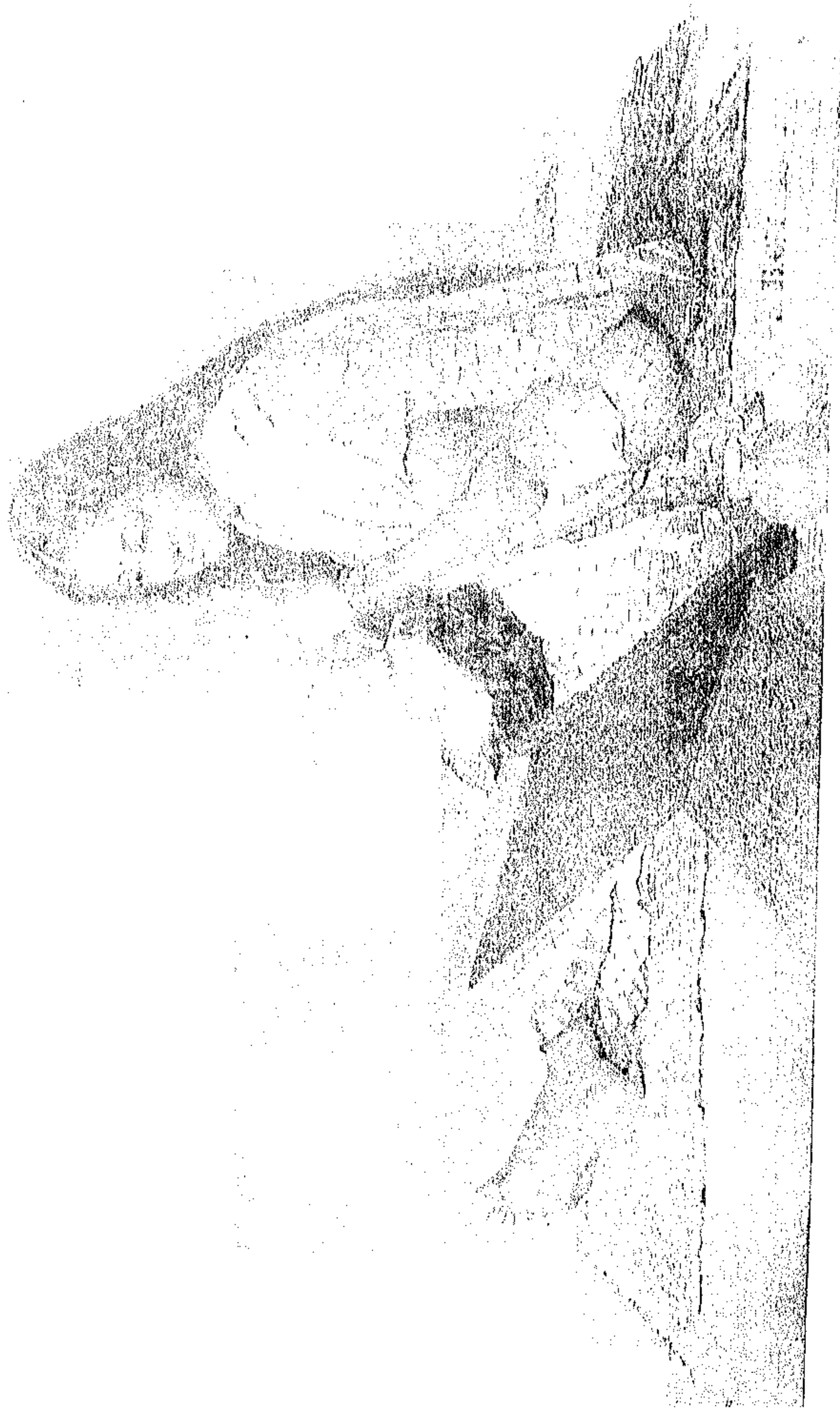
প্রকাশ করিয়াছেন, কবি ওয়ার্ড্স্ওয়ার্থ এইরূপ রায় দিয়াছেন। এগুলি যে পরকীয়াপ্রেম-প্রণোদিত, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই ; ব্যাখ্যাকারগণ অসাধারণ অধ্যবসায়-সহকারে সেই dark ladyর নামধাম, জাতিকুল, পেশা পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিয়া নিজেরাও ধন্য হইয়াছেন, শেক্স্পীয়ারকেও ধন্য করিয়াছেন। তুমি স্পেন্সারের সনেটগুলি পত্নীপ্রেমের প্রেরণায় রচিত বলিয়াছ, কিন্তু স্পেন্সারের অন্যতম মুরুব্বী ও দোস্ত স্যর ফিলিপ সিড্নির সনেটগুলি সম্বন্ধে ত সে কথা বলিতে পার না। যে নারী'ক উদ্দেশ করিয়া সিড্নি সনেটগুলি লিখিয়াছেন, তাঁহার সহিত এক সময়ে সিড্নির বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, সনেটগুলির রচনাকাল ঐ নারী অপরের অঙ্কশায়িনী হইবার পর। অথচ আদর্শচরিত্র সিড্নি পরকীয়া-প্রেমে বিভোর হইয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে কবিতাগুলি লিখিয়াছেন (look in thy heart and write, and love doth hold my hand and makes me write) এবং উচ্ছ্বাসভরে প্রণয়িনীকে সম্বোধন করিয়াছেন—

'Stella the only planet of my light,
Light of my life, and life of my desire
Chief good whereto my hope doth only aspire
World of my wealth, and heaven of my delight
If thou praise not, all other praise is shame.

পূর্ব্বে সিড্নির ভগিনী-প্রীতির কথা বলিয়াছি বটে, কিন্তু এই পরকীয়া-প্রীতি সর্ব্বাতিশায়িনী।

"তাহার পর সনেটের রাজা 'ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা কবি'—আমাদের মাইকেল যাহাকে 'বড়ই যশস্বী সাধু কবি-কুল-ধন' বলিয়া সাধুবাদ করিয়াছেন—যে পরকীয়া লরার উদ্দেশে সনেট লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। ইতালীয় কবি দান্তে ট্যাসো সম্বন্ধেও মোটের উপর ঐ একই কথা। যে সব ইংরেজ কবি ইতালীয় কবিগণের অনুসরণে সনেট লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পরকীয়া-প্রেমের চর্চ্চায় এই পথ ধরিয়াছেন।

"মহাকবি মিল্টন একটিমাত্র সনেটে দ্বিতীয় পক্ষের পত্নীর দেহত্যাগের পর তাঁহার গুণগান করিয়াছেন, ইহা লইয়া তুমি খুব আস্ফালন করিয়াছ, কিন্তু পত্নীর মরণের পর ওরূপ ভাবোচ্ছ্বাস অনেক গদ্য-পদ্য-লেখকেরই হয়। হয় ত তোমার মত হৃদয়হীনেরও হইবে। যাক্ সে কথা। এই শুদ্ধশীল কবি যৌবনে ইতালী-প্রবাসকালে লিওনোরা-নাম্নী গায়িকার ও অপর একজন অজ্ঞাতনাম্নী ইতালীয় সুন্দরীর রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া যে সব কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে যে উচ্ছ্বাস ও উদ্দামতা আছে, তাহা মৃত পত্নীর উদ্দেশে রচিত সনেটে পাওয়া যায় না। ভাগ্যে সেগুলি ল্যাটিন ও ইতালীয় ভাষায় লিখিত, তাই ভক্তগণ অনেকে সে সংবাদ রাখেন না, সুতরাং তাঁহাদের ভক্তি অব্যাহত আছে। চরিত্রবান্ কবির এরূপ মতিগতি বোধ হয় বিলাসভূমি ইতালীর আবহাওয়ার গুণে। তাই ত পাকা স্কুলমাষ্টার এস্কাম্ ইতালীভ্রমণের উপর হাড়ে চটা ছিলেন।

"কুপারের My Mary, To Mary কবিতা-যুগলের কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার দীর্ঘ কাব্য

The Task যে পরকীয়ার প্রণোদনায়, প্রেমাবেশে রচিত, তাহা তিনি ভাবগদগদকণ্ঠে কাব্যের মুখবন্ধেই স্বীকার করিয়াছেন,—

The theme, though humble, yet august and proud Th'occasion—for the Fair commands the Song; আবার রঙ্গিণী পরকীয়ার পাল্লায় পড়িয়া গম্ভীরপ্রকৃতি কবি কেমন বিমল হাস্যরসের বান ডাকাইয়াছেন, তাহা তাঁহার John Gilpinএ প্রকাশ।

"বার্ন্‌স্ বায়রন একপ্রকার বাল্যকাল হইতেই প্রেমের চর্চা করিতেন, ফলে পরকীয়া-প্রেমের প্রভাবেই তাঁহাদিগের গীতিকবিতা অনির্বচনীয় মধুরতা লাভ করিয়াছে। ইহা ছাড়া অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সে ইটালীবাস-কালে একজন বিদেশিনীর সংসর্গে বায়রনের উৎকৃষ্ট কাব্যগুলি প্রভাবিত। এইরূপ কীট্‌সের কবিতার উপর একটি নারীর প্রভাব জাজ্বল্যমান। শুনিয়াছি, ফরাসী কবি Alfred de Musset এক এক চোট প্রেমে পড়িয়া প্রেমের পিচ্ছিল পথে চোট খাইতেন, আর এক একখানি কাব্য লিখিতেন; বোধ হয়, এই কাব্যরসসিক্ত প্রলেপেই তাঁহার বেদনা দূর হইত, ভাঙ্গা হৃদয় আবার যোড়া লাগিত।

"জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ কবি ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের) কবিতার সমজদার ছিলেন। সুতরাং তাঁহাকেও এ দলে টানা যায়। তিনি কবিজনোচিত ভাষায় সধবা পরস্ত্রী Mrs Taylorএর নিকট তাঁহার ঋণস্বীকার করিয়াছেন। দার্শনিকপ্রবর, পরস্ত্রী বিধবা হইলে তাঁহার বৈধব্যযন্ত্রণা দূর করিয়া, পরকীয়াকে স্বকীয়ায় পরিণত করিয়া, প্রেমরক্ষা করিয়াছিলেন। ফরাসী নভেল-লেখক বালজাকও ঠিক এই কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার ভগিনীর প্রভাব অপেক্ষা যে পরকীয়া শেষে তাঁহার স্বকীয়া হইয়াছিলেন, সেই মহিলার ও অন্যান্য প্রীতিশীলা পরকীয়ার প্রভাবেই তাঁহার কল্পনাশক্তির পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল।

"তুমি বিদেশীয়দিগের নজীর খাড়া করিয়াছিলে, তাই আমিও এতগুলি বিদেশীর কথা বলিয়া সে কথার কাটান দিলাম। স্বদেশীর চেয়ে বিদেশীদিগের সঙ্গেই আমার বাল্যাবধি পরিচয় বেশী, তাই একটুকু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছি। আর বিদেশী নজীর আওড়াইয়া কোনো উপকার ঘটিবে না। এইবার স্বদেশী কবিদিগের কথা বলি।

"তুমি কালিদাসের পত্নীর প্রভাবের উপর খুব ঝোঁক দিয়াছ। কিন্তু তিনি কবিতা লিখিয়াই মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন, মালিনী না শুনিলে, না বাহবা দিলে, তাঁহার মন তুষ্ট হইত না, এই যে প্রবাদ আছে, ইহা একেবারে উড়াইয়া দিলে চলে না। ন হস্যা জনকশ্চিৎ! অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রবাদের পোষকতা করিয়াছেন ('বিষবৃক্ষ' দেখ)। ইহা ছাড়া, কালিদাসের অবাধ প্রণয়চর্চ্চার ও' একটি গল্পও আছে, তাহাতে মনে হয়, তিনি এ সব বিষয়েও সেক্‌সপীয়রের সমকক্ষ ছিলেন।

"তাহার পর বাঙ্গালা সাহিত্যের পালা। বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও বঙ্গ প্রসিদ্ধ সমালোচক তাঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানিত স্থান দিয়াছেন। তিনি আশ্রয়দাতা রাজা শিবসিংহের রাণী লছিমার প্রতি প্রেমের প্রভাবে কবি হইয়াছিলেন, লছিমার দর্শনমাত্রেই তাঁহার কবিত্বস্ফুরণ হইত। অত্র প্রমাণং যথা। 'লছিমাকামিনী রাধা হই নব সাথ। যাবে দেখি কবিতা

স্ফুরয়ে শতধারা॥' ইতি নরহরি দাস। সম্প্রতি কেহ কেহ এই প্রবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বহু বৈষ্ণবের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

"তাহার পর শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবি বড়ু চণ্ডীদাস। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তিধারী মনস্বী ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল বলিয়া গিয়াছেন, 'নান্নুরের একটি অবিবাহিত দরিদ্র ব্রাহ্মণ এবং একটি বিধবা দরিদ্রা রজকী পরস্পরকে ভালবাসিয়াছিল এবং সেই ভালবাসা হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্যানে সর্ব্বপ্রথমে একটি সুন্দর ফুল ফুটিয়াছিল।' এই 'রজকিনীরূপ কিশোরীস্বরূপ,' এই 'রজকিনী-প্রেম নিকষিত হেম' যে বাশুলী দেবীর হাতের চড়ের চেয়ে চমৎকার, ইহা কি আর বলিতে হইবে? তাই 'ধোপানীচরণ-সার' চণ্ডীদাস প্রাণ খুলিয়া গাহিয়াছেন—

'শুন রজকিনি রামি।
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।'

"এইবার মধুরেণ সমাপয়েৎ। যে নিধুবাবুর টপ্পা শুনিলে তোমরা একেবারে গলিয়া যাও, আর তোমাদের 'সখি আমায় ধর ধর' অবস্থা হয়, তিনি তিন তিনটা বিবাহ করিয়াও দাম্পত্যপ্রেমের প্রভাবে প্রভাবিত হন নাই, শ্রীমতী নাম্নী বারাঙ্গনার প্রভাবে তাঁহার কবিপ্রতিভা প্রভাবিত হইয়াছিল। তবে এই প্রণয় চণ্ডীদাসের পরকীয়া প্রীতির মতই নির্ম্মল, 'কামগন্ধ নাহি তায়।' এই সংবাদ আমরা 'সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা'র ন্যায় শ্রদ্ধেয় পত্রিকার মারফত পাইয়াছি, এবং এ ক্ষেত্রেও একজন শ্রদ্ধেয় প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ-বৃত্তি-ধারী এই প্রবাদ না অপবাদের প্রচার করিয়াছেন। অতএব বুঝা গেল, এই প্রেমেই তাঁহার টপ্পার উৎস। আশা করি, তোমাকে এতক্ষণে বুঝাইতে পারিয়াছি যে, স্বকীয়া-প্রেমের অপেক্ষা পরকীয়া-প্রেমই কবি-প্রেরণার পক্ষে অধিকতর অনুকূল।"

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া গৃহিণী কি কাণ্ড করিলেন, সে সব গুহ্যকথা বলিয়া আর পাঠক মহাশয়ের ভীতি উৎপাদন করিতে চাহি না। এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার কবি হওয়া ঘটিল না, শেষটা এই দাঁড়াইল। সাজগোজ সবই বৃথায় গেল। চশমা জোড়াটা, চুড়ীদার ঢাকাই ধুতী সিল্কের চাদর—সুটকে সুট সৎপাত্রে অর্থাৎ শ্যালকপ্রবরকে দান করিতে বাধ্য হইলাম। আসেনিকের খরচ উঠাইয়া দিলাম, হেয়ার-কাটারের বাড়ী গিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা দিয়া আবার কুঞ্চিত কলাপ সিধা করাইয়া লইলাম। এক কথায় 'পুনর্মূষিক' হইয়া আবার ছেলে লেখানয় মন দিলাম। ইতি শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আগমনী

১

ধৌত—স্নিগ্ধ নীলাকাশ, প্রসন্ন পবন,
শ্যাম শাটী অঙ্গে পরা,
শ্যাম শস্যে ভরা ধরা,
কূলে কূলে পূর্ণা নদী,
কল-কল নিরবধি!
প্রাচী কোলে দেখে ঊষা সোনার স্বপন,
শর্বরী ভাবিছে হ'বে প্রভাত কখন।

২

স্বপনে মেনকা রাণী
শুনিছে উমার বাণী,—
'মা মা' বলি উঠি কোলে
কত ছলনার বোলে,
জড়াইয়া ধরি গলা কত না চুম্বন!
গৃহী—ভক্ত নিশাশেষে
উঠে আলুথালু বেশে,
বলে, 'আহা কি দেখিনু,—এ নহে স্বপ
দীনের কুটীরে মাতা দিলা দরশন!'

৩

গা তোলো—গা তোলো, মা গো,
জাগো, ধরারাণি, জাগো;
পোহা'ল পঞ্চমী-নিশি,
ধূসর-বরণা দিশি,
জ্বল্-জ্বল্ শুকতারা জ্বলিছে আকাশে;
জননীর বন্দনায়—
বিহগ প্রভাতী গায়;
মঙ্গল-আরতি বাজে,
উঠ, জাগো, শুভ কাজে,
'গা তোল—গা তোল, রাণি'—আগমনী ভাষে।

৪

'পথে আসিছেন গৌরী,
রূপ—দনুজের বৈরী
দশ দিকে দশ কর—মহিষ-মর্দ্দিনী।
বামপদ মহিষাসুরে,
আর পদ সিংহোপরে,
রূপে ভুবন আলো করে,
বিবিধ আয়ুধ করে,
পদভরে টলমল কাঁপিছে মেদিনী।'

৫

হের,—দুখ-নিশা ভোর,
পেতে দে হৃদয় তোর,
জন্ম-জন্মান্তর-পাপ
জীবনের অভিশাপ,
হবে রে মোচন আজি, ও পদ-পরশে।
কাজ কি রে বিল্বদলে,
জবা, জাহ্নবীর জলে ?
পূত করি দেহ-মন
কর আত্ম-নিবেদন—
দুর্গতি-নাশিনি, দুর্গে—উচ্চারি হরষে।

৬

দেখ রে নয়ন ভরি—
চরণে দলিত অরি,
স্মেরাননে স্মিত হাস,
অধরে 'মা ভৈ' ভাষ,
মণ্ডপ করিয়া আলো বিরাজে জননী।
গৃহে গৃহে কি উৎসব,
উঠে বাদ্য, কলরব ;
ধূপ, ধুনা, পুষ্পে, গন্ধে
পূজে গৃহী কি আনন্দে,
ভক্ত-কণ্ঠে 'মা মা' ধ্বনি পুরিয়া অবনী।

শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়।

অদৃষ্ট?

[Henri Barbusse-এর ফরাসী হইতে]

সাদা ফাঁকা দেওয়ালের গায়ে খোলা জানালাটি দিয়ে দেখা যাচ্ছিল সন্ধ্যার দৃশ্য—যেন একটা ছবি, যার শেষ নেই। আর বুড়ো দুটি বন্ধুও সেখানে বসেছিল,—পাথরে-কাটা মূর্ত্তির মতই ভাবার্থহীন।

তারা দু'জনে জীবনের শেষ ক'টা দিন পাশাপাশি কাটিয়ে দিচ্ছিল; একই কোণটুকুর ছায়া ও রৌদ্রে দু'টিতে গড়িমসি করত, একই ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রতীক্ষা করত, ও কখনো কখনো কথা কইত।

—'সকলি ভুল। অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নেই,'—বুড়ো দমনক এমন ভাবে এই কথাগুলি বল্লে, যেন সে ইতিপূর্ব্বে যা বলেছে, বা মনে করছে যে বলেছে, তারই এই শেষ কথা।

বুড়ো কুলদা উত্তরে বল্লে—"না, তা' নয়। আর সকলের যেমন, অদৃষ্টেরও তেমনি ভুল হয়ে থাকে।"

প্রথম বক্তা মুখ ফিরিয়ে সঙ্গীকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে। সে দৃষ্টির ভিতর ছিল একটুখানি মায়া এবং একটুখানি তাচ্ছীল্য—কিন্তু আশ্চর্য্যের ভাব কিছুই ছিল না, কারণ, এ বয়সে তার পক্ষে একটু এলোমেলো বকাটা নিতান্ত স্বাভাবিক।

অপর ব্যক্তি ঘাড় নাড়লে,—সে ঘাড় এক আঁটি কাঠের মত চিমসে ও খাঁজকাটা;—এবং শুকনো কাঠখানার মত হাত দিয়ে ঠক্-ঠক্ ক'রে হাঁটু চাপড়ে বল্লে—

—"হাঁ হয়। আর এমনও সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটে, যার আবার প্রতীকার হয়।"

দমনক চাপা গলায় হুঁঃ ব'লে তার নিস্তেজ, বালিকোটরগত চোখ দুটি আকাশের দিকে তুল্লে। এই ভেবে তার মনটা নরম হ'ল যে, কিছুদিন বাদেই সেও মুখ খুল্লে হয় ত এমনি বাজে কথাই বল্‌বে।

কুলদা বল্‌তে লাগ্‌ল—"আমি সময়কালে বারনন্দিনীকে বিয়ে করেছিলুম। এখন আর আমি তার কথা মনেও করিনে। কিন্তু সেদিন একটি মেয়েকে দেখ্‌লুম, অনেকটা তার মত দেখ্‌তে, তাই তাকে আবার চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পেলুম, তার সব কথা মনে প'ড়ে গেল। আমি তাকে বিয়ে করেছিলুম; আর তার দু'মাস আগে বন্দুকের এক গুলি মেরে তার বাপের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলুম।"

দমনকের হঠাৎ ভয় হ'ল যে, তার সঙ্গী বিকারের ঘোরে প্রলাপ বক্‌ছে, এবং এ অবস্থায় সে নিজে বল্‌তে গেলে একলাই ঘরে রয়েছে। থর্ থর্ ক'রে' রকম কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে সে চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল—

—"অ্যাঁ, কৃপাদা। তুমি ঘুমাচ্ছ?"

—"না। আমি না ঘুমিয়ে ভাবছি। আমি যথার্থই সে মেয়েকে বিয়ে করেছিলুম এবং যথার্থই সে বুড়োর দুই রগের মধ্যে দিয়ে এক গুলি চালিয়ে দিয়েছিলুম। প্রথমেই ব'লে রাখি যে, সে মেয়েটি বাপকে দেবতার মত পুজো করত, আর বাপও তাকে তেমনি ভালবাসত।"

ছোট ছেলে যেমন ক'রে গল্প শোনে, দমনক তেমনি আবার শান্ত ও লক্ষীটি হয়ে বল্লে—

—"সে অনেক দিনের কথা।"

—"হাঁ, এতদিন আগেকার যে, মনে হয় যেন অন্য কার কথা বল্‌ছি, আর এ সব যেন আমি জন্মাবার পূর্ব্বে ঘটেছিল।"

বুড়ো যেন এক যুগ পিছিয়ে গিয়ে, স্মৃতির মত তার পূর্ব্বজীবনের অনর্গল ভাষা ফিরে পেয়ে বল্‌তে লাগল—

—"বীরবাহু কর্ত্তা ছিল ধূর্ত্ত ও খাঁটি লোক। তাই সে আমাকে তার মেয়ে দিতে নারাজ ছিল। কারণ, আমি ছিলুম এক অকর্ম্মার ধাড়ি। আমার দ্বারা বাস্তবিক কোন কাজই হ'ত না,—তার মেয়েকে ভালবাসা ছাড়া;—কিন্তু যারা একমাত্র কাজ নিয়ে থাকে, তারা যেমন সেটা ভাল করেই করে, আমারও এ বিষয়ে সেই কৃতিত্বটুকু ছিল। আমাকে সে মেয়েটি যেরকম মুগ্ধ করেছিল, সেরকম অপর কারো পক্ষে হওয়া অসম্ভব। তারপরে ত সে বুড়ো হয়ে কতকাল হ'ল মরে গেছে। দমনক, শুনছ ত?"

—'হাঁ' বলে দমনক একটু কাছে এগিয়ে এল।

—"তাই বল্‌ছিলুম, তার বাপ মোটে রাজি ছিল না। চারপাশের সব লোকে তার মত বদ্‌লাবার অনেক চেষ্টা কর্‌লে; কিন্তু সে এমন ভাব দেখাত, যেন তাদের কথা শুনতে পাচ্ছে না, বা বুঝতে পারছে না। বেশী দূর এগোতে কেউ সাহস কর্‌ত না। কারণ, বীরবাহুর শরীরে যেমন রাগ তেমনি সামর্থ্য ছিল। তার বাহু ছিল কুস্তিগীর পালোয়ানের মত, আর হাত দুটো ছিল শক্ত যেন হাতিয়ার। একদিন আমি সাহস ক'রে তার সাম্‌নাসাম্‌নি কথাটা পেড়েছিলুম,—অতি নীচু গলায়,—কিন্তু সে আমাকে বাড়ী থেকে বের ক'রে দিলে। ততক্ষণ নন্দিনীসুন্দরী রান্নাঘরের এক কোণ আশ্রয় ক'রে দুই মুঠো দিয়ে দুই চোখ ঢেকে ফোঁস-ফোঁস কর্‌ছিল। আমি অক্ষমতায় ও লজ্জায় পাগলের মত হয়ে গিয়ে মনে মনে ভাবলুম-এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। এ প্রাণ রেখে আর কি লাভ, যখন জীবনের শ্রী ও আনন্দ যার হাতে, সে বেটা সয়তানের মত পাপিষ্ঠ ও ষাঁড়ের মত বলিষ্ঠ। আর যত কিছু চেষ্টা-চরিত্র করি না কেন, তার ফল হবে শুধু লোকের কাছে নিজেকে আরও বেশী অপদস্থ করা। তার চেয়ে জীবনের সঙ্গে শোধবোধ করাই ঢের সোজা কাজ ব'লে মনে হ'ল। আমার বন্দুকে এক গুলি ভর্‌লুম,—ও প্রেমিক মানুষের মনের মত একটি সুন্দর রাত্রি দেখে মাঠের উপর দিয়ে সোজা দৌড়তে লাগলুম। কাজ হাসিল কর্‌বার উদ্দেশ্যে বুড়িক্ষেতের মোড়ের কাছে রাস্তার ধারে বসলুম। কিন্তু বন্দুকটা মুঠোর মধ্যে সবে ঠিক ক'রে ধরেছি, এমন সময় প্রথমে শুনতে পেলুম, পরে দেখতে পেলুম যে, একটি গাড়ি সেদিকে আসছে। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল—বীরবাহু কর্ত্তার গাড়ি।—

'আমারও ভাল কথা মনে পড়ে গেল, যে মাসের ৭ই দিনেই সন্ধ্যাবেলা সে তাম্‌লি গিন্নীকে এক থলে টাকা দিতে যায়। ঘোড়াটা কদম কদম চলছিল। গাড়িটা আমার নাকের সামনে দিয়ে চলে গেল, আর আমি তাকে দেখলুম,—সামনের দিকে ঝুঁকে বসে আছে, সেই লম্বা প্রকাণ্ড শরীর—যা আমার চক্ষুশূল—সেই পাখীর ঠোঁটের মত নাক, সেই মস্ত ছুঁচোলো দাড়ি, সেই কালো বর্ব্বর মূর্ত্তি, যেন কাফ্রিদের রাজা। তখন যে পশু আমাকে এমনভাবে কোণঠেসা করে' দুর্দ্দশার শেষ সীমায় উপস্থিত করেছে, তাকে একেবারে হাতের কাছে বাগে পেয়ে আমার মাথায় এরকম খুন চড়ে' গেল যে, সে বল্‌বার নয়। আমি এক লাফে উঠে পড়ে' বন্দুকটা ঠিক তার রগে তাক করলুম, ছুঁড়লুম। টুঁ শব্দ না করে' সে যেন ঝাঁপিয়ে ঘোড়ার লেজের দিকে একটা বোঝার মত মুখ থুবড়ে পড়ল। ঘোড়াটা ভড়কে গিয়ে চার পা তুলে ছুট দিলে, ও মোড়ের কাছে রাস্তা ছেড়ে পঁচিশ ত্রিশ হাত দূরে লাভর্টাদদের যোৎজমার মধ্যিখানে গিয়ে পড়ল। আমি পালালুম—লম্বা লম্বা পা ফেলে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালালুম,—চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছে, আমাতে আর আমি নেই। পাগলের মত বেগে ছুট্‌তে ছুট্‌তে অনেকদূর এসে পড়বার পর তবে আমার হুঁস্ হতে লাগল যে কি করেছি। তখন যেন খোঁচা খেয়ে আরও মরিয়া হয়ে মাঠ ও বনের ভিতর দিয়ে দৌড় দিলুম। এই যে আমি সেকালের সব কথাই প্রায় ভুলে গেছি, কিন্তু আজও মনে আছে, যেন সেদিনকার কথা, কোন্ কোন্ ভয়ঙ্কর ঝোপ সে রাত্রিতে ডিঙিয়ে গেছি, কোন্ কোন্ মারাত্মক বাধা উল্টে ফেলে দিয়ে পথ করে' নিয়েছি। মনের মধ্যে যে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তাতে যৎকিঞ্চিৎ শান্তি ও শৃঙ্খলা এনেছিল শুধু এই বিশ্বাসে যে, বাড়ী গিয়ে আত্মহত্যা করব, এটা নিশ্চিত। কিন্তু অভিশপ্তের মত ছুটতে ছুটতে দেখি যে তাদের বাড়ীতে এসে পড়েছি—যে বাড়ী একজন এইমাত্র ছেড়ে গেছে, কিন্তু যেখানে আর একজন আছে। যখন এ বিষয়ে চেতনা হ'ল, তখন সে এত কাছে এসে পড়েছে যে তাকে আর একবার দেখবার চেষ্টা না করে' থাকতে পারলুম না। একবার তাকে দেখব—জানলার ভিতর দিয়ে—কেমন অপেক্ষা করে বসে আছে, আগুনের লাল আভায় অন্ধকারে আধ ফুটন্ত! দেওয়ালের বরাবর যত আস্তে পারি হাঁপাতে হাঁপাতে কাঁপতে কাঁপতে গেলুম; ফিরলুম।—আঃ—ঐ যে জানালা খোলা আছে, তার ধারে সে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে বসে আছে। সে বসে আছে যেন স্বর্গের দেবীর মত শাদা, আর আমার মনে হ'ল তার ভিতর থেকে কি একটা আলো ফুটে বেরুচ্ছে। সত্যি, সে হাসছিল। সে দেখতে পেলে আমি দু'হাত দূরে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, দেখে একটু চেঁচিয়ে উঠে হাতে তালি দিলে—আলো যেন আরও জ্বলে উঠল, হাসি যেন আরও ফুটে উঠল। সে বল্লে—

—ভগবান তোমাকে পাঠিয়েছেন। বাবা রাজি হয়েছেন। তিনি দেখলেন আমি কিরকম কষ্ট পাচ্ছি, তাই আমার দুঃখ দূর করবার জন্যে হঠাৎ হাঁ বল্লেন। এইমাত্র বেরিয়ে যাবার আগে তিনি হাঁ বল্লেন ও হাসলেন!'

আমি গলা দিয়ে একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত বের করতে পারলুম না। কে যেন আমার গলা টিপে ধরেছিল, চোখ কানা করে দিয়েছিল। জানি না কেমন করে পিছু হটলুম, কেমন করে' দেওয়াল টপ্‌কে তার দৃষ্টি এড়ালুম, কেমন করে' পালালুম। কেবল মনে আছে সেই মুহূর্ত্ত, যে সময় নিজের বাড়ী

পৌঁছলুম, —এক হাত না থেমে গাড়ীতে হাতড়াতে, আর এক হাতে বন্দুক আঁকড়ে ধরে, পৃথিবীতে এখন ঐ টুকু আমার একমাত্র সম্পত্তি। রান্নাঘরে ঢুকে, কোন আলো না জ্বালিয়েই, চোখ না খুলেই, আমার সাবেক টোটা খুঁজলুম, পেলুম, ও বন্দুকে পুরলুম। কিন্তু অদৃষ্টের এই ভীষণ সর্বনেশে অত্যাচার আমাকে একটু দিনে ফেলেছিল তাহা এমনি মারণ মারলে। যে আমাকে সে বাঁচিয়েছে সে খবরটা জানবারও অবসর দিলে না, যে আমার আত্মহত্যা করবার উৎসাহ পর্যন্ত নিভে গিয়েছিল। সেই জন্যই কি পাঁচটা কম্পিত হোল? সে যাই হোক, ঘটনা এই যে, শুধু গুলির তপ্ত খাপের আঁচটুকু আমার মুখে লাগলো, আর সে শুধু আমার একগোছা চুল উড়িয়ে নিয়ে গেল। চলতে চলতে মাটীতে পড়ে গেলুম, ভাবলুম মারা গেছি।

পরদিন বেলা দুকুরে ভরা দিনের আলোয় ঘুম ভাঙল। সব কথা মনে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। কান ভোঁ ভোঁ করছিল। কিন্তু বাইরে একটা কি মহা গোলমাল হচ্ছিল, লোক-জন পাড়া-পড়শীতে হৈ হৈ রৈ রৈ করছে। ঠিক সেই সময় জীবন অন্ধ দরজায় এক ধাক্কা মারলে। আমার চেয়ে সে তখন বছর চারেকের বড় ছিল, পরে বুড়ো রোগে মারা গেছে। আর এক ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। সেই ফাঁকের ভিতর দিয়ে তার ফোক্‌লা মুখ গলিয়ে সে চেঁচিয়ে বল্লে—

—বীরবাহু কর্ত্তাকে কাল রাস্তায় খুন করেছে।

—অ্যাঁ, অ্যাঁ, বলতে বলতে আমি পাতাস মেরে ঘরের শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেলুম।

—সেই দুই পাপ বেদের কাজ। তারা টাকার থলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই ধরা পড়ে গেছে। তারা সব কথা খুলে বলেছে। তারা গ্রাম থেকে ফেরবার মুখে গাড়ির উপর চড়াও হয়েছিল,—তার বাড়ী থেকে দু'পা। বুড়ো পিঠে দশ ঘা ছুরি খেয়েছে, সে একেবারে মরা কাঠ হয়ে গিয়েছিল, একগাদা রক্ত পড়েছিল। তার পর তারা তাকে গাড়ির গদির উপর ঠিক করে বসিয়ে দিয়ে, ঘোড়াকে আস্তে আস্তে যেতে দিলে। অনেকক্ষণ পরে, নিজে নিজেই হেঁটে, ঘোড়াটা কর্ত্তার বাড়ীতে গিয়ে পড়েছিল।

আমি তাহলে তাকে মেরে ফেলিনি। কারণ সে আগেই মরে গিয়েছিল। মড়াকে কেউ খুন করে না। এখন দেখছ, এ স্থলে অদৃষ্টের হাত ছিল বটে, কিন্তু সে রাত্তিরে তার ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

অদৃষ্ট

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ফরাসী ভাষা হইতে 'অদৃষ্ট' নামধেয় যে গল্পটি অনুবাদ করেছেন, তার মোদ্দা কথা এই যে, মানুষ পুরুষকারের বলে নিজে। মন্দ করতে চাইলেও দৈবের কৃপায় তার ফল ভাল হয়।

এ কিন্তু বিলেতী অদৃষ্ট।

এ দেশে মানুষ পুরুষকারের বলে নিজের ভাল করতে চাইলেও দৈবের গুণে তার ফল হয় মন্দ। এই দেশী অদৃষ্টের একটি নমুনা দিচ্ছি। এ গল্প সত্য, অর্থাৎ গল্প যে পরিমাণ সত্য হয় থাকে, সেই পরিমাণ সত্য, তার চাইতে একচুল বেশিও নয়, কমও নয়।

১

এ ঘটনা ঘটেছিল পাল বাবুদের বাড়ীতে। এই কলিকাতা সহরে বেলারাম পালের গলিতে বেলারাম পালের ভদ্রাসন কে না জানে? অত লম্বা চৌড়া আর অত মাথা উঁচু করা বাড়ী, যিনি চোখে কম দেখেন, তাঁর চোখও এড়িয়ে যায় না। দূর থেকে দেখতে সেটিকে সংস্কৃত কলেজ ব'লে ভুল হয়। সেই সার সার দোতলা সমান উঁচু করিন্থিয়ান থাম, সেই গড়ন, সেই মাপ, সেই রঙ, সেই ঢং। তবে কাছে এলে আর সন্দেহ থাকে না যে, এটি সরস্বতীর মন্দির নয়, লক্ষ্মীর আলয়। এর সুমুখে দীঘি নেই, আছে মাঠ, তাও আবার বড় নয়, ছোট, গোল নয়, চৌকোণ। এ ধাঁচের বাড়ী অবশ্য কলিকাতা সহরে বড় রাস্তায় ও গলিঘুঁচিতে আরও দশবিশটা মেলে, তবে বেলারামের বসতবাটীর সুমুখে যা আছে, তা কলিকাতা সহরের অপর কোনও বনেদী ঘরের ফটকের সামনে নেই। দুটি প্রকাণ্ড সিংহ—তাঁর সিংহদরজার দুধার আগলে ব'সে আছে। তার একটিকে যে আর সিংহ ব'লে চেনা যায় না, আর পাঁচজনে যাকে বলে, বিলকুল শেয়াল, তার কারণ—বয়েসের গুণে তার ইঁটের শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, আর তার চূণবালির জটা খসে' পড়েছে। কিন্তু যেটির পৃষ্ঠে সোয়ার হয়ে, নাকে নথ-পরা একটি পানওয়ালী সকাল সন্ধ্যে, পয়সায় পাঁচটি ক'রে খিলি বেচে, সেটিকে আজও সিংহ ব'লে চেনা যায়।

২

এই সিংহ দুটির দুর্দ্দশা থেকেই অনুমান করা যায় যে, পাল বাবুদেরও ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছে। বাইরে থেকে যা অনুমান করা যায়, বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

পালবাবুদের নাচঘরের জুড়ি নাচঘর কোম্পানির আমলে কলকাতায় আর একটিও ছিল না। মেজবাবু অর্থাৎ গোপালবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র, কলকাতার সব ব্রাহ্মণ কায়স্থ বড়মানুষদের উপর টেক্কা দিয়ে সে ঘর বিলেতি সজ্জায় সাজিয়েছিলেন। পাশে পাশে টাঙানো আর গায়ে গায়ে ঠেকানো ঝাড়ে ও দেয়ালগিরিতে সে ঘর চিকমিক করত, ঝকমক করত। আর এদের গায়ে যখন আলো পড়ত, তখন সব বালখিল্য ইন্দ্রধনু তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘরময় খেলা করে' বেড়াত। সে এক বাহার! তার পর সাটিনে ও মখমলে মোড়া কত যে কৌচ কুর্সি সে ঘরে জমায়েত হয়েছিল, তার আর লেখাজোখা নেই। কিন্তু আসলে দেখবার মত জিনিস ছিল সেই নাচঘরের সুমুখের বারান্দা। ইতালি থেকে আমদানি করা তুষারধবল, নবনীতসুকুমার মর্ম্মরপ্রস্তরে গঠিত, প্রমাণ সাইজের স্ত্রীমূর্ত্তি সকল সেই বারান্দার দুধারে সার বেঁধে দিবারাত্র দাঁড়িয়ে থাকত। তার প্রতিটি এক একটি বিচিত্র ভঙ্গীতে। তাদের মধ্যে কেউ বা স্নান করতে যাচ্ছে, কেউ বা সদ্য নেয়ে উঠেছে, কেউ বা সুমুখের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে রয়েছে, কেউ বা বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কেউ বা দুহাত তুলে মাথার চুল কপালের উপর চূড়ো করে বাঁধছে, কেউ বা বাঁহাতখানি ধনুকাকৃতি করে' সামনের দিকে ঝুলিয়ে রেখেছে, দেখলে মনে হত, স্বর্গের বেবাক অপ্সরা শাপভ্রষ্টা হয়ে মেজবাবুর বারান্দায় আশ্রয় নিয়েছেন। সামান্য লোকদের কথা ছেড়ে দিন, এ ভুল মহা মহা পণ্ডিতদেরও হত। তার প্রমাণ—পাল-প্রাসাদের সভাপণ্ডিত স্বয়ং বেদান্তবাগীশ মহাশয় একদিন বলেন যে—"মেজবাবুর দৌলতে মর্ত্ত্যে থেকেই স্বর্গ চোখে দেখলুম। এই পাষাণীরা যদি কারও স্পর্শে সব বেঁচে ওঠে, তাহলে এ পুরী সত্যসত্যই অমরপুরী হয়ে উঠে"—এ কথা শুনে মেজবাবুর জনৈক পেয়ারা-মোসাহেব বলে' ওঠেন যে—"তাহলে বাবুকে এক দিনেই ফতুর হতে হত শাড়ীর দাম দিতে।" এ উত্তরে চারিদিক-থেকে হাসির তুফান উঠল। এমন কি, মনে হল যে, ঐ সব পাষাণমূর্ত্তিদেরও মুখে চোখে যেন ঈষৎ সকৌতুক হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলা বাহুল্য যে, এই কলকাতা সহরের উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচীদের নাচে গানে প্রতি সন্ধ্যা এ নাচঘর সরগরম হয়ে উঠত। আর আজকের দিনে তার কি অবস্থা?—বলছি।

৩

এই নাচঘরে এখন আসবাবের ভিতর আছে একটি জরাজীর্ণ কাঠের অতিকায় লেখবার টেবিল আর খানকতক ভাঙা চৌকি। মেজেতে পাতা রয়েছে একখানি বাহাত্তর বৎসর বয়সের একদম রঙ-জলা এবং নানাস্থানে ইঁদুরে কাটা কারপেট। এ ঘরে এখন ম্যানেজার সাহেব দিনে আপিস করেন, আর রাত্তিরে সেখানে নর্ত্তন হয় ইঁদুরের—আর কীর্ত্তন হয় ছুঁচোর।

এই অবস্থা বিপর্য্যয়ের কারণ জানতে হলে পাল-বংশের উত্থান-পতনের ইতিহাস শোনা চাই। সে ইতিহাস আমি আপনাদের সময়ান্তরে শোনাব। কেন না, তা যেমন মনোহারী, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এ কথার ভিতর সে কথা ঢোকাতে চাইনে, এই জন্য যে, আমি জানি যে, উপন্যাসের সঙ্গে ইতিহাসের খিঁচুড়ি পাকালে ও দুয়ের রসই সমান কম হয়ে উঠে।

ফল কথা এই যে, পাল বাবুদের সম্পত্তি এখনও যথেষ্ট আছে; কিন্তু সরিকী বিবাদে তা উচ্ছন্ন যাবার পথে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ভাঙাঘর আবার গড়ে তোলবার ভার আপাতত এক জন কমন ম্যানেজারের হাতে পড়েছে। এই ভদ্রলোকের আসল নাম শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু লোকসমাজে তিনি চাটুয্যে-সাহেব বলেই পরিচিত। এর কারণ, যদিচ তিনি উকিল, ব্যারিষ্টার নন, তাহ'লেও তিনি ইংরাজী পোষাক পরেন তাও আবার সাহেবের দোকানে তৈরী। চাটুয্যে সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের আগাগোড়া পরীক্ষা একটানা ফার্ষ্ট ডিভিসনেই পাশ করে' এসেছেন, কিন্তু আদালতের পরীক্ষা তিনি থার্ড ডিভিসনেও পাশ করতে পারলেন না। এর কারণ, তার Literature এ taste ছিল, অন্তত এই কথা ত তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এ কথাটা মোটেই বুঝতে পারলেন না যে, পক্ষীরাজকে ছকড়ে জুতলে কেন না সে তা টানতে পারবে। তবে তিনি 'অতিশয় বুদ্ধিমতী' ছিলেন বলে' স্বামীর কথার কোনও প্রতিবাদ করেন নি, নিজের কপালের দোষ দিয়েই বসে' ছিলেন। এখন সাত বৎসর বিনে রোজগারে কেটে গেল, আর সেই সঙ্গে বয়েসও ত্রিশ পেরুলো, তখন তিনি হাইকোর্টের জজ হবার আশা ত্যাগ করে' মাসিক তিনশ' টাকা বেতনে পাল বাবুদের জমিদারী সম্পত্তির ম্যানেজারের পদ আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হলেন। এও দেশী অদৃষ্টের একটা ছোটখাটো উদাহরণ। বাঙালী উকীল না হয়ে সাহেব কৌঁসুলি হলে তিনি যে Bar এ ফেল করে Bench এ প্রমোশান পেতেন, সে কথা ত আপনারা সবাই জানেন। যার এক পয়সার প্র্যাকটিস নেই, সে যে একদম তিনশ' টাকা মাইনার কাজ পায়, এদেশের পক্ষে এই ত একটা মহা সৌভাগ্যের কথা। তাঁর কপাল ফিরলে কি করে জানেন?—চেহারা মুরব্বির জোরে। তিনি ছিলেন একাধারে বনেদী ঘরের ছেলে আর বড় মানুষের জামাই—অর্থাৎ তার যেমন সম্পত্তি ছিল না, তেমনি সহায় ছিল।

৪

বলা বাহুল্য, জমিদারী সম্বন্ধে চাটুয্যে সাহেবের জ্ঞান আইনের চাইতেও কম ছিল। তিনি প্রথম শ্রেণীতে B. L পাশ করেন, সুতরাং এ কথা আমরা মানতে বাধ্য যে, আইনের অন্তত পুঁথিগত বিদ্যে তাঁর পেটে নিশ্চয়ই ছিল; কিন্তু কি হাতে কলমে কি কাগজে কলমে তিনি জমিদারীর বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞান কখন অর্জ্জন করেন নি। তাই তিনি তাঁর দূর আত্মীয় ও পরম হিতৈষী জনৈক বড় জমিদারের কাছে এ ক্ষেত্রে কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে গেলেন। তিনি যে পরামর্শ দিলেন, তা অমূল্য। কেন না, তিনি ছিলেন একজন যেমন হুঁসিয়ার, তেমনি জবরদস্ত জমিদার। তার পর জমিদার মহাশয় ছিলেন অতি স্বল্পভাষী লোক। তাই তাঁর আদ্যোপান্ত উপদেশ এখানে উদ্ধৃত করে দিতে পারছি। জমিদারী শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মতামত— আমার বিশ্বাস, অনেকেরই কাজে লাগবে। তিনি বলিলেন,—"দেখ বাবাজি, যে পৈতৃক সম্পত্তির আয় ছিল সালিয়ানা দু' লক্ষ টাকা, আমার হাতে তা এখন চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং আমি যে জমিদারীর উন্নতি করতে জানি, এ কথা আমার শত্রুরাও স্বীকার করে;—আর দেশে আমার শত্রুরও অভাব নেই। জমিদারী

করার অর্থ কি জানো?—জমিদারের কারবার জমি নিয়ে নয়, মানুষ নিয়ে। ও হচ্ছে একরকম ঘোড়ায় চড়া। লোকে যদি বোঝে যে পিঠে সোয়ার চড়েছে, তা হলে তাকে আর ফেলার চেষ্টা করে না। প্রজা হচ্ছে জমিদারের পিঠ আর আমলা-ফয়লা তার মুখ। তাই বলছি প্রজাকে সায়েস্তা রাখতে হবে যদি পারো চাবুকে; কিন্তু চাবুক চালিয়ো না, তা হলেই সে পুচ্ছ নাড়বে আর অমনি তুমি ডিগবাজি খাবে। অপর পক্ষে আমলাদের বাগে রেখো রাশ-কড়া করে ধরে, কিন্তু সে রাশ প্রাণপণে টেনো না, তাহলেই তারা শির-পা করবে আর অমনি তুমি উল্টো ডিগবাজি খাবে। এক কথায়, তোমাকে একটু রাশভারী হতে হবে, আর একটু কড়া হতে হবে। বাবাজি, এ ত ওকালতি নয় যে, হাকিমের সুমুখে যত নুইয়ে পড়বে নেতিয়ে পড়বে, আর যত তার মন-যোগানে কথা কইবে, তত তোমার পসার বাড়বে। ওকালতি করার ও জমিদারী করার কায়দা ঠিক উল্টো উল্টো।"

এ কথা শুনে চাটুয্যে সাহেব আশ্বস্ত হলেন, মনে মনে ভাবলেন যে, যখন তিনি ওকালতীতে ফেল করেছেন, তখন তিনি নিশ্চয়ই জমিদারীতে পাস করবেন। কিন্তু তাঁর মনের ভিতর একটু ধোঁকাও রয়ে গেল। তিনি জানতেন যে তাঁর পক্ষে রাশ-ভারি হওয়া অসম্ভব। তাঁর চেহারা ছিল তার প্রতিকূল। তিনি ছিলেন একে মাথায় ছোট, তার উপর পাতলা, তার উপর ফর্সা, তার পর, তাঁর মুখটি ছিল স্ত্রীজাতির মুখমণ্ডলের ন্যায় কেশহীন, অবশ্য হাল-ফেশান অনুযায়ী দু'সন্ধ্যা স্বহস্তে ক্ষৌরকার্যের প্রসাদে। ফলে হঠাৎ দেখতে তাঁকে আঠারো বৎসরের ছোকরা বলে ভুল হত। রাশভারি হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব জেনে তিনি স্থির করলেন যে, তিনি গম্ভীর হবেন। মধুর অভাবে গুড়ে যেমন দেবার্চনার কাজ চলে যায়, তিনি ভাবলেন রাশভারি হতে না পেরে গম্ভীর হতে পারলেই জমিদারী শাসনের কাজ তেমনি সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

তার পর এও তিনি জানতেন যে, মানুষের উপর কড়া হওয়া তাঁর ধাতে ছিল না, এমন কি, মেয়েমানুষের উপরও তিনি কড়া হতে পারতেন না। তাই তিনি আপিসে নানারকম কড়া নিয়মের প্রচলন করলেন, এই বিশ্বাসে যে নিয়ম কড়া হলেই কাজেরও কড়াকড় হবে। তিনি আপিসে ঢুকেই হুকুম দিলেন যে, আমলাদের সব ঠিক এগারটায় আপিসে উপস্থিত হতে হবে, নইলে তাদের মাইনে কাটা যাবে। এ নিয়মের বিরুদ্ধে প্রথমে সেরেস্তায় একটু আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু চাটুয্যে-সাহেব তাতে এক চুলও টললেন না, আন্দোলন থেমে গেল।

৫

পাল-সেরেস্তার আমলাদের চিরকেলে অভ্যাস ছিল, বেলা বারোটা-সাড়েবারোটার সময় পান চিবুতে চিবুতে আপিসে আসা, তার পর এক ছিলিম গুড়ুক টেনে কাজে বসা। মুনিব যেখানে বিধবা আর নাবালক সেখানে কর্মচারীরা স্বাধীন ভাবে কাজ করতে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু তারা যখন দেখলে যে ঘড়ির কাঁটার উপর হাজির হলেই হুজুর খুসি থাকেন, তখন তারা একটু কষ্টকর

হলেও বেলা এগারটাতে হাজিরা সই করতে সুরু করে' দিলে। অভ্যাস বদলাতে আর কদিন লাগে?

মুস্কিল হল কিন্তু প্রাণবন্ধু দাসের। এ ব্যক্তি ছিল এ কাছারীর সব চাইতে পুরোনো আমলা। পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়েসের মধ্যে বিশবৎসরকাল সে এই ষ্টেটে একই পোষ্টে একই মাইনেতে—বরাবর কাজ করে' এসেছে। এত দিন যে তার চাকরী বজায় ছিল, তার কারণ—সে ছিল অতি সৎলোক, চুরি-চামারির দিক দিয়েও সে ঘেঁসত না। আর তার মাইনে যে কখনো বাড়েনি, তার কারণ, সে ছিল কাজে অতি ঢিলে।

প্রাণবন্ধু কাজ ভালবাসত না, পৃথিবীতে ভালবাসত শুধু দুটি জিনিস;—এক তার স্ত্রী, আর এক তামাক। এই ঐকান্তিক ভালবাসার প্রসাদে তার শরীরে দুটি অসাধারণ গুণ জন্মেছিল। বহুদিনের সাধনার ফলে তার হাতের লেখা হয়েছিল যে রকম চমৎকার, তার সাজা তামাকও হ'ত তেমনি চমৎকার।

আপিসে এসে তার নিত্য নিয়মিত কাজ ছিল—সর্ব্ব প্রথমে তার স্ত্রীকে একখানি চিঠি লেখা। গোড়ায় একসঙ্গে "প্রিয়ে, প্রিয়তরে প্রিয়তমে" এই সম্বোধন এবং শেষে "তোমারই প্রাণবন্ধু দাস" এই দ্ব্যর্থ-সূচক স্বাক্ষরের ভিতর, প্রতিদিন ধীরে সুস্থিরে ধরে ধরে পুরো চারপৃষ্ঠা চিঠি লিখতে লিখতে তার হাতের অক্ষর ছাপার অক্ষরের মত হয়ে উঠেছিল। এইজন্য আপিসের যত দলিলপত্র তাকেই লিখতে দেওয়া হত। এই অক্ষরের প্রসাদেই তার চাকরীর পরমায়ু অক্ষয় হয়েছিল।

তার পর প্রাণবন্ধু ঘণ্টায় ঘণ্টায় তামাক খেতেন—অবশ্য নিজ হাতে সেজে। পরের হাতে সাজা তামাক খাওয়া তাঁর পক্ষে তেমনি অসম্ভব ছিল—পরের হাতের লেখা চিঠি তাঁর স্ত্রীকে পাঠান তাঁর পক্ষে যেমন অসম্ভব ছিল। তিনি কল্কেয় প্রথমে বেশ ভাল করে ঠিকরে দিয়ে তার উপর তামাক এলো করে' সেজে, তার উপর আলগোছে মাটীর তাওয়া বসিয়ে, তার উপর আড় করে শুয়ে শুয়ে টিকে সাজিয়ে, তার পর সে টিকার মুখাগ্নি করে, হাতপাখা দিয়ে আস্তে আস্তে বাতাস করে ধীরে ধীরে তামাক ধরাতেন। আধ ঘণ্টা তদ্বিরের কম যে ধোঁয়া তার গোল হয়ে, নিটোল হয়ে, মোলায়েম হয়ে' নলের মুখ দিয়ে অনর্গল বেরোয় না, এ কথা যারা কখনো হুঁকো টেনেছে, তাদের মধ্যে কে না জানে?

এই চিঠি লেখা আর তামাক সাজার ফুরসতে প্রাণবন্ধু আপিসের কাজ করতেন এবং সে কাজও তিনি করতেন অন্যমনস্কভাবে। বলা বাহুল্য যে ফুরসৎ তাঁর কত কম ছিল। এর চিঠি ওর খামে পুরে দেওয়া তাঁর একটা রোগের মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এ সত্ত্বেও সমগ্র সেরেস্তা যে তাঁকে ছাড়তে চাইত না, সত্য কথা বলতে গেলে, তার আসল কারণ এই যে, প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় হুঁকোবরদারীর কাজ করত—আর সবাই জানত যে, অমন হুঁকোবরদার মুচিখোলার নবাব-বাড়ীতেও পাওয়া দুষ্কর। তার করস্পর্শে দা-কাটাও ভেলসা হয়ে, ধরসানও অম্বুরি হয়ে উঠত।

প্রাণবন্ধুর উপরে সকলে সন্তুষ্ট থাকলেও তিনি সকলের উপর সমান অসন্তুষ্ট ছিলেন। প্রথমত তাঁর ধারণা ছিল, তাঁর যে মাইনে বাড়ে না, সে তিনি চোর নন বলে। অথচ তাঁর বেতনবৃদ্ধির

বিশেষ দরকার ছিল। কেননা, তাঁর স্ত্রী কথায়-কথায় নূতন ছেলের মুখ দেখতেন। বংশবৃদ্ধির সঙ্গে বেতনবৃদ্ধির যে কোনই যোগাযোগ নেই, এই মোটা কথাটা প্রাণবন্ধুর মনে আর কিছুতেই বসল না। ফলে তাঁর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল হয়ে গেল যে, আপিসের কর্তৃকপক্ষেরা গুণের আদর মোটেই করেন না। সুতরাং তাঁর পক্ষে, কি কথায়, কি কাজে, কর্তৃপক্ষদের মন জুগিয়ে চলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। শেষটা দাঁড়াল এই, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করত, যা খুসি তাই বলত—কারও কোন পরোয়া রাখত না। কর্তৃপক্ষেরাও তার কাজে চোখ দিতেন না, তার কথায় কান দিতেন না; কেন না, তাঁরা ধরে' নিয়েছিলেন যে, প্রাণবন্ধু হচ্ছে ষ্টেটের একজন পেনসানভোগী।

৬

এই নূতন ম্যানেজারের হাতে পড়ে' প্রাণবন্ধু পড়ল মুস্কিলে। সে ভদ্রলোক বেলা এগারটার আপিসে আর কিছুতেই এসে জুটতে পারলে না। ফলে তাঁকে নিয়ে হুজুর পড়লেন আরও বেশি মুস্কিলে। নিত্য তার মাইনে কাটা গেলে বেচারা যায় মারা—আর না কাটলেও তাঁর নিয়ম যায় মারা। এই উভয় সঙ্কটে তিনি তাকে কর্ম হতে' অবসর দেওয়াই স্থির করলেন। এই মনস্থ করে তিনি তার কৈফিয়ৎ চাইলেন, তার পর তার জবাবদিহি শুনে চাটুয্যে-সাহেব অবাক হয়ে গেলেন। প্রাণবন্ধু তাঁর সুমুখে দাঁড়িয়ে অম্লানবদনে বললে—"হুজুর! সাড়ে আটটার আগে ঘুমই ভাঙে না। তার পর চা আর তামাক খেতেই ঘণ্টাখানেক কেটে যায়। তারপর নাওয়া খাওয়া করে, এক ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে কি আর এগারটার মধ্যে আপিসে পৌছান যায়?"

এ জবাব শুনে হুজুর যে অবাক হয়ে রইলেন, তার কারণ—তাঁর নিজেরও অভ্যাস ছিল ঐ সাড়ে আটটায় ঘুম থেকে ওঠা। তার পর চা-চুরুট খেতে তাঁরও সাড়ে নয়টা বেজে যেত। সুতরাং পায়ে হেঁটে আপিস আসতে হলে তিনি যে সেখানে এগারটার ভিতর পৌঁছুতে পারতেন না, এ কথা তিনি মুখে না স্বীকার করলেও মনে মনে অস্বীকার করতে পারলেন না। সেই অবধি প্রাণবন্ধুর দেরি করে' আপিসে আসাটা চাটুয্যে-সাহেব আর দেখেও দেখতেন না। ম্যানেজারের উপর প্রাণবন্ধুর এই প্রথম জিৎ হলো।

দুদিন না যেতেই, চাটুয্যে-সাহেব আবিষ্কার করলেন যে, প্রাণবন্ধুকে ডেকে কখনও তখুহুর্তে পাওয়া যায় না। যখনই ডাকেন, তখনই শোনেন যে প্রাণবন্ধু তামাক সাজছে। শেষটা বিরক্ত হয়ে একদিন তাকে ধমক দেবামাত্র প্রাণবন্ধু কাতর স্বরে বললে—"হুজুর, আমি গরীব মানুষ, তাই আমাকে তামাক খেতে হয়, আর তা নিজেই সেজে খেতে হয়। পয়সা থাকলে সিগারেট খেতুম, তা হলে আমাকে কাজ থেকে এক মুহূর্তের জন্যও উঠতে হ'ত না। বাঁ হাতে অষ্টপ্রহর সিগারেট ধরে ডানহাতে কলম চালাতুম।"

এবারও হুজুরকে চুপ করে' থাকতে হ'ল; কেন না, হুজুর নিজে অষ্ট প্রহর সিগারেট ফুঁকতেন, তার আর একদণ্ডও কামাই ছিল না। তিনি মনে ভাবলেন, প্রাণবন্ধু যা খুসি তাই করুক গে, তাকে আর তিনি ঘাঁটাবেন না।

কিন্তু প্রাণবন্ধুকে আবার তিনি ঘাঁটাতে চাইলেন। যে খাতাখানি নকল ক'রে একদিনেই শেষ করা উচিত ছিল, সেখানি প্রাণবন্ধু যখন দুদিনেও শেষ করতে পারলে না, তখন তিনি দেওয়ানজীর প্রতি এই দোষারোপ করলেন যে—তিনি আমাদের দিয়ে কাজ তুলে নিতে পারেন না। দেওয়ানজী উত্তর করলেন যে, তিনি সকলের কাছে কাজ আদায় করতে পারেন, কিন্তু পারেন না এক প্রাণবন্ধুর কাছ থেকে। যেহেতু, প্রাণবন্ধু আফিসে এসে আফিসের কাজ না করে নিত্য ঘণ্টাখানেক ধরে, আর কি ইনিয়ে বিনিয়ে লেখে।

প্রাণবন্ধুর তাতে আর তার কৈফিয়ৎ চাওয়া হল না। হুজুরের উপর দু'জবাব দিতে হওয়ায় তার সাহস বেশ বেড়ে গিয়েছিল। সে ম্যানেজার সাহেবের মুখের উপর এই জবাব করলে,—"হুজুর, আমার লেখার একটু হাত আছে, তাই লিখে লিখে হাত পাকাবার চেষ্টা করি।"

—"তোমার হাতের লেখা যথেষ্ট পাকা, তা আর বেশি পাকাবার দরকার নাই। আর যদি আরও পাকাতে হয় ত আপিসের লেখা লিখলেই হয়—বাজে লেখা কেন?"

—"হুজুর, হাতের লেখার কথা বলছিনে। আমার প্রাণে একটু কাব্যরস আছে, তাই প্রকাশ করবার জন্য লিখি। আর সে লেখা বাজে নয়। বড়মানুষের না হলে সে লেখা সব পুস্তক আকারে প্রকাশিত হত। আমাকে তাই ঘরের লোকের পড়ার জন্যই লিখতে হয়। যদি আমার পয়সা থাকত, তা হলে ত ছাইপাঁশ লিখেও দেশের মাসিকপত্র ভরিয়ে দিতে পারতুম।"

এ উত্তরে চাটুয্যে সাহেবের আঁতে ঘা লাগল। তিনি যে আপিসে বসে মাসিক পত্রিকার জন্য ইনিয়ে বিনিয়ে হরেক রকম বেনামা প্রবন্ধ লিখতেন আর সে লেখাকে সমালোচকেরা যে ছাই-পাঁশ বলত এ কথা আর যার কাছেই থাক—তাঁর কাছে ত আর অবিদিত ছিল না। তিনি আর ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারলেন না, চক্ষু রক্তবর্ণ করে বলে উঠলেন 'দেখো, তোমার হওয়া উচিত ছিল—" তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই প্রাণবন্ধু বলে ফেললে।—"বড়মানুষের জামাই। কিন্তু অদৃষ্ট ত আর সবারই সমান নয়।"

রোষে ক্ষোভে হুজুরের বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তিনি তাকে অঙ্গুলি দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন, প্রাণবন্ধু বিনা বাক্যব্যয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করল, আর এক ছিলিম ভাল করে তামাক সাজতে। প্রাণবন্ধুর কিন্তু হুজুরকে অপমান করবার কোনই অভিপ্রায় ছিল না। সে শুধু নিজের সাফাই হবার জন্য ওসব কথা বলেছিল। হিসেব করে কথা কওয়া অভ্যাস তার কস্মিনকালেও ছিল না, আর পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে একটা নূতন ভাষা শেখা মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

৭

চাটুয্যে-সাহেব দেওয়ানজীকে ডেকে বললেন—"প্রাণবন্ধুকে দিয়ে আর কাজ চলবে না, তার জায়গায় নূতন লোক বাহাল করা হোক।" নূতন লোক খুঁজে বার করবার জন্য দেওয়ানজী সাত দিনের সময় নিলেন। এর ভিতর তাঁর একটু গূঢ় মতলব ছিল। তিনি জানতেন প্রাণবন্ধুর বাবা কস্মিনকালেও
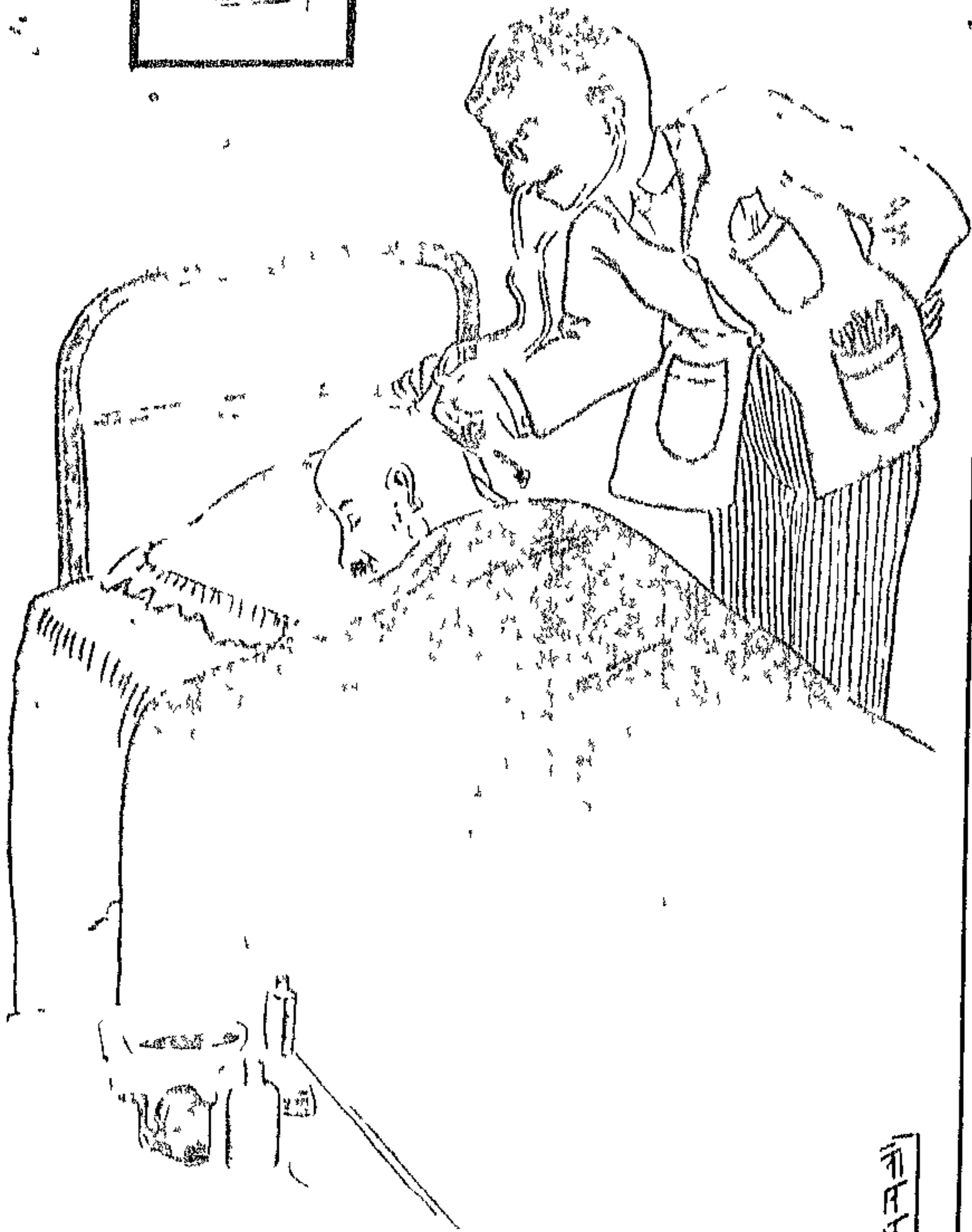
কাজ চলেনি, অতএব যে চাকরি তাঁর এতদিন বজায় ছিল আজ তা যাবার কোনও নূতন কারণ ঘটেনি। তা ছাড়া তিনি জানতেন যে হুজুরের রাগ হাওয়া না পেরুতেই চলে যাবে আর প্রাণবন্ধু সেরেস্তায় যে কাজ চিরকাল করে এসেছে ভবিষ্যতেও তাই করবে অর্থাৎ তামাক সাজা। ফলে প্রায় হয়েছিলও তাই, যেমন দিন যেতে লাগল তেমনি তাঁর রাগও পড়ে আসতে লাগল. তার পর সপ্তম দিনের সকাল বেলায় চাটুয্যে-সাহেব সে রাগের কণাটুকুই মনের কোনও কোণে খুঁজে পেলেন না। তিনি তাই ঠিক করলেন যে এবারকার জন্য প্রাণবন্ধুকে মাপ করবেন। তার পর তিনি যখন ধড়াচূড়া পরে আপিস যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর হাতে একখানি চিঠি দিয়ে বললেন,—“দেখ ত এ চিঠির অর্থ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।” সে চিঠি এই—

“প্রিয়ে প্রিয়তরে প্রিয়তমে,

আজ তোমাকে বড় চিঠি লিখতে পারব না, কেন না আর একখানি মস্ত চিঠি লিখতে হয়েছে। জানই ত, আমাদের ছোকরা হুজুর আমাকে এক নজরে দেখেন না, কেন না, আমি চোর নই অতএব খোসামুদেও নই। বরাবর দেখে আসছি পৃথিবীতে গুণের আদর কেউ করে না, সবাই খোসামোদের বশ। কিন্তু আমাদের এই নূতন ম্যানাজারের তুল্য খোসামোদ-প্রিয় লোক আমি ত আর কখন দেখিনি। একমাত্র খোসামোদের জোরে যত বেটা চোর তার প্রিয়পাত্র হয়েছে। যাদের হাতে তিনি পাকাকলা হয়েছেন তাদের মুখে হুজুরের সুখ্যাতি আর ধরে না। অমন রূপ অমন বুদ্ধি অমন বিদ্যে অমন মেজাজ একাধারে আর কোথায়ও পাওয়া যায় না। এ সব শুনে তিনিও মহা খুসি। প্রিয়-পাত্রেরা কাগজ সুমুখে ধরলেই অমনি তাতে চোখ বুজে সই করে বসেন। এর হাতে ষ্টেটটা আর কিছু দিন থাকলে নির্ঘাত গোল্লায় যাবে। জমিদারীর ম্যানেজারি করার অর্থ ইনি বোঝেন, গম্ভীর হয়ে কাঠের চৌকিতে কাঠের পুতুলের মত খাড়া হয়ে এগারটা পাঁচটা ঠায় বসে থাকা। ইনি ভাবেন ওতে তাঁকে রাশভারি দেখায়, কিন্তু আসলে কি রকম দেখায় জানো?—ঠিক একটি সাক্ষীগোপালের মত। ইনি আপিসে ঢুকেই একটি কড়া হুকুম প্রচার করেছেন যে কর্মচারীদের সব এগারটায় হাজির হতে হবে আর পাঁচটায় ছুটি। আমি অবশ্য এ হুকুম মানিনে। কেন না, যারা কাজের হিসেব জানে না তারাই ঘণ্টার হিসেব করে—সেই পুরুতদের মত যারা মন্ত্র পড়তে জানে না, কিন্তু ঘণ্টা নাড়তে জানে। খোসামুদেরা বলে হুজুরের কাজের কায়দা একদম সাহেবি। ইনি এতেই খুসি, কেন না এর মগজে সে বুদ্ধি নেই, যা থাকলে বুঝতেন যে লেফাপা-দুরস্ত হলে যদি কাজের লোক হওয়া যেত তাহলে পোষাক পরলেও সাহেব হওয়া যেত। এর বিশ্বাস ইনি সাহেব কিন্তু আসলে কি জানো। মেমসাহেব। অন্তত দূর থেকে দেখতে ত তাই মনে হয়। কেন জানো? এর পুরুষের চেহারাই নয়। এর রঙটা ফ্যাকাসে সাবান মেখে মেখে আর মুখে দাড়ি গোঁফের লেশমাত্র নেই কিন্তু আছে একমাথা চুল, তাও বাবার কটা। সে যাই হোক, একটু বিপদে পড়ে এই মেমসাহেবের মেমসাহেবকে একখানি চিঠি লিখতে বাধ্য হয়েছি। আজ দুদিন থেকে কানাঘুষোয় শুনছি যে হুজুর নাকি আমাকে বরখাস্ত করবেন। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না, আমার মত গুণী-লোকের চাকরীর ভাবনা নাই। তবে কিনা এখানে অনেকদিন আছি, তাই জায়গাটার উপর মায়া পড়ে গেছে। মুনিবকে কিছু বলা বৃথা,

কেন না তিনি মুখ থাকতেও বোবা, চোখ থাকতে কানা, কান থাকতে কালা। তাই তাঁকে কিছু না বলে যিনি এই মুনিবের মুনিব তাঁর অর্থাৎ তাঁর স্ত্রীর কাছে একখানি দরখাস্ত করেছি। শুনতে পাই আমাদের সাহেব মেমসাহেবের কথায় ওঠেন বসেন। এ কথায় বিশ্বাস হয়। এঁর স্ত্রী শুনেছি ভারি সুন্দরী প্রায় তোমার মতন, তার পর এই অপদার্থটা তার স্ত্রীর ভাগ্যেই খায়, শুধু ভাত খায় না, মদও খায় চুরুটও খায়। ইনি বিদ্যের মধ্যে শিখেছেন ঐ দুটি। সে যাই হোক এর গৃহিণীকে যে চিঠিখানি লিখেছি সে একটা পড়বার মত জিনিস। আমার দুঃখ রইল এই যে সেখানি তোমার কাছে পাঠাতে পারলুম না। তার ভিতর সমান অংশে বীররস আর করুণরস পুরে দিয়েছি আর তার ভাষা একদম সীতার বনবাসের। শুনতে পাই কর্তাঠাকুরাণী খুব ভাল লেখা পড়া জানেন। আমার এই চিঠি পড়েই তিনি বুঝতে পারবেন যে তাঁর স্বামী ও তোমার স্বামীর মধ্যে কে বড় গুণী। আশা করছি কাল তোমাকে দশটাকা মাইনে বাড়ার সুখবর দিতে পারব।"

তোমারই "প্রাণবন্ধু দাস।" ——

চাটুয্যে-সাহেব চিঠিখানি আদ্যোপান্ত পড়ে ঈষৎ কাষ্ঠহাসি হেসে স্ত্রীকে বললেন—"এ চিঠি তোমার নয়, ভুল খামে পোরা হয়েছে।" বলা বাহুল্য পত্রপাঠ—প্রাণবন্ধুর বরখাস্তের হুকুম বেরল। চাটুয্যে-সাহেব সব বরদাস্ত করতে পারতেন এবং স্ত্রীর কাছে অপদস্থ হওয়া ছাড়া। কেননা তিনিও ছিলেন প্রাণবন্ধুর জুড়ি-পত্নীগতপ্রাণ। এই চিঠিই হল প্রাণবন্ধু দাসের স্বীয় যথার্থ অদৃষ্টলিপি আর সে লিপি সংশোধনের কোনরূপ উপায় ছিল না, কেননা তা ছাপার অক্ষরে লেখা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শিব-সদাগর

[চণ্ডী নাটক]

স্থান—হলদিগুঁড়ির মাঠের চৌবাড়ী। কাল—বাদলার দিন।

পাত্র—তোতা, ভোঁতা, ইচিং, বিচিং, চাঁচি, মুচি, শিব-সদাগর, ভালুক।

—✱—

এপার-গঙ্গা-ওপার-গঙ্গায় বান ডেকেছে। হলদে পুঁথির পাতাখানির মতো হলদিগুঁড়ির মাঠ আধখানা ডুবে গিয়েছে। দূরে একখানা গাধা-বোট বাঁধা, পাঠশালার দাওয়ায় ব'সে পোড়োরা সেই দিকে চেয়ে আছে—আর বলাবলি করছে—

তোতা—(শ্লেটপেন্সিল চুষতে-চুষতে) গুরু এলেন না, পড়ার কি করা যায়?

চাঁচি—(মাথা-চুলকে) তা হ'লে গুরুর কাছে না হয় আমরাই যাই।

ইচিং—তোর তো খুব বিদ্যে, গুরু যদি বানে ভেসে যেয়ে থাকে!

বিচিং—গুরুর সঙ্গে আমরাও ডুব্‌বো নাকি?

তোতা—কি রে, চুপ রৈলি যে? এর একটা জবাব দেনা।

চাঁচি—গুরু কি নৌকা না জাহাজ যে, বানে ভেসে যাবে?

বিচিং—কেন ভাস্‌বে না? বানে গরু ভাসে, গ্রাম ভাসে—

মুচি—গোষ্ঠ গোয়াল পর্যান্ত ভাস্‌তে পারে, আর গুরু ভাসতে পারেন না, গুরু কি এতই ভারি?

ইচিং—সেবারের বানে লোহার পুলটা পর্য্যন্ত ভেসে গেল, দেখিসনি?

বিচিং—আর ধোপাদের কাপড়কাচা পাথরটা যে এই পাঠশালায় এসে ঠেকল, তার কি?

চাঁচি—তা তো দেখছি, কিন্তু গুরু তো কোনো ধাতু নন, তিনি পাথরও—

তোতা—তবে কি তিনি? ধাতু পাথর নন তো কি, বল না?—গো ধাতুতে রু-প্রত্যয় করলে গুরু হয় না?

চাঁচি—দাদা, মুগ্ধবোধ আমি পড়িনি তো।

তোতা—প্রস্তর গুরুভার, এটা তো পড়েছো? গুরু পাথর কি না, বলবার পূর্ব্বে সেটাও ভাবা উচিত ছিল। গুরু-বন্দনাটা মনে নেই কি?—

'বন্দি গুরু গুরু বলে তাঁহাকেই মানি
পিতলে করিয়ে সোনা সে পরশমণি।'

মুচি—ওড়ে না তো কি? ফঃ, এই দেখ উড়ছে।

তোতা—আর ওই দেখ পড়ছে।

ভোঁতা—পুঁথির পাতা, পড়াই তো ওর ধর্ম। হতো গাছের পাতা তো দেখাতেম প্রজাপতির মতো উড়ে চলতো।

তোতা—গুরু আসুন, বলে দেবো, পুঁথির পাতা ছিঁড়েছ।

সকলে—আজ আর গুরু এলো না, চল, কাপাসি-বনে গিয়ে পাতা ওড়াই গে।

তোতা—আর পাতা উড়িয়ে কাজ নেই, ছাতা আসছে চিনতে পারছ কার?

ভোঁতা—ও সেই ভাঙা ছাতাটা জাহাজের মতো ভেসে চলেছে,—গুরু তো নেই।

তোতা—ওই ছাতার মাস্তুল ধরে নিশেনের মত—ওটা তবে কি?

ভোঁতা—আর দেরী না, বসে যাও সব পুঁথি নিয়ে—'অ-য়ে' অজগর আসছে তেড়ে—

ইচিং—দুর্জন, দুর্ঘটনা—

বিচিং—বজ্র, বজ্রাঘাত—

চাঁচি মুচি—হৃজ পত্র—

ভোঁতা—গৃধ, এব—

তোতা—আপ্যায়িত—আপ্যায়িত—

ভোঁতা—রাখালদের বিদ্যালয় তাহাদের বাড়ী হইতে অনেক দূর—

তোতা—সুশীল বিদ্যালয় হইতে আসিয়া বলিল, 'মা, পক্ক আম দাও।'

ভোঁতা—মা তাহাকে টোকো আমড়া দিলেন।

তোতা—পিঞ্জর—মুদ্গর—বিদ্যালয়—

ইচিং—লাঞ্ছনা।

তোতা—পলাণ্ডু, শামলা, টি টিভ।

বিচিং—ঠাটা।

ভোঁতা—পলাণ্ডু পেয়াজ ভিন্ন আর কিছু নয়

তোতা—কাপথ, বন্যা, উদ্ঘাটন, উদ্ভব, অন্ন, আস্পাদ, পুষ্ক।

চাঁচি—অঙ্কুশ, বল্গা।

মুচি—কচ্ছপ।

ভোঁতা—কচ্ছপকে সোজা কথায় কাছিম বলে।

তোতা—চৈত্র, চক্র, বক্র, নক্র, তক্র, আস্ফালন।

মুচি—উল্টা, পাল্টা, ভেল্কি।

ইচিং—ইষ্টক, কাষ্ঠ, কষ্ট, চেষ্টা, বাষ্প, নিষ্ফল।

বিচিং—কাষ্ঠ তুলিয়া রাখ।

ভোঁতা—মা কাঠের জ্বালে ডাল রাঁধে।

তোতা— অদ্ভুত, অদ্ভুত, শব্দ।

ভোঁতা - যখন লিখবে, সহজ ভাষায় লিখবে। যাহা বলিবে, সহজ কথায় বলিবে।

তোতা- আমাদের দেশে এক প্রকার পক্ষী আছে, তাহারা যাহা পড়াও, ঠিক তাহাই পড়ে।

ভোঁতা— স্বর্গের পাখী এ দেশে পাওয়া যায় না।

ইচিং—ওই যে ছেলেটির কাঁধ হ'তে ঝুলি ঝুলিতেছে—

বিচিং—ও তো গুরু-মশায় নয়।

চাচি - তবে কে এ দাদা?

ভোঁতা—ছেলে ধরা না তো?

তোতা- রাম রাম গড়ুর গড়ুর।

চাচি, মুচি —ছাতাটা কিন্তু গুরু মশায়ের বটে!

ইচিং —দূর! দেখছিস্‌নে ওটা গোলপাতার, যেন বা তাদের নৌকোর পালের মতো ফুলে উঠেছে।

বিচিং—ওই দেখ, বানের জল ওকে তাড়া করে সঙ্গে আসছে,—গুরু না হয়ে যায় না।

ভোঁতা— শিব-সদাগর হলেও হতে পারে।

চাচি—দূর! শিব সদাগরের মস্ত দাড়ি, লম্বা জটা।

মুচি—এর চুল জটপাকানো, কিন্তু দাড়ি নেই দাদা!

তোতা—ষষ্ঠীবুড়ো না তো?

ইচিং—তা হতে পারে।

ভোঁতা—তোদের যেমন বুদ্ধি! ওই কি ষষ্ঠীর চেহারা? তিনি জোড় বেরালে চেপে আসেন, এর সঙ্গে দেখ না, কত বড় একটা কুকুর আসছে।

তোতা— নিশ্চয় যমদূত। না হ'লে কুকুর থাকে কেন?

ভোঁতা—আমারো তো পোষা কুকুর আছে, তবে বল, আমি যমদূত?

(নেপথ্যে কুকুর—হো, হো হো!)

মুচি— ভাই, শুনলি, মানুষটা ডাকলো কুকুরের মতো, আর মানুষের মতো হাঁক দিলে কুকুরটা

ভোঁতা— দূর, ওটা কুকুর নয়, সাদায় কালোয় ভালুক, ঠিক যেন মানুষের মতো চলছে!

(ভালুক সঙ্গে শিব-সদাগরের প্রবেশ।)

শিব—ছেলেরা সব পড়তে চল।

তোতা—গুরু কোথায়?

শিব—সে-গুরুটি বানে ভেসে গেছে, তার জায়গায় আমরা দুই গুরু এসেছি।

মুচি— তবে যে ভোঁতা-দাদা বল্লে, তুমি শিব-সদাগর?

শিব—আমার এক নাম শিব, এক নাম পণ্ডিত, এক নাম সদাগর, যে যে-নামে খুসি আমায় ডাকতে পারো, মানা নেই।

সকলে—পতিত-পাবন শিব সদাগর !

তোতা—সদাগরমহাশয়, ইহারা পুস্তকের পত্র লইয়া উড্ডীয়মান ব্যোমযান, না, না—আচ্ছাদ, না, না—পুষ্পক রথ, না, না তরী প্রস্তুত করিয়া ক্রীড়া করিতেছিল। আমি বারংবার ইহাদিগকে ও প্রকার আস্ফালন করিতে দেখিয়া নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া এ স্থান হইতে উত্থান করিয়াই আপনাকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি।

শিব—তোমার নাম কি হে ছোক্‌রা ?

তোতা—আমার নাম তোতারাম, পিতার নাম আত্মারাম, পিতামহের নাম নবীরাম, প্রপিতামহের নাম বলরাম, তস্য পিতা—

শিব—থাক্, সাধু-ভাষায় তোমার খুবই দখল জন্মেছে। এখন নতুন পাঠ নাও। ধর নিজের কান—চেঁচিয়ে বল—

এক হাত তোতারাম দুই হাত শিং।
নাচে তোতারাম তা ধিং ধিং॥

যাও সব ছেলেরা, বিদ্যালয়ের ছুটি, এখন হাডুডুডু খেলো গিয়ে। আমরা ততক্ষণ একটু ঘরের মধ্যে গিয়ে আরাম করি।

[প্রস্থান।

সকলে—ও ভাই। এক হাত তোতারাম, দুই হাত শিং,—হাডুডুডু দুই হাত শিং।

তোতা—আমি বামনের ছেলে, তোরা আমাকে গরু বলিস ?

ভালুক—চোপরও। ধর কান।

[প্রস্থান।

তোতা—এক হাত তোতারাম, দুই হাত শিং, আমি গরু আর তোরা রাখাল, চল্ আমাকে ঐ দিকে চরাবি, এখানে ভালুক আছে।

সকলে—হাডুডুডু—দুই হাত শিং, হাডুডুডু—নাচে তোতারাম, তা ডুডুডু—ধিনিধিন্।

তোতা—ছেলেধরাটা ঘরে গেছে এই বেলা সকলে মিলিয়া পলায়ন করি আইস।

(নেপথ্যে-ভালুক) আবার সাধু ভাষা ? চোপরও।

তোতা—হাডুডুডু, ভোঁতা, ঘুলঘুলি দিয়ে দেখ না ওরা কি করছে, হাডুডুডু।

ভোঁতা—আমার ঘাড়ে একটি বই মাথা নেই, তুমি দেখ না, তোমার তবু দুটো শিং আছে।

তোতা—ইচিং বিচিং, তোরা দেখ্ না, ভারি মজা দেখতে পাবি, আমি বলছি।

ইচিং বিচিং—তোতাদাদা, তুমি সদ্দার-পোড়ো থাকতে আমরা এগোবো কেন ?

মুচি—টাচিকে যদি সদ্দার করো তো আমি যেতে পারি।

তোতা—আচ্ছা, তাই হবে, যা তো এখন।

মুচি—(ঘুলঘুলিতে দেখে) ভাই, শিব-সদাগর সব রং-করা ছবির বই বার করেছে।

সকলে—দেখ না, আরো কি বার করে !

মুচি—(দেখে) ভাই, চারটে মাটীর ঢেলা রেখে ফুঁ দিলে আর অমনি সে চারটে সোজা হয়ে আগড়ুম-বাগড়ুম খেলতে লেগে গেল।

ভোঁতা—বলিস্ কি রে ? এবারের গুরু তো ভাল হয়েছে ! সর না তুই, দেখি। ওঃ, ভালুকটা ঝুমঝুমি বাজাচ্ছে,—একটা মস্ত ডিম বেরলো—একটা বাঁশী, একটা কাচের গোলা—

সকলে—আমাদের দেখতে দে না (ঠেলাঠেলি) টিনের মাছ, পেঁচি কড়ি, বনমানুষের হাড়, একটা কামান, টিয়ে পাখী—

তোতা—আমি দেখবো না বুঝি ? সব তোরা—(ঘরে কামানের শব্দ) গেছি রে গেছি !—

(পতন।)

শিব—তোতা, কি দেখছিলে ?

তোতা—আমি না, ভোঁতা।

ভোঁতা—আমরা সবাই দেখেছি, সব আগে দেখেছে মুচি, সব শেষে তোতা দাদা।

শিব—তা হ'লে মুচি হ'ল ফার্ষ্ট, ভোঁতা হ'ল সেকেণ্ড, ইচিং বিচিং হ'ল থার্ড, তোতা হ'ল লাষ্ট, চাঁচি হ'ল ফেল।

তোতা।—চল্লুম আমি বাবাকে ব'লে দিতে, কালই অন্য স্কুলে ভর্ত্তি হবো !

শিব—বানে পথ-ঘাট ভেসে গেছে, যাবে কেমন ক'রে ?

তোতা—বাবা পাল্কী হয় তো এতক্ষণ পাঠিয়েছে।

শিব—ইচিং বিচিং, তোমরা ?

ইচিং বিচিং—আমরা সাঁৎরে বাড়ী যাবো।

শিব—চাঁচি, মুচি, তোমরা ?

চাঁচি, মুচি—আমরা বাঁশ ধ'রে ভাসতে-ভাসতে যাবো।

ভোঁতা—আর আমি কাল যখন বান স'রে যাবে, তখন কাপড় জুতো পোঁটলা বেঁধে মাথায় নিয়ে বড় রাস্তা ঘুরে বাড়ী যাবো।

শিব—ভোঁতা, তোমার বাবা কি করেন

ভোঁতা—আমরা চাষা, চাষবাস করি।

শিব—ইচিং, বিচিং, চাঁচি, মুচি।

সকলে—আমরা কামার, কুমোর, হাড়ি, মুচি।

শিব—তোতা, তুমি ?

তোতা—আমরা সাতপুরুষ রাজার সভাপণ্ডিত, আর গোপাল ভাঁড়, কুলীন ব্রাহ্মণ এই সব ছোট জাতের সঙ্গে বসে ঘরে গিয়ে আমাদের চান্ করতে হয়, আমি লাষ্ট হয়ে ওদের নীচে পড়বো ? চল্লুম রাজার কাছে নালিশ করতে।

[প্রস্থান।

সাপুড়ে

ভোঁতা—এইবার রাজার পেয়াদা এসে ধরবে সবাইকে।

চাঁচি, মুচি—আমাদের মারবে!

ইচিং, বিচিং—এই বেলা পালাই চল।

ভোঁতা—পালাবি কোথায়? ফটিক-রাজার জমীদারী ছেড়ে কি যেতে পারবি?

মুচি—আমি যদি পাখী হতুম তো কোনো ভয় থাকত না।

চাঁচি—গাছ হয়ে গেলেও মন্দ হয় না।

ভোঁতা—পাখী ধরা ফাঁদে, গাছকাটা কুড়ুল নিয়ে রাজার লোক ব'সে নেই ভাবছিস

ইচিং—জলের মাছ হ'লে কেমন হয়?

বিচিং—মন্দ হয় না কিন্তু।

শিব—দেখছ তো ছিপ আর জাল।

ভোঁতা—সর্বনাশ, ডাঙায় উঠে খাবি খেয়ে মরতে হবে রে!

সকলে—পতিতপাবন, তুমি বল না, কি হওয়া যায়?

শিব—সব চেয়ে ভালো হয় মাটির ঢেলা হলে। কি বল?

চাঁচি—পায়ের তলায় যে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দেবে রাজার পেয়াদা।

শিব—হরিণ হয়ে দৌড় দিলে কেমন হয়?

মুচি—ডালকুত্তো ছেড়ে দেবে তাড়া করতে।

শিব—তা তো বটে, আচ্ছা, যদি শক্ত লোহা হয়ে যাওয়া যায়?

ইচিং—ও বাবা, তা হলে, হয় তো আমার বাবাকে দিয়েই রাজার পেয়াদা আমায় আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ি পিটিয়ে সোজা ক'রে দেবে।

চিচিং—সব চেয়ে ভালো হতো—যদি ক'জনেই রাজার পেয়াদা হয়ে পড়তে পারতুম। যা খুসি কর, কাউকে ভয় নেই।

শিব—তা তো হয় না, সবাই পেয়াদা হ'লে ধরাধরি চলে কি ক'রে?

ভোঁতা—তার চেয়ে আমরা পেয়াদা আর পেয়াদাগুলো আমরা হ'লে কেমন হয়?

শিব—মজা খুবই হয়; কিন্তু তা তো হতে চাইবে না পেয়াদারা। ইচ্ছে করে ধনে-প্রাণে কেন তারা মরতে যাবে—ভোঁতার সখ মেটাতে? সে হয় না। আমি আর-এক মতলব ঠাউরেছি—চল সবাই শিব-সদাগর হয়ে ভেসে পড়ি। বিদেশে-বিদেশে বাণিজ্য ক'রে বেড়াবো, পাল তুলে দেবো, জাহাজ দেখতে দেখতে সমুদ্রের ওপারে চ'লে যাবে, ফটিক-রাজার জমীদারী ছেড়ে একেবারে বাদশার মুলুকে।

ইচিং—সাঁৎরে যদি তারা ধরতে আসে?

শিব—হাঙরের পেটে যাবে।

বিচিং—পান্সী ক'রে যদি তাড়া করে?

শিব—শিব সদাগরের জাহাজের কাছে পান্সী? যেমন গঙ্গাসাগরে পড়বে, অমনি ভুস ক'রে ডুবে যাবে সব পান্সী—সায় সোয়ারী পেয়াদা।

ভোঁতা—তবে আর দেরী না, বাণিজ্যে যাওয়াই ঠিক।

শিব—বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী।

মুচি—ওই শোন, পেয়াদা হাঁকছে—হুকুমদার!

শিব—চটপট দাওয়াতে উঠে বসো। এইবার আমি বাঁশী দেবো। জাহাজ ছাড়বে। নাও সবাই দাঁড় ধর—গুরুমশায়ের বেত ক'গাছা দাঁড় হবে। ভোঁতা, তোমার গায়ের চাদরখানা মোটা আছে, দক্ষিণের খোঁটায় পাল ক'রে খাটিয়ে দাও, আমি হাল ধরছি। দেখো, ক'খানা দাঁড় ঠিক তালে-তালে পড়ে!

দিন রাত দিন রাত আসছে তরী দিনরাত।
দিন রাত দিন রাত যাচ্ছে তরী দিনরাত।
ঘাটে ঘাটে খেয়া দিয়ে
জমিয়ে পাড়ি যাত্রী নিয়ে,
খুলছে তরী ভিড়ছে তরী দেশবিদেশে
দিনরাত।

ভোঁতা—রান্নার যোগাড় কিছু তো নেওয়া হ'ল না। কাউকে বলেও যাওয়া হ'ল না।

শিব—রান্না ওই ভালুকটা করবে এখন। কিন্তু ব'লে যেতে গেলে জোয়ার থাকবে না—ভাটার টানে নৌকো কাদায় ঠেকবে।

ভোঁতা—তবে কাজ নেই, যেমন আছি, তেমনিই চলো, দাও পাল তুলে সকলে—জোরসে টান দাঁড়।

ভালুক—একটা নিশেন ত চাই, আমার এই ছালটা ঝুলিয়ে দাও মটকায়, জলে ভিজেছে, একটু রোদ-বাতাসে শুকিয়ে নেওয়া ভালো।

সকলে—ও ভাই দেখ!

ভোঁতা—ছালের ভিতর থেকে যেন আমাদের গুরুমশায় জোড়টি হয়ে বেরিয়ে আসছেন।

গুরু—কি রে ভোঁতা, দেখে ভয় করছে নাকি?

ভোঁতা—কিছু না।

ইচিং—ভারি হাসি পাচ্ছে—ফুঃ।

গুরু—"পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সকল কথায় দ্বন্দ্ব,
ছেলেতে ছেলেতে কথা সকল কথায় ছন্দ!"

ভোঁতা—শোলোক-মোলোক বাঁশের চোঙা।

ইচিং, বিচিং—ভাতটি খেলে পেটটি গোঙা!

চাচিং, মুচি—পানটি খেলে আরো মজা!

—হো হো হো (সকলের হাস্য)

গুরু—"বুড়োয় বুড়োয় সকল কথায় কাশি।
যুবোয় যুবোয় কথা সকল কথায় হাসি।"

শিব ধর গান, ছাড় জাহাজ, বাজাও টুমটুমি—
'বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর।'
শিব সদাগর তুইনি সোদর ভাই!
মেঘরাজারে তুইনি সোদর ভাই!
এক ঝড়ি মেঘ দেও, ভিজে ঘর যাই।
ভিজে ঘরে যাইতে চাইতে মায় না দিল ঠাঁই—
লাথি দিয়ে ফালাইয়া দিল কচু ক্ষেতের পাই।
দাদা কচু ক্ষেতের পাই॥
কচু ক্ষেতের পানি যেমন টলমল করে,
মার চক্ষের পানি ফুটি বুক ভাসিয়া পরে—
রে—রে—রে—রে।

সকলে মিলে দাঁড় টেনে গান গাইছে, বানে চৌবাড়ীর চালাখানা দুলতে দুলতে ভেসে চল্লো। দূরে পেয়াদা হাঁকলে—হুকুমদার!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছবি

১

এই কাহিনী যে সময়ের, তখনও ব্রহ্মদেশ ইংরাজের অধীনে আসে নাই। তখনও তাহার নিজের রাজারাণী ছিল, পাত্র-মিত্র ছিল, সৈন্য-সামন্ত ছিল; এখন পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের দেশ নিজেরাই শাসন করিত।

মান্দালে রাজধানী, কিন্তু রাজবংশের অনেকেই দেশের বিভিন্ন সহরে গিয়া বসবাস করিতেন। এমনিই বোধ হয় এক জন কেহ বহুকাল পূর্ব্বে পেগুর কোশ পাঁচেক দক্ষিণে ইমেদিন গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন।

তাঁদের প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রকাণ্ড বাগান, বিস্তর টাকা-কড়ি, মস্ত জমীদারী। এই সকলের মালিক যিনি, তাঁর একদিন যখন পরকালের ডাক পড়িল, তখন বন্ধুকে ডাকিয়া কহিলেন, বা-কো, ইচ্ছা ছিল তোমার ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিয়া যাইব। কিন্তু সে সময় হইল না। মা-শোয়ে রহিল, তাহাকে দেখিও।

ইহার বেশী বলার তিনি প্রয়োজন দেখিলেন না। বা-কো তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। একদিন তাহারও অনেক টাকার সম্পত্তি ছিল, শুধু ফয়ার মন্দির গড়াইয়া আর ভিক্ষু খাওয়াইয়া আজ কেবল সে সর্ব্বস্বান্ত নয়, ঋণগ্রস্ত। তথাপি এই লোকটিকেই তাঁহার যথাসর্ব্বস্বের সঙ্গে একমাত্র কন্যাকে নির্ভয়ে সঁপিয়া দিতে এই মুমূর্ষুর লেশমাত্র বাধিল না। বন্ধুকে চিনিয়া লইবার এত বড় সুযোগই তিনি এ জীবনে পাইয়াছিলেন। কিন্তু এ দায়িত্ব বা-কেকে অধিক দিন বহন করিতে হইল না। তাঁহারও ও-পারের শমন আসিয়া পৌঁছিল, এবং সেই মহামান্য পরওয়ানা মাথায় করিয়া বৃদ্ধ বৎসর না ঘুরিতেই যেখানের ভার সেখানেই ফেলিয়া রাখিয়া অজানার দিকে পাড়ি দিলেন।

এই ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র লোকটিকে গ্রামের লোক যত ভালবাসিত, শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত, তেমনি প্রচণ্ড আগ্রহে তাহারা ইহার মৃত্যু-উৎসব সুরু করিয়া দিল।

বা-কোর মৃতদেহ মালা-চন্দনে সজ্জিত হইয়া পালঙ্কে শয়ান রহিল, এবং নীচে খেলা-ধূলা, নৃত্য-গীত ও আহার-বিহারের স্রোত রাত্রি-দিন অবিরাম বহিতে লাগিল। মনে হইল, ইহার বুঝি আর শেষ হইবে না।

পিতৃ-শোকের এই উৎকট আনন্দ হইতে ক্ষণকালের জন্য কোন মতে পলাইয়া বা-থিন একটা নির্জ্জন গাছের তলায় বসিয়া কাঁদিতেছিল, হঠাৎ চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, মা-শোয়ে তাহার পিছনে

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে অঞ্চলের প্রান্ত দিয়া নিঃশব্দে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল, এবং পাশে বসিয়া তাহার ডান হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিল, বাবা মরিয়াছেন, কিন্তু তোমার মা-শোয়ে এখনও বাঁচিয়া আছে।

২

বা-থিন ছবি আঁকিত। তাহার শেষ ছবিখানি সে একজন সওদাগরকে দিয়া রাজার দরবারে পাঠাইয়া দিয়াছিল। রাজা ছবিখানি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং খুসী হইয়া রাজ-হস্তের বহুমূল্য অঙ্গুরী পুরস্কার করিয়াছেন।

আনন্দে মা-শোয়ের চোখে জল আসিল, সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে কহিল, বা-থিন, জগতে তুমি সকলের বড় চিত্রকর হইবে।

বা-থিন হাসিল, কহিল, বাবার ঋণ বোধ হয় পরিশোধ করিতে পারিব।

উত্তরাধিকারসূত্রে মা-শোয়েই এখন তাহার একমাত্র মহাজন। তাই এ কথায় সে সকলের চেয়ে বেশি লজ্জা পাইত। বলিল, তুমি বার বার এমন করিয়া খোঁটা দিলে আর আমি তোমার কাছে আসিব না।

বা-থিন চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু ঋণের দায়ে পিতার মুক্তি হইবে না, এত বড় বিপত্তির কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত অন্তরটা যেন শিহরিয়া উঠিল।

বা-থিনের পরিশ্রম আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে। জাতক হইতে একখানা নূতন ছবি আঁকিতেছিল, আজ সারাদিন মুখ তুলিয়া চাহে নাই।

মা-শোয়ে প্রত্যহ যেমন আসিত, আজিও তেমনি আসিয়াছিল। বা-থিনের শোবার ঘর, বসিবার ঘর, ছবি আঁকিবার ঘর সমস্ত নিজের হাতে সাজাইয়া গুছাইয়া দিয়া যাইত। চাকর-দাসীর উপর এ কাজটির ভার দিতে তাহার কিছুতেই সাহস হইত না।

সম্মুখে একখানা দর্পণ ছিল, তাহারই উপর বা-থিনের ছায়া পড়িয়াছিল। মা-শোয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, বা-থিন, তুমি আমাদের মত মেয়েমানুষ হইলে এতদিনে দেশের রাণী হইতে পারিতে।

বা-থিন মুখ তুলিয়া হাসি-মুখে বলিল, কেন বল ত?

রাজা তোমাকে বিবাহ করিয়া সিংহাসনে লইয়া যাইতেন। তাঁর অনেক রাণী, কিন্তু এমন রঙ, এমন চুল, এমন মুখ কি তাঁদের কারও আছে?

এই বলিয়া সে কাজে মন দিল, কিন্তু বা-থিনের মনে পড়িতে লাগিল মান্দালেতে সে যখন ছবি-আঁকা শিখিতেছিল, তখনও এমনি কথা তাহাকে মাঝে মাঝে শুনিতে হইত।

তখন সে হাসিয়া কহিল, কিন্তু রূপ চুরি করার উপায় থাকিলে তুমি বোধ হয় আমাকে ফাঁকি দিয়া এতদিনে রাজার বামে গিয়া বসিতে।

মা-শোয়ে এই অভিযোগের কোন উত্তর দিল না, কেবল মনে মনে বলিল, তুমি নারীর মত দুর্বল, নারীর মত কোমল, তাদের মতই সুন্দর,—তোমার রূপের সীমা নাই।

এই রূপের কাছে সে আপনাকে বড় ছোট মনে করিত।

৩

বসন্তের প্রারম্ভে এই ইমোদন গ্রামে প্রতি বৎসর অত্যন্ত সমারোহের সহিত ঘোড়-দৌড় হইত। আজ সেই উপলক্ষে গ্রামের মাঠে বড় জনসমাগম হইয়াছিল।

মা-শোয়ে ধীরে ধীরে বা-থিনের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সে একমনে ছবি আঁকিতেছিল, তাই তাহার পদশব্দ শুনিতে পাইল না।

মা-শোয়ে কহিল, আমি আসিয়াছি, ফিরিয়া দেখ। বা-থিন চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ এত সাজসজ্জা কিসের?

বাঃ, তোমার বুঝি মনে নাই, আজ আমাদের ঘোড়-দৌড়? যে জয়ী হইবে, সে তো আজ আমাকেই মালা দিবে!

কই, তা তো শুনি নাই, বলিয়া বা-থিন তাহার তুলিটা পুনরায় তুলিয়া লইতে যাইতেছিল, মা-শোয়ে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, না শুনিয়াছ বেশ-বেশ। কিন্তু তুমি ওঠ,—আর কত দেরী করিবে?

এই দুটিতে প্রায় সমবয়সী,—হয় ত বা বা-থিন দুই চারি মাসের বড় হইতেও পারে, কিন্তু শিশুকাল হইতে এমনি করিয়াই তাহারা এই উনিশটা বছর কাটাইয়া দিয়াছে। খেলা করিয়াছে, বিবাদ করিয়াছে, মারপিট করিয়াছে,—আর ভালবাসিয়াছে।

সম্মুখের প্রকাণ্ড মুকুরে দুটি মুখ তখন দুটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বা-থিন দেখাইয়া কহিল, ঐ দেখ—

মা-শোয়ে কিছুক্ষণ নীরবে ঐ দুটি ছবির পানে অতৃপ্তনয়নে চাহিয়া রহিল। অকস্মাৎ আজ প্রথম তাহার মনে হইল, সেও বড় সুন্দর। আবেশে দুই চক্ষু তাহার মুদিয়া আসিল, চুপি-চুপি, কানে-কানে বলিল, আমি যেন চাঁদের কলঙ্ক। বা-থিন আরও কাছে তাহার মুখখানি টানিয়া আনিয়া বলিল, না, তুমি চাঁদের কলঙ্ক নও, তুমি কাহারো কলঙ্ক নও,—তুমি চাঁদের কৌমুদীটি। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ।

কিন্তু নয়ন মেলিতে মা-শোয়ের সাহস হইল না, সে তেমনি দু'চক্ষু মুদিয়া রহিল।

হয় ত এমনি করিয়াই বহুক্ষণ কাটিত, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড নর-নারীর দল নাচিয়া গাহিয়া সুমুখের পথ দিয়া উৎসবে যোগ দিতে চলিয়াছিল। মা-শোয়ে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল, সময় হইয়াছে।

কিন্তু আমার যাওয়া যে একেবারে অসম্ভব মা-শোয়ে।

কেন ?

এই ছবিখানি পাঁচ দিনে শেষ করিয়া দিব চুক্তি করিয়াছি।

না দিলে ?

সে মান্দালে চলিয়া যাইবে, সুতরাং ছবিও লইবে না, টাকাও দিবে না।

টাকার উল্লেখে মা-শোয়ে কষ্ট পাইত, লজ্জাবোধ করিত। রাগ করিয়া বলিল, কিন্তু তা' বলিয়া ত তোমাকে এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতে দিতে পারি না।

বা-থিন এ কথার কোন উত্তর দিল না। পিতৃঋণ স্মরণ করিয়া তাহার মুখের উপর যে ম্লান ছায়া পড়িল, তাহা আর একজনের দৃষ্টি এড়াইল না।

কহিল, আমাকে বিক্রী করিও, আমি দ্বিগুণ দাম দিব।

বা-থিনের তাহাতে সন্দেহ ছিল না, হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু করিবে কি ?

মা-শোয়ে গলার বহুমূল্য হার দেখাইয়া বলিল, ইহাতে যতগুলি মুক্তা, যতগুলি চুনি আছে, সবগুলি দিয়া ছবিটিকে বাঁধাইব, তার পরে শোবার ঘরে আমার চোখের উপর টাঙাইয়া রাখিব।

তার পরে ?

তার পরে যে দিন রাত্রে খুব বড় চাঁদ উঠিবে, আর খোলা জানালার ভিতর দিয়া তার জ্যোৎস্নার আলো তোমার ঘুমন্ত মুখের উপর খেলা করিতে থাকিবে—

তার পরে ?

তার পরে তোমার ঘুম ভাঙিয়ে—

কথাটা শেষ হইতে পাইল না। নীচে মা-শোয়ের গরুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার গাড়োয়ানের উচ্চকণ্ঠের আহ্বান শোনা গেল।

বা-থিন ব্যস্ত হইয়া কহিল, তার পরের কথা পরে শুনিব, কিন্তু আর নয়। তোমার সময় হইয়া গেছে,—শীঘ্র যাও।

কিন্তু সময় বহিয়া যাইবার কোন লক্ষণ মা-শোয়ের আচরণে দেখা গেল না। কারণ, সে আরও ভাল করিয়া বসিয়া কহিল, আমার শরীর খারাপ বোধ হইতেছে, আমি যাবো না।

যাবে না ? কথা দিয়াছ, সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে, তা জানো ?

মা-শোয়ে প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, তা করুক। চুক্তি-ভঙ্গের অত লজ্জা আমার নাই,—আমি যাবো না।

ছিঃ—

তবে তুমিও চল ?

পারিলে নিশ্চয় যাইতাম, কিন্তু, তাই বলিয়া আমার জন্য তোমাকে আমি সত্য ভঙ্গ করিতে দিব না। আর দেরি করিও না, যাও।

তাহার গম্ভীর মুখ ও শান্ত দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনিয়া মা-শোয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। অভিমানে মুখখানি

ম্লান হাসিয়া কহিল, তুমি নিজের অবিশ্বাস দিয়া আমাকে দূরে ঠেলিতে চাও। দূরে আমি হইতেছি, কিন্তু আর কখনও তোমার কাছে আসিব না।

এক মুহূর্তে রাখিলের কর্কশ দৃঢ়তা স্নেহের জলে গলিয়া গেল। সে তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, এতবড় প্রতিজ্ঞাটা করিয়া বসিও না মা-শোয়ে, আমি জানি, ইহার শেষ কি হইবে। কিন্তু আর ত বিলম্ব করা চলে না।

মা-শোয়ে তেমনি বিমর্ষ মুখেই উত্তর দিল,—আমি না আসিলে পাল-পরা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বিষয়ে তোমার যে দশা হইবে, সে আমি সহিতে পারিব না জানি বলিয়াই আমাকে তুমি তাড়াইতে পারিলে।

এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

৪

[illegible] অপরাহ্ণ বেলায় মা-শোয়ের ফুল-বাঁধানো 'ময়ূরপঙ্খী' গো-যান যখন ময়দানে আসিয়া পৌঁছিল, তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রচণ্ড কলরবে কোলাহল করিয়া উঠিল।

সে যুবতী, সে সুন্দরী, সে অবিবাহিতা, এবং বিপুল ধনের অধিকারিণী। মানবের যৌবন-রাজ্যে তাহার স্থান অতি উচ্চে। তাই এখানেও বহুমানের আসনটি তাহারই জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। সে আজ পুষ্পমালা বিতরণ করিবে। তাহার পরে যে ভাগ্যবান্ এই রমণীর শিরে জয়মাল্যটি সর্বাগ্রে পরাইয়া দিতে পারিবে, তাহার অদৃষ্ট আজ যেন জগতে হিংসা করিবার একমাত্র বস্তু।

সজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে রক্তবর্ণ পোষাকে সওয়ারগণ উৎসাহ ও চাঞ্চল্যের আবেগ কষ্টে সংযত করিয়াছিল। দেখিলে মনে হয়, আজ সংসারে তাহাদের অসাধ্য কিছু নাই।

ক্রমশঃ সময় আসন্ন হইয়া আসিল, এবং যে কয় জন অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে আজ উদ্যত, তাহারা সার দিয়া দাঁড়াইল, এবং ক্ষণেক পরেই ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দিক্-বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া এই কয় জন ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

ইহা বাজি, ইহা যুদ্ধের অংশ। মা-শোয়ের পিতৃপিতামহগণ সকলেই যুদ্ধব্যবসায়ী, ইহার উন্মত্ত বেগ নারী হইলেও তাহার ধমনীতে বহমান ছিল। যে জয়ী হইবে, তাহাকে সমস্ত হৃদয় দিয়া সংবর্দ্ধনা না করিবার সাধ্য তাহার ছিল না।

তাই ভিন্ন গ্রামবাসী এক অপরিচিত যুবক যখন আরক্ত-দেহে, কম্পিত-মুখে, ক্লেদ-সিক্ত হস্তে শিরে তাহার জয়মাল্য পরাইয়া দিল, তখন তাহার আগ্রহের আতিশয্য অনেক সম্ভ্রান্ত রমণীর চক্ষেই কটু বলিয়া ঠেকিল।

ফিরিবার পথে সে তাহাকে আপনার পাশে গাড়ীতে স্থান দিল, এবং সস্নেহ কণ্ঠে কহিল, আপনার জন্য আমি বড় ভয় পাইয়াছিলাম। একবার এমনও মনে হইয়াছিল, অত বড় উঁচু প্রাচীর, কোনরূপে যদি কোথাও পা ঠেকিয়া যায়!

যুবক বিনয়ে ঘাড় হেঁট করিল। কিন্তু এত অসমসাহসী বলিষ্ঠ যৌবনের সহিত মা-শোয়ে মনে-মনে তাহার সেই দুর্বল, কোমল ও সর্ববিষয়ে অপটু চিত্রকরের সহিত তুলনা না করিয়া পারিল না।

এই যুবকটির নাম পো থিন। কথায় কথায় পরিচয় হইলে জানা গেল, ইনিও উচ্চবংশীয়, ইনিও ধনী এবং তাহাদেরই দূর-আত্মীয়।

মা-শোয়ে আজ অনেককেই তাহার প্রাসাদে সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহারা এবং আরও বহুলোক ভিড় করিয়া গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছিল। আনন্দের আগ্রহে, তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্যোত্থিত ধূলার মেঘে ও সঙ্গীতের অসহ্য নিনাদে সন্ধ্যার আকাশ তখন একেবারে আচ্ছন্ন অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

এই ভয়ঙ্কর জনতা যখন তাহার বাটীর সুমুখ দিয়া অগ্রসর হইয়া গেল, তখন ক্ষণকালের নিমিত্ত বা-থিন তাহার কাজ ফেলিয়া জানালায় আসিয়া নীরবে চাহিয়া রহিল।

৫

সান্ধ্য-ভোজের প্রসঙ্গে পরদিন মা-শোয়ে বা-থিনকে কহিল, কাল সন্ধ্যাটা বড় আনন্দে কাটিল। অনেকেই দয়া করিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু তোমার সময় ছিল না বলিয়া তোমাকে ডাকি নাই।

সেই ছবিটা সে প্রাণপণে শেষ করিতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, ভালই করিয়াছিলে। এই বলিয়া সে কাজ করিতে লাগিল।

বিস্ময়ে মা-শোয়ে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। কথার ভারে তাহার পেট ফুলিতেছিল, কাল বা-থিন কাজের চাপে উৎসবে যোগ দিতে পারে নাই, তাই আজ অনেকক্ষণ ধরিয়া অনেক গল্প করিবে মনে করিয়াই সে আসিয়াছিল, কিন্তু সমস্তই উল্টা রকমের হইয়া গেল। কেবল একা একা প্রলাপ চলিতে পারে, কিন্তু আলাপের কাজ চলে না, তাই সে শুধু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, কিছুতেই অপর পক্ষের প্রবল ঔদাস্য ও গভীর নীরবতার রুদ্ধ দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে আজ ভরসা করিল না। প্রতিদিন যে সকল ছোটখাটো কাজগুলি সে করিয়া যায়, আজ সেগুলিও পড়িয়া রহিল,—কিছুতেই হাত দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল,—একবার বা-থিন মুখ তুলিল না, একবার একটা প্রশ্ন করিল না। কালকের অতবড় ব্যাপারের প্রতিও তাহার যেমন লেশমাত্র কৌতূহল নাই, কাজের ফাঁকে হাঁফ ফেলিবারও তাহার তেমনি অবসর নাই।

বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া থাকিয়া অবশেষে সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আজ আসি, আসি।

বা-থিন ছবির উপর চোখ রাখিয়াই বলিল, এসো।

যাবার সময় মা-শোয়ের মনে হইল, যেন সে এই লোকটির অন্তরের কথাটা বুঝিয়াছে। জিজ্ঞাসা করে, একবার সে ইচ্ছাও হইল বটে, কিন্তু মুখ ফুটিতে পারিল না, নীরবেই বাহির হইয়া গেল।

বাটীতে পা দিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। গত রাত্রির আনন্দ-উৎসবের জন্য সে ধন্যবাদ দিতে আসিয়াছিল। অতিথিকে মা-শোয়ে যত্ন করিয়া বসাইল।

লোকটা প্রথমে মা-শোয়ের ঐশ্বর্য্যের কথা তুলিল, পরে তাহার বংশের কথা, তাহার পিতার খ্যাতির কথা, তাঁহার রাজদ্বারে সম্মানের কথা, এমনি কত কি সে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল।

এ সকল কতক বা সে শুনিল, কতক বা তাহার অন্যমনস্ক কানে পৌঁছিল না। কিন্তু লোকটা শুধু বলিষ্ঠ এবং অতি সাহসী ঘোড়-সওয়ারই নয়, সে অত্যন্ত ধূর্ত্ত। মা-শোয়ের এই ঔদাসীন্য তাহার অগোচর রহিল না। সে মান্দালের রাজ-পরিবারের প্রসঙ্গ তুলিয়া অবশেষে যখন সৌন্দর্য্যের আলোচনা সুরু করিল এবং কৃত্রিম সারল্যে পরিপূর্ণ হইয়া এই রমণীকে লক্ষ্য এবং উপলক্ষ্য করিয়া বারংবার তাহার রূপ ও যৌবনের ইঙ্গিত করিতে লাগিল, তখন তাহার মনে মনে অতিশয় লজ্জা করিতে লাগিল বটে, কিন্তু একটা অপরূপ আনন্দ ও গৌরব অনুভব না করিয়াও থাকিতে পারিল না।

এবং আলাপ শেষ হইলে পো-থিন যখন বিদায় গ্রহণ করিল, তখন আজিকার রাত্রির জন্যও সে আহারের নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।

কিন্তু চলিয়া গেলে তাহার কথাগুলা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া মা-শোয়ের সমস্ত মন ছোট এবং গ্লানিতে ভরিয়া উঠিল, এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলার জন্য বিরক্তি ও বিতৃষ্ণার অবধি রহিল না। সে তাড়াতাড়ি আরও জন কয়েক বন্ধু-বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া চাকর দিয়া চিঠি পাঠাইয়া দিল। অতিথিরা যথাসময়েই হাজির হইলেন, এবং আজও অনেক হাসি-তামাসা, অনেক গল্প, অনেক নৃত্য-গীতের মধ্যে যখন খাওয়া-দাওয়া শেষ হইল, তখন রাত্রি আর বড় বাকি নাই।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া সে শুইতে গেল; কিন্তু চোখে ঘুম আসিল না। কিন্তু বিস্ময় এই যে, যাহা লইয়া তাহার এতক্ষণ এমন করিয়া কাটিল, তাহার একটা কথাও আর মনে আসিল না। সে সকল যেন কত যুগের পুরাণো অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—এমনি শুষ্ক, এমনি বিরস। তাহার কেবলি মনে পড়িতে লাগিল আর একটা লোককে, যে তাহারই উদ্যান-প্রান্তের একটা নির্জ্জন গৃহে এখন নির্ব্বিঘ্নে আছে,—আজিকার এত বড় মাতা-মাতির লেশমাত্রও যাহার কানে যাইবার হয় ত এতটুকু পথও কোথাও খুঁজিয়া পায় নাই।

৬

চিরদিনের অভ্যাস প্রভাত হইতেই মা-শোয়েকে টানিতে লাগিল। আবার সে গিয়া বা-থিনের ঘরে আসিয়া বসিল। প্রতিদিনের মত আজিও সে কেবল একটা 'এসো' বলিয়াই তাহার সহজ অভ্যর্থনা শেষ করিয়া কাজে মন দিল, কিন্তু কাছে বসিয়াও আর এক জনের আজ কেবলি মনে হইতে লাগিল, ওই কর্মনিরত নীরব লোকটি নীরবেই যেন বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত মা-শোয়ে কথা খুঁজিয়া পাইল না। তার পরে সঙ্কোচ কাটাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমার আর বাকি কত ?

অনেক।

তবে, এই দু'দিন ধরিয়া কি করিলে ?

বা-থিন ইহার জবাব না দিয়া চুরুটের বাক্সটা তাহার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, এই মদের গন্ধটা আমি সইতে পারি না।

মা-শোয়ে এই ইঙ্গিত বুঝিল। জ্বলিয়া উঠিয়া হাত দিয়া বাক্সটা সজোরে ঠেলিয়া দিয়া বলিল, আমি সকালবেলা চুরুট খাই না,—চুরুট দিয়া গন্ধ ঢাকিবার কাজও করি নাই,— আমি ছোট লোকের মেয়ে নই।

বা-থিন মুখ তুলিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল, হয় ত তোমার জামা-কাপড়ে কোনরূপে লাগিয়াছে। মদের গন্ধটা আমি বানাইয়া বলি নাই।

মা-শোয়ে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তুমি যেমন নীচ, তেমনি হিংসুক, তাই আমাকে বিনা দোষে অপমান করিলে। আচ্ছা, তাই ভাল, আমার জামা-কাপড় তোমার ঘর থেকে আমি চিরকালের জন্য সরাইয়া লইয়া যাইতেছি। এই বলিয়া সে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতবেগে ঘর ছাড়িয়া যাইতেছিল, বা-থিন পিছনে ডাকিয়া তেমনি সংযত স্বরে বলিল, আমাকে নীচ ও হিংসুক কেহ কখনও বলে নাই, তুমি হঠাৎ অধঃ-পথে যাইতে উদ্যত হইয়াছ বলিয়াই সাবধান করিয়াছি।

মা-শোয়ে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, অধঃ-পথে কি করিয়া গেলাম ?

তাই আমার মনে হয়।

আচ্ছা, এই মন লইয়াই থাকো, কিন্তু যাহার পিতা আশীর্ব্বাদ রাখিয়া গেছেন, সন্তানের জন্য অভি-শাপ রাখিয়া যান নাই, তাহার সঙ্গে তোমার মনের মিল হইবে না।

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল, কিন্তু বা-থিন স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কেহ যে কোন কারণেই

কাহাকে এমন মর্মান্তিক করিয়া বিঁধিতে পারে, এত ভালবাসা একদিনেই যে এত বড় বিষ হইয়া উঠিতে পারে, ইহা সে ভাবিতেও পারিত না।

মা-শোয়ে বাটী আসিয়াই দেখিল, পো-থিন বসিয়া আছে। সে সসম্মে উঠিয়া দাঁড়াইয়া অত্যন্ত মধুর করিয়া একটু হাস্য করিল।

হাসি দেখিয়া মা-শোয়ের দুই ভ্রূ বোধ করি অজ্ঞাতসারেই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, আপনার কি বিশেষ কোন প্রয়োজন আছে?

না, প্রয়োজন এমন—

তা' হ'লে আমার সময় হবে না, বলিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া মা-শোয়ে উপরে চলিয়া গেল।

গত নিশার কথা স্মরণ করিয়া লোকটা একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। কিন্তু বেহারাটা সুমুখে আসিতেই কাষ্ঠ-হাসির সঙ্গে হাতে তাহার একটা টাকা গুঁজিয়া দিয়া শিষ্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল।

৭

শিশুকাল হইতে যে দুই জনের কখনও এক মুহূর্তের জন্য বিচ্ছেদ ঘটে নাই, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ মাসাধিককাল গত হইয়াছে, কাহারও সহিত কেহ সাক্ষাৎ করে নাই।

মা-শোয়ে এই বলিয়া আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে, এ একপ্রকার ভালই হইল যে, যে মোহের জাল এই দীর্ঘদিন ধরিয়া তাহাকে কঠিন বন্ধনে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আর তাহার সহিত বিন্দুমাত্র সংস্রব নাই। এই ধনীর কন্যার নবীন উদ্দাম প্রকৃতি পিতা বিদ্যমানেও অনেক দিন এমন অনেক কাজ করিতে চাহিয়াছে, যাহা কেবলমাত্র গম্ভীর ও সংযতচিত্ত বা-থিনের বিরক্তির ভয়েই পারে নাই। কিন্তু আজ সে স্বাধীন,—একেবারে নিজের মালিক নিজে। কোথাও কাহারো কাছে আর লেশমাত্র জবাবদিহি করিবার নাই। এই একটিমাত্র কথা লইয়া সে মনে মনে অনেক তোলা-পাড়া, অনেক ভাঙা-গড়া করিয়াছে, কিন্তু একটা দিনের জন্যও কখনো আপনার হৃদয়ের নিগূঢ়তম গৃহটির দ্বার খুলিয়া দেখে নাই, সেখানে কি আছে। দেখিলে দেখিতে পাইত, এতদিন শুধুমাত্র সে আপনাকেই আপনি ঠকাইয়াছে। সেই নিভৃত গোপন কক্ষে দিবানিশি উভয়ে মুখোমুখী বসিয়া আছে,—প্রেমালাপ করিতেছে না, কলহ করিতেছে না;—কেবল নিঃশব্দে উভয়ের চক্ষু বহিয়া অশ্রু বহিয়া যাইতেছে।

নিজেদের জীবনের এই একান্ত করুণ চিত্রটি তাহার মনশ্চক্ষের অগোচর ছিল বলিয়াই ইতিমধ্যে গৃহে তাহার অনেক উৎসব-রজনীর নিষ্ফল অভিনয় হইয়া গেল,—পরাজয়ের লজ্জা তাহাকে ধূলির সঙ্গে মিশাইয়া দিল না।

কিন্তু আজিকার দিনটা ঠিক তেমন করিয়া কাটিতে চাহিল না। কেন, সেই কথাটাই বলিব।

জন্মতিথি উপলক্ষে প্রতিবৎসর তাহার গৃহে একটা আমোদ-আহ্লাদ ও খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠান হইত। আজ সেই আয়োজনটাই কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বরের সহিত হইতেছিল। বাটীর দাস-দাসী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত আসিয়া যোগ দিয়াছে। কেবল তাহার নিজেরই যেন কিছুতে গা নাই। সকাল হইতে আজ তাহার মনে হইতে লাগিল, সমস্ত বৃথা, সমস্ত পণ্ডশ্রম। কেমন করিয়া যেন এতদিন তাহার মনে হইতেছিল, ওই লোকটাও দুনিয়ার অপর সকলেরই মত, সেও মানুষ,—সেও ঈর্ষ্যার অতীত নয়। তাহার গৃহের এই যে সব আনন্দ-উৎসবের অপর্য্যাপ্ত ও নব নব আয়োজন, ইহার বার্ত্তা কি তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ভেদিয়া সেই নিভৃত কক্ষে গিয়া পশে না? তাহার কাজের মধ্যে কি বাধা দেয় না?

হয় ত বা সে তাহার তুলিটা ফেলিয়া দিয়া কখনও স্থির হইয়া বসে, কখনও বা অস্থির দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও বা নিদ্রাবিহীন তপ্তশয্যায় পড়িয়া সারারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কখনও বা—কিন্তু থাক্ সে সব।

কল্পনায় এতদিন মা-শোয়ে একপ্রকার তীক্ষ্ণ আনন্দ অনুভব করিতেছিল, কিন্তু আজ তাহার হঠাৎ মনে হইতেছিল কিছুই না,—কিছুই না। তাহার কোন কাজেই তাহার কোন বিঘ্ন ঘটায় না। সমস্ত মিথ্যা, সমস্ত ফাঁকি। সে ধরিতেও চাহে না,—ধরা দিতেও চাহে না। ওই কেমন দুর্ব্বল দেহটা অকস্মাৎ কি করিয়া যেন একেবারে পাহাড়ের মত কঠিন ও অচল হইয়া গেছে,—কোথাকার কোন ঝঞ্ঝাই আর তাহাকে একবিন্দু বিচলিত করিতে পারে না।

কিন্তু তথাপি জন্মতিথি উৎসবের বিরাট্ আয়োজন আড়ম্বরের সঙ্গেই চলিতেছিল। পো-থিন আজ সর্ব্বত্র, সকল কাজে। এমন কি, পরিচিতদের মধ্যে একটা কানা-ঘুষাও চলিতেছিল যে, একদিন এই লোকটাই এ বাড়ীর কর্ত্তা হইয়া উঠিবে,—এবং বোধ হয়, সে দিন বড় বেশী দূরেও নয়।

গ্রামের নরনারীতে বাড়ী পরিপূর্ণ হইয়া গেছে,—চারিদিকেই আনন্দ-কলরব। শুধু যাহার জন্য এই সব, সেই মানুষটিই বিমনা,—তাহারই মুখ নিরানন্দের ছায়ায় আচ্ছন্ন। কিন্তু এই ছায়া বাহিরের কাহারো চখেই প্রায় পড়িল না,—পড়িল কেবল বাটীর দুই এক জন সাবেক দিনের দাস-দাসীর। আর পড়িল বোধ হয় তাঁহার—যিনি অলক্ষ্যে থাকিয়াও সমস্ত দেখেন। কেবল তিনিই দেখিতে লাগিলেন, ওই মেয়েটির কাছে আজ সমস্তই শুধু বিড়ম্বনা। এই জন্মতিথির দিনে প্রতিবৎসর যে লোকটি সকলের আগে গোপনে তাহার গলায় আশীর্ব্বাদের মালা পরাইয়া দিত, আজ সে লোক নাই, সে মালা নাই, সে আশীর্ব্বাদের আজ একান্ত অভাব।

মা-শোয়ের পিতার আমলের বৃদ্ধ আসিয়া কহিল, ছোট মা, কই তাকে ত দেখি না?

বুড়া কিছুকাল পূর্ব্বে কর্ম্মে অবসর লইয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার ঘরও অন্যগ্রামে,—এই মনান্তরের খবর সে জানিত না। আজ আসিয়া চাকর-মহলে শুনিয়াছে। মা-শোয়ে উদ্ধতভাবে বলিল, দেখিবার দরকার থাকে, তার বাড়ী যাও,—আমার এখানে কেন?

বেশ, তাই যাইতেছি, বলিয়া বৃদ্ধ চলিয়া গেল। মনে মনে বলিয়া গেল, কেবল তাঁকে একাকী দেখিলেই ত চলিবে না—তোমাদের দু'জনকে আমার একসঙ্গে দেখা চাই। নইলে এতটা পথ বৃথাই হাঁটিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু বুড়ার মনের কথাটি এই নবীনার অগোচর রহিল না। সেই অবধি একপ্রকার সচকিত অবস্থাতেই তাহার সকল কাজের মধ্যে সময় কাটিতেছিল, সহসা একটা চাপা গলার অস্ফুট শব্দে চাহিয়া দেখিল—বা-থিন। তাহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া বিদ্যুত বহিয়া গেল; কিন্তু চক্ষের নিমিষে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

খানিক পরে বুড়া আসিয়া কহিল, ছোট-মা, যাই হোক, তোমার অতিথি! একটা কথাও কি কহিতে নাই?

কিন্তু তোমাকে ত আমি ডাকিয়া আনিতে বলি নাই।

সেইটাই আমার অপরাধ হইয়া গেছে, বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, মা-শোয়ে ডাকিয়া কহিল, বেশ ত, আমি ছাড়া আরও ত লোক আছে, তাঁরা ত কথা বলিতে পারেন!

বুড়া বলিল, তা পারেন, কিন্তু আর আবশ্যক নাই, তিনি চলিয়া গেছেন।

মা-শোয়ে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল। তার পরে কহিল, আমার কপাল। নইলে তুমিও ত তাঁকে খাইয়া যাইবার কথাটা বলিতে পারিতে।

না, আমি এত নির্লজ্জ নই, বলিয়া বুড়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

৮

এই অপমানে বা-থিনের চোখে জল আসিল। কিন্তু সে কাহাকেও দোষ দিল না, কেবল আপনাকে বারংবার ধিক্কার দিয়া কহিল, এ ঠিকই হইয়াছে। আমার মত লজ্জাহীনের ইহারই প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু প্রয়োজন যে ঐখানেই—ঐ একটা রাত্রির ভিতর দিয়াই শেষ হয় নাই, ইহার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি অপমান যে তাহার অদৃষ্টে ছিল, ইহা দিন দুই পরে টের পাইল। আর এমন করিয়া টের পাইল যে, সে লজ্জা সারাজীবনে কোথায় রাখিবে, তাহার কূল-কিনারা দেখিল না।

যে ছবিটার কথা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে, আজকের সেই গোপার

চিত্রটা এতদিনে সম্পূর্ণ হইয়াছে। একমাসের অধিক কাল অবিশ্রাম পরিশ্রমের ফল আজ শেষ হইয়াছে। সমস্ত সকালটা সে এই আনন্দেই মগ্ন হইয়া রহিল।

ছবি রাজদরবারে যাইলে, যিনি দাম দিয়া লইয়া যাইবেন, সংবাদ পাইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ছবির আবরণ উন্মুক্ত হইলে তিনি চমকিয়া গেলেন। চিত্র সম্বন্ধে তিনি আনাড়ী ছিলেন না; অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে ক্ষুব্ধ স্বরে ...ন, এ ছবি আমি রাজাকে দিতে পারিব না।

বা-থিন ভয়ে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া কহিল, কেন ... দিয়া দেবতা গড়িলে দেবতাকে অপমান

তার কারণ এ মুখ আমি চিনি। মানুষের ... না।

করা হয়। এ কথা ধরা পড়িলে রাজা আমার ... ণ চক্ষের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া মুখ

এই বলিয়া সে চিত্রকরের বিস্ফা... থতে পাইবেন—এ কে। এ ছবি চলিবে না।

টিপিয়া হাসিয়া বলিল, একটু মন দিয়া দেখিলেই ... একটা কুয়াসার ঘোর কাটিয়া যাইতেছিল। ভদ্র

বা-থিনের চোখের উপর হইতে ধীরে-ধীরে ... য়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া জল

লোক চলিয়া গেলেও সে তেমনি দৃষ্টি নিবদ্ধ ... দিন এই প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সে

পড়িতে লাগিল,—আর তাহার বুঝিতে বাকি ... টানিয়া আনিয়াছে, দেবতার রূপে যে

হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে যে সৌন্দর্য্য, যে মাধুর্য ... সে তাহারই মা-শোয়ে।

তাহাকে অহর্নিশি ছলনা করিয়াছে,—সে জাতকের গো... য়া বিড়ম্বিত করিলে,—তোমার আমি

চোখ মুছিয়া মনে-মনে কহিল, ভগবান্! আমাকে এম...

কি করিয়াছিলাম

৯

পো-থিন সাহস পাইয়া বলিল, তোমাকে দেবতাও ক... ন, মা শোয়ে, আমি ত মানুষ।

মা-শোয়ে অন্যমনস্কের মত উত্তর দিল, কিন্তু যে করে না, সে বৌ... দেবতারও বড়।

কিন্তু এ প্রসঙ্গকে সে আর অগ্রসর হইতে দিল না, কহিল, শু... আপনার যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে,—আমার একটা কাজ করিয়ে দিতে পারেন? খুব শীঘ্র?

পো-থিন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

এক জনের কাছে আমি অনেক টাকা পাই, কিন্তু আদায় করিবা... দলীল নাই। আপনি কিছু উপায় করিতে পারেন?

পারি। কিন্তু তুমি কি জানো না, এই রাজকর্ম্মচারীটি কে? বলিয়া লোকটা...

এই হাসির মধ্যেই স্পষ্ট উত্তর ছিল। মা-শোয়ে ব্যগ্র হইয়া তাহার হাত... দিন একটি উপায় করিয়া। আজই। আমি একটা দিনও আর বিলম্ব...

পো-থিন ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বেশ, তাই।

নিষ্ঠা !

শ্রীযুক্ত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে
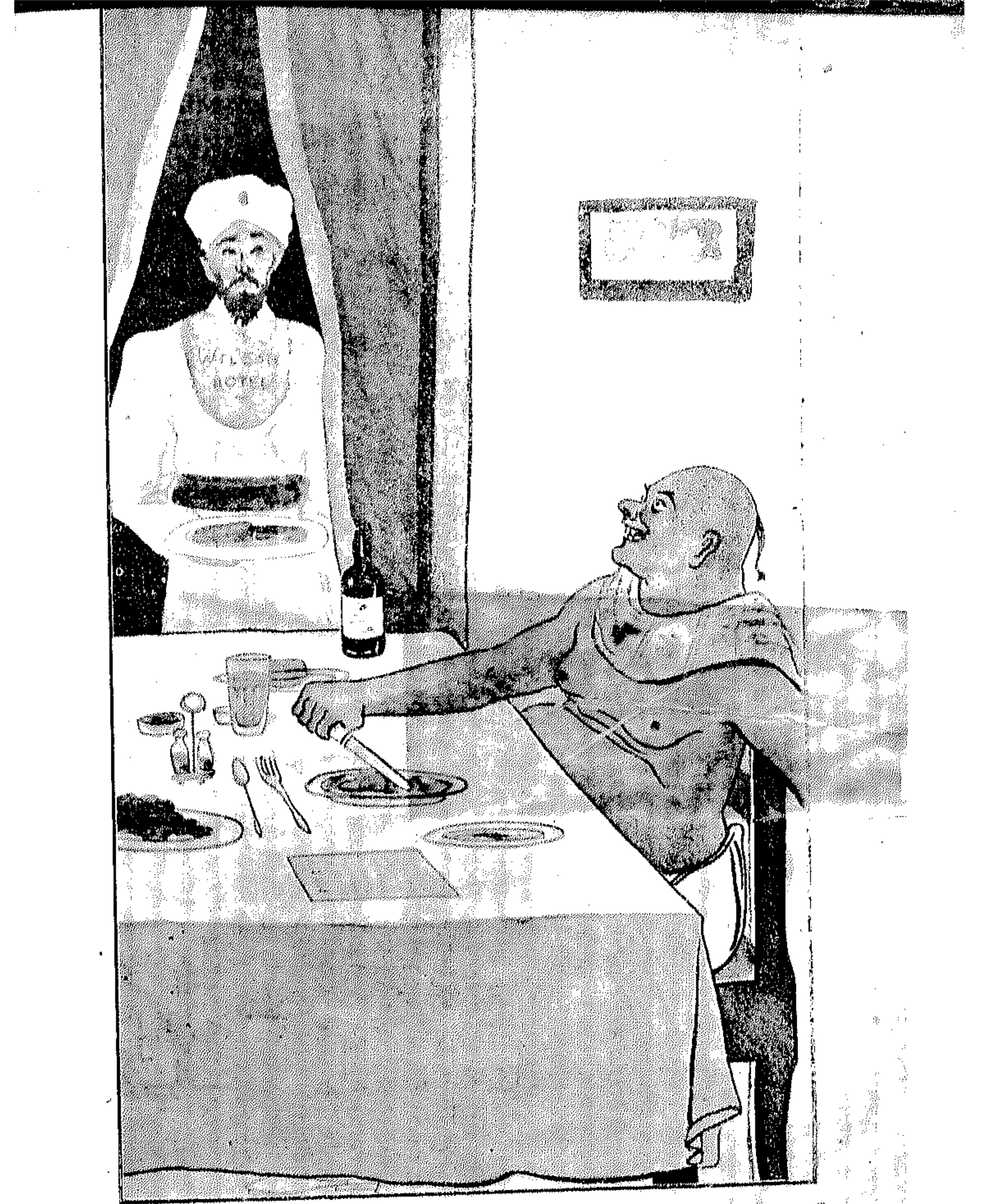
দাঁড় করাইয়াছিল। সেই বিরাট অহঙ্কার আজ তাহার পদমূলে পড়িয়া যে মাটীর সঙ্গে মিশিবে, ইহাতে তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না।

এমন সময়ে ভৃত্য আসিয়া জানাইল, নীচে বা-থিন অপেক্ষা করিতেছে। মা-শোয়ে মনে মনে ক্রূর হাসি হাসিয়া বলিল, জানি। সে নিজেও ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল।

মা-শোয়ে নীচে আসিতেই বা-থিন উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মা-শোয়ের বুকে শেল বিঁধিল। টাকা সে চাহে না, টাকার প্রতি লোভ তাহার কাণাকড়ির নাই, কিন্তু সেই টাকার নাম দিয়া কত বড় ভয়ঙ্কর অত্যাচার যে অনুষ্ঠিত হইতে পারে, ইহা সে আজ এই দেখিল। বা-থিন প্রথমে কথা কহিল, বলিল, আজ সাত দিনের শেষ দিন, তোমার টাকা আনিয়াছি।

হায় রে, মানুষ মরিতে বসিয়াও দর্প ছাড়িতে চায় না। নইলে, প্রত্যুত্তরে এমন কথা মা-শোয়ের মুখ দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইতে পারিল যে, সে সামান্য কিছু টাকা প্রার্থনা করে নাই—ঋণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে বলিয়াছে।

বা-থিনের পীড়িত, শুষ্ক মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল, বলিল, তাই বটে, তোমার সমস্ত টাকাই আনিয়াছি।

সমস্ত টাকা? পেলে কোথায়?

কালই জানিতে পারিবে। ওই বাক্সটায় টাকা আছে, কাহাকেও গণিয়া লইতে বল।

গাড়োয়ান দ্বারপ্রান্ত হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আর কত বিলম্ব হইবে? বেলা থাকিতে বাহির হইতে না পারিলে যে পেগুতে রাত্রের মত আশ্রয় মিলিবে না।

মা-শোয়ে গলা বাড়াইয়া দেখিল, পথের উপর বাক্স,বিছানা প্রভৃতি বোঝাই দেওয়া গো-যান দাঁড়াইয়া। ভয়ে চক্ষের নিমিষে তাহার সমস্ত মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল. ব্যাকুল হইয়া একেবারে সহস্র প্রশ্ন করিতে লাগিল, —পেগুতে কে যাবে? গাড়ী কার? কোথায় এত টাকা পেলে? চুপ করিয়া আছ কেন? তোমার চোখ অত শুক্‌নো কিসের জন্য? কাল কি জানিব? আজ বলিতে তোমার—

বলিতে বলিতেই সে আত্মবিস্মৃত হইয়া কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল—এবং নিমেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া চমকিয়া উঠিল—উঃ—এ যে জ্বর, তাই ত বলি, মুখ অত ফ্যাকাসে কেন?

বা-থিন আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া শান্ত মৃদু কণ্ঠে কহিল, বোস। বলিয়া সে নিজেই বসিয়া পড়িয়া কহিল, আমি মান্দালে যাত্রা করিয়াছি। আজ তুমি আমার একটা শেষ অনুরোধ শুনিবে?

মা-শোয়ে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে শুনিবে। বা-থিন একটু স্থির থাকিয়া কহিল, আমার শেষ অনুরোধ, সৎ দেখিয়া কাহাকেও শীঘ্র বিবাহ করিও। এমন অবিবাহিত অবস্থায় আর বেশি দিন থাকিও না। আর একটা কথা—

এই বলিয়া সে আবার কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া এবার আরও মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিল, আর একটা জিনিস তোমাকে চিরকাল মনে রাখিতে বলি। এই কথাটা কখনও ভুলিবে না যে, লজ্জার মত অভিমানও স্ত্রীলোকের ভূষণ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়ি করিলে—

মা-শোয়ে অধীর হইয়া মাঝখানেই বলিয়া উঠিল, ও সব আর এক দিন শুনিব। টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন হাসিল। কহিল, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর? আমার কি না তুমি জানো?

টাকা পেলে কোথায়?

বা-থিন ঢোক গিলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিল, বাবার ঋণ তাঁর সম্পত্তি দিয়াই শোধ হইয়াছে—নইলে আমার নিজের আর আছে কি?

তোমার ফুলের বাগান?

সে-ও ত বাবার।

তোমার অত বই?

বই লইয়া আর করিব কি? তা ছাড়া সে-ও ত তাঁরই।

মা-শোয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, যাক্, ভালই হইয়াছে। এখন উপরে গিয়া শুইয়া পড়িবে চল।

কিন্তু আজ যে আমাকে যাইতেই হইবে।

এই জ্বর লইয়া? এ কি তুমি সত্যই বিশ্বাস কর, তোমাকে আমি এই অবস্থায় ছাড়িয়া দিব?

এই বলিয়া সে কাছে আসিয়া আবার তাহার হাত ধরিল। এবার বা-থিন বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল, মা-শোয়ের মুখের চেহারা এক মুহূর্তেই একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সে মুখে বিষাদ, বিদ্বেষ, নিরাশা, লজ্জা, অভিমান কিছুরই চিহ্নমাত্র নাই। আছে শুধু বিরাট্ স্নেহ ও তেমনি বিপুল শঙ্কা। এই মুখ তাহাকে একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া দিল, সে নিঃশব্দে ধীরে-ধীরে তাহার পিছনে পিছনে উপরে শয়ন-কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহাকে শয্যায় শোয়াইয়া দিয়া মা-শোয়ে কাছে বসিল, দুটি সজল দৃপ্ত চক্ষু তাহার পাণ্ডুর মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া কহিল, তুমি কি মনে কর, কতকগুলো টাকা আনিয়াছ বলিয়াই আমার ঋণ শোধ হইয়া গেল? মাদ্রাজের কথা ছাড়িয়া দাও, আমার হুকুম ছাড়া এই ঘরের বাহিরে গেলেও আমি ছাদ হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। আমাকে অনেক দুঃখ দিয়াছ, কিন্তু আর দুঃখ কিছুতেই সহিব না, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলিয়া দিলাম।

বা-থিন আর জবাব দিল না। গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পেস্তার বরফী।

১

পরেশ আমাদের মেসে থাকিত।—কলেজে পড়িত। পরেশ মেসে বেশ মিশিয়া গিয়াছিল। সে 'উদীয়মান' কবি। 'কবি'রা এখন 'কবি' হইয়াই ভূমিষ্ঠ হন। কিন্তু আমি যে সময়ের গল্প ফাঁদিয়াছি, তাহার কিছু কাল পূর্ব্বে অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে 'উদীয়মান কবি' বলিতেন। সুতরাং মেসের এই খেতাবে পরেশ আপত্তি করিত না, বরং মনে মনে আনন্দিত হইত।

পরেশের একটু সুরবোধ ছিল। তাহার উপর সে সুকণ্ঠ। আমাদের সময়ের কিশোর-যুবক-যূথের 'গস্পেল্' 'রবিচ্ছায়া'র সমস্ত গান পরেশের মুখস্থ ছিল। পরেশ যখন গোধূলির আলোয় গোলদীঘীর শ্যামল তৃণাস্তরণে আসর জমাইয়া ভাববিহ্বলকণ্ঠে গান ধরিত—

"আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে,
বসন্তের বাতাসটুকুর মত ;
সে যে ছুঁয়ে গেল, নুইয়ে গেল,
ফুল ফুটিয়ে গেল শত শত।"

তখন আমরা 'যৎপরোনাস্তি' তারিফ করিতাম ; আর অনেক অপরিচিত শ্রোতা পরিচয়ের অভাবে তাহাকে প্রত্যক্ষভাবে বাহবা দিতে না পারিয়া দুঃখিত হইত।

পরেশ কবি। সুতরাং সে 'রবিচ্ছায়া'র অনেক গানের জবাবে পাল্টা গান রচনা করিয়াছিল।

"হা কে বলে দেবে মোরে, সে ভালবাসে কি না ?"

এই গানটার উত্তরে সে একটা গান বাঁধিয়াছিল। রবি বাবুকে পাল্টা গানটা আমরা পাঠাইয়া দিয়াছিলাম কি না, তাহা আমার ঠিক মনে নাই।

২

পরেশ তাহার ঘরে বসিয়া কবিতা লিখিতেছিল, এমন সময়ে মাণিক বাহির হইতে বলিল, "পরেশ বাবু! আপনার ঘরে যেতে পারি ?"

"আসুন, আসুন। মাণিক বাবু! আপনি যে বেজায় 'সায়েব' হইয়া উঠিলেন! ঘরে আসিবার আবার অনুমতি ?"

মাণিক গৃহে প্রবেশ করিয়া একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

পরেশ একটি সমস্ত ঘর লইয়াছিল ; দুই জনের 'এষ্টাব্লিশমেন্ট' দিয়া সে একাকী সেই ঘরটি ভোগদখল করিত। পরেশের ঘরে যে সকল আসবাব ছিল, সাধারণ মেসে তাহা দুর্লভ। পরেশ একখানি 'বেন্টউডে'র চেয়ারে বসিয়া একটি ছোট টেবিলে কবিতা লিখিত। একখানি আরাম-কেদারায় শুইয়া নবেল পড়িত। কিন্তু

কলেজের পড়া পড়িবার সময় তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া এমন চীৎকার করিত যে, আমাদের—এবং সম্ভবতঃ প্রতিবাসীদেরও—কানে তালা ধরিয়া যাইত। আমরা অনেকেই মাটার দেলকোয় রেড়ীর তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। দু'এক জনের তেলের বাতী ও কেরোসিনের আলোও না ছিল, এমন নয়। কিন্তু পরেশের একটা 'রীডিং-ল্যাম্প' ছিল। সেই সবুজ 'শেডে' ঢাকা মৃদু মধুর স্নিগ্ধ আলো এখনও যেন আমার চোখে পড়িতেছে।

মাণিক বলিল, "পরেশ বাবু! আপনি এত 'মাগ্যা' হইয়া উঠিলেন কেন?"

পরেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "মাণিক বাবু! আমাকে লজ্জিত করিবেন না। সে দিন আমার নিমন্ত্রণ ছিল।"

মাণিক। আমাদেরটা তাহা হইলে অনিমন্ত্রণের পর্য্যায়ে পড়িল!

পরেশ। শুধু নিমন্ত্রণ নয়, একটু কাজও ছিল। জানেন ত আমার weakness—একটু ambition আছে। কবিতা শুনাইবার তলব্ হইয়াছিল।"

মাণিক বলিল, "পরেশ বাবু, আপনি বড় নিমকহারাম! আপনি হলপ্ করিয়া বলুন, আপনার স্ব-কৃত ও উচ্চারিত যত কবিতা আমরা বরদাস্ত করিয়াছি, ভূ-ভারতে আর কাহারও পক্ষে তাহা সম্ভব কি? তাহাতেও আপনার সাধ মিটিল না? আমরা যে এত কবিতা শুনিলাম, তাহার কি এই পুরস্কার?'

ভালমানুষ পরেশ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া পড়িল; আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিল, "বগলা বাবু আমার কবিতা ভালবাসেন। তিনি এগুলো ছাপাইবার চেষ্টায় আছেন—"

মাণিক। তাই আপনাকে সাত ছাপাখানার জল খাওয়াইয়া আমাদের feastটা মাটী করিয়া দিলেন? বরিশালের মেসের Studentরা আপনার গান শুনিতে আসিয়া নিরাশ হইয়া গেল। কি অপমানটাই আপনি সে দিন করিয়াছেন।

পরেশ। আমি এখনই আপনার রাগ জল করিয়া দিতেছি।

পরেশ উঠিয়া তাহার কেতাবের মধ্য হইতে একখানি নূতন মাসিকপত্র বাহির করিয়া পাতা উল্টাইতে লাগিল।—মাণিক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। পরেশ যাহা খুঁজিতেছিল, সেই ছাপানো খতিয়ান-সমুদ্র মন্থন করিয়া অচিরে তাহা হইতে সে রত্ন উদ্ধার করিল, এবং বলিল, "মাণিক বাবু! এই কবিতাটা শুনুন,—

"নদীতীরে।

'ফুটিয়া লাল নীল অযুত পদ্মফুল,
আলোক অন্ধকার—প্রিয়ার কালো চুল;
হাসিছে লাল নীল, হাসিছে পদ্মফুল,
ঢেউয়ে কাঁপে চাঁদ—প্রিয়ার কানে দুল।

আঁধারে পাশাপাশি ফুটিয়া তারা দুটি,
আঁধারে আছে যেন প্রিয়ার বক্ষ ফুটি।
কাঁপিছে লাল নীল, কাঁপিছে পদ্মফুল,
প্রিয়া কি জীবনের, স্বপনের মায়াফুল!"

মাণিক শুনিল, চক্ষু বুজিয়া শুনিল। তার পর চাহিয়া দেখিল, পরেশ সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মাণিক চকিতে ভাবিয়া লইল, সে হয় ত কবিতার রাগে লাল হইয়া উঠিয়াছে, নয় ত কবিতার ত্রাসে তাহার মুখে নীল মাড়িয়া দিয়াছে! হয় ত সে 'প্রিয়ার দুল' হইয়া কড়িকাঠে দুলিতেছে। নতুবা যে কবির দৃষ্টি শুধু 'স্বপনের মায়াফুলে'র একচেটে, সে দৃষ্টি অত তৃষিত হইয়া মাণিকগঞ্জের মাণিককে এক গণ্ডুষে পান করিবার চেষ্টা করিবে কেন?

মাণিক জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কার লেখা?"

পরেশ বলিল, "কেন, আপনি কি এটা আগে শোনেন নি?"

মাণিক "না" বলিয়াই ধাঁ করিয়া মাসিক পত্রখানি পরেশের হাত হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়াই দৌড় দিল, এবং মেসের সকলকে জমায়েৎ করিয়া তার-স্বরে পড়িতে লাগিল—

'ফুটিয়া লাল নীল অযুত পদ্মফুল!'

সেদিন সকালে মেসে হৈ-হৈ-রৈ রৈ কাণ্ড হইয়া গেল। কাহারও আর পড়া হইল না। উপরে, নীচে, ছাতে, বারান্দায়, কলতলায়—কোথায় নয়?—যে দিকে চাও, কেবল 'ফুটিয়া লাল নীল অযুত পদ্মফুল!' ন'টা বাজিয়া গেল। সম্মুখের বাড়ীতে বেথুন-স্কুলের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মেসের ঝি আসিয়া খবর দিল, চৌবাচ্ছায় বেশী জল নাই, এ দিকে কলের জল যায়। বামুন ঠাকুর রান্নাঘর হইতে চেঁচাইয়া বলিল, 'ভাত হইয়াছে।'—কিন্তু কে সে কথা কানে তোলে? যেখানে লাল কাঁপে, নীল কাঁপে, পদ্মফুল কাঁপে, সেখানে কি 'পার্থিব' ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকে?

মাণিক, বিভূতি, খগেন, যতীন, শরৎ, বসন্ত, নগেন, নবকৃষ্ণ, প্রাণগোপাল, প্রিয়মাধব, মন্মথ, কমলকৃষ্ণ, রাখহরি, থাকহরি, সাতকড়ি, পাঁচুগোপাল, রমণী, মোহিনী, হরেন, নরেন প্রভৃতি পরেশের কবিতার লালে নীলে রঞ্জিত হইয়া রামধনু হইয়া উঠিল।

মাণিকের প্রস্তাবে সকলে কবিবর পরেশকে ধরিয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া সন্ধ্যাদীপ দেখাইবার মত ঘরে ঘরে ঘুরাইয়া অবশেষে ছাদে আনিয়া ফেলিল। সকলে ধরিয়া বসিল, "পরেশ, কবিতাটা গাহিয়া দাও।" গৌরব-দীপ্ত কিন্তু লজ্জানম্র পরেশ গাহিবে কি, প্রথমে হাঁ করিতেই পারিল না। কিন্তু তাহার সতীর্থ ও সঙ্গীরা ছাড়িবার পাত্র নয়। কবিতায় যাহারা 'মস্ত' হইয়া উঠে, কোনও বাসনা অপূর্ণ থাকিতে পারে, ইহা তাহারা কল্পনাও করিতে পারে না। 'ফীষ্টে'র দিন একটা হারমোনিয়ম আনা হইয়াছিল, সেটা আর ফেরত দেওয়া হয় নাই। এই কয় দিন ধরিয়া সেই জরাজীর্ণ হারমোনিয়মটি অল্প শিক্ষিত, অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অ-শিক্ষিত হস্তের অঙ্গুলি-সন্তাড়নে প্রায় নীরব ও মৃতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। মাণিক সেই হারমোনিয়মটা

টানিয়া আনিয়া সুর দিতে লাগিল। খগেন ও যতীন গাহিতে পারিত। তাহারা প্রথমে ধরিল,—'ফুটিয়া লাল নীল—' প্রথম দুই লাইন গাহিয়া খগেন বলিল, "পরেশ বাবু!—ধরুন।'

পরেশ বাবু ধরিলেন না, বোধ হয় ভাবাবেগে ধরিতে পারিলেন না। তিন স্তবক শেষ হইবার পর সকলে যখন সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পরেশ বাবু, পরেশ বাবু! পরেশ বাবু must sing' তখন পরেশ ধরিল, "কাঁদিছে লাল নীল -" শেষ চরণটায় মেস-শুদ্ধ পরেশ-ভক্ত যোগ দান করিল।

মাণিক বলিল, "splendid! sublime! oh real!

'ওয়া কি জীবনের, স্বপনের মায়া-ফুল!'

এমন নহিলে কবিতা? পরেশ কবি, জীতা রহো! হিপ্ হিপ্ হুর্—রে!"

যতীন কীর্তনের সুরে বলিল,

"আলোক অন্ধকার -প্রিয়ার কালো চুল!'

কালোয় আলো প্রতিভা নহিলে কেহ জ্বালিতে পারে না!'

এমন সময়ে প্রতিবাসী যতীন বাহাদুরের উড়িয়া চাকর আত্মারাম হাপাইতে হাপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল—"কঁড় হউচি—কঁউ হউচি?"

মাণিক বলিল, "বেটা ভগ্ন-দূতের মত আমাদের পদ্মফুলের যাত্রার আসরে লাফিয়ে পড়ে রসভঙ্গ ক'রে দিলি!"

যৌবনের জীবন-চরিত চিরদিন মনে থাকে। তাই সে আনন্দের কথা আজও মনে আছে।

যৌবনের আনন্দ-উৎসবে আসল-নকলে ভেদ থাকে না। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও প্রশংসার সূক্ষ্ম সীমারেখা যৌবনের তেপান্তর মাঠে সহজে ঠিক করা যায় না; তাহার দরকারও হয় না। সুতরাং পরেশ তাহার প্রথম কবিতার সূর্যালোক দর্শনের এই উৎসব সর্বান্তঃকরণে ভোগ করিল। ইহার কতটা প্রশংসা, কতখানি বিদ্রূপ, তাহা আমরাও তখন বুঝিতে পারি নাই, পরেশও পারিল না।

এই আনন্দ-মুখরিত প্রভাতের পর বহুদিন মেসের ডালে-ভাতে, খাবারের ঠোঙ্গায়, পানে, চুণে লেখায় পড়ায়, সময়ে অসময়ে 'অমৃত পদ্মফুল' ফুটিয়া উঠিত। সে ফুল ঝরিতে চাহিত না, ঝরিতে জানিত না। কাহার মনের শুষ্ক কুঞ্জে কল্পলোকের সেই অমর ফুলের দুই একটা পাপড়ী, অন্ততঃ দু' এক বিন্দু পরাগ পড়িয়া নাই? যাহার নাই, এই জীবনের সায়াহ্নেও বলিব, সে অত্যন্ত দুর্ভাগা।

৩

পরেশ মেসে 'উদীয়মান' ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সাহিত্যের দিক্-চক্রবালে, দূর প্রান্তে, অবশ্য অনেকটা নিম্নে উদিত হইল। তখনও বাঙ্গালায় মাসিকের কচু-বন গজায় নাই। যে দুই তিনখানি মাসিক শিবরাত্রির সল্‌তের মত ভারতীয় মন্দিরে 'টিম্-টিম্' করিত, তাহারই একখানিতে পরেশ কবিতা লিখিতে লাগিল।

পরেশ কবি হইয়া উঠিল। আর, মেসের সহিত পরেশের সম্পর্কও তাহার কবি-কীর্তির অনুপাতে শিথিল হইতে লাগিল। পরেশের সঙ্গীদের মধ্যে অনেকে তাহাকে দল-ছাড়া হইতে দেখিয়া দুঃখিত হইল; কেহ কেহ হিংসায় জ্বলিতে লাগিল; কেহ কেহ চটিয়া গেল। আর, সকলেই, পরামর্শ না করিয়াই, এক-

যোগে বিদ্রূপে উপহাসে পরেশের নিদাদোষের শোধ তুলিতে লাগিল। ফলে সপ্তরথীর ব্যূহে বদ্ধ, ক্ষত-বিক্ষত অভিমন্যুর মত পরেশের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিল। সে মেস হইতে পলাইবার অবকাশ পাইলে ছাড়িত না।

পরেশ ছাত্রসমবায় হইতে সাহিত্য-সমাজে 'প্রোমোশন' পাইয়াছিল। দূর হইতে যাঁহাদের প্রতিভাকে ভক্তি করিয়া আসিয়াছে, তাঁহাদের সন্নিহিত হইবার, তাঁহাদের সহিত আলাপ করিবার, তাঁহাদের উৎসাহ-বাণী শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরেশ আপনাকে যে পরিমাণে ধন্য মনে করিল, যৌবনসঙ্গীদের উদ্দাম আনন্দে সেই অনুপাতে তাহার অরুচি হইতে লাগিল।

পরেশ 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র অভিনয় করিতেও ভুলিয়া গেল। কবিতা লিখিয়া মেসের কাহাকেও শুনাই-বার জন্য তাহার আর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। যখন শুনিবার কেহ ছিল না, তখন যে মাণিক পরশের এক-মাত্র শ্রোতা ছিল, সেই মাণিকও পরেশের কবিতা-শ্রবণের সৌভাগ্যে বঞ্চিত হইল। পরেশ প্রভাতে বাহির-হইয়া যায়, কোন্ দিন কখন্ ফেরে, তাহার ঠিক নাই।

পরেশের অবস্থা ক্রমে সঙ্গীন হইয়া উঠিল। সে সর্ব্বদাই যেন অত্যন্ত অন্যমনস্ক, চিন্তান্বিত থাকে। মেসের সকলে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাহাকে 'চিন্তাশীল' উপাধি দিল। পরেশ আর হাসিমুখে বিদ্রূপ সহিতে পারে না। সে ক্রমে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। তাহার ফলে বিদ্রূপের মাত্রা আরও বাড়িয়া উঠিল।

৪

সন্ধ্যা। সমস্ত দিন বৃষ্টির পর অপরাহ্নে ধরণ হইয়াছিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্ব্বেই আবার বর্ষণ আরম্ভ হইল। মেসে খিচুড়ীর ব্যবস্থা হইয়া গেল। মাণিক ও গৌরহরি ইলিসমাছ কিনিতে চলিল। যাইবার সময় মাণিক পরেশকে বলিল, "পরেশদা।' এই বৃষ্টিতে বাড়ীর বাহির হইলে তোমার কবিতা ভিজিয়া জ্বরে পড়িতে পারে। আজ মেসেই বাদলাটা কাটাইয়া দাও। পার যদি, একটা বাদলার কবিতা লিখিতে পার। 'রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঘন ঘন রে বরষা' গোছ!—কি বল? আজ ইলিস মাছ ও খিচুড়ীর সঙ্গে তোমার কবিতার পাল্লা—যেন মনে থাকে।'

কিন্তু মাণিক বাড়ীর বাহির হইবার একটু পরেই পরেশ মেসের কাহারও নিষেধে কর্ণপাত না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। টানাটানিতে তাহার সিল্কের আধ-ময়লা চাদরখানি ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু পরেশ তাহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। বিদ্রূপ, শ্লেষ, ইতর ব্যঙ্গ—কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। থাক-হরির উচ্চকণ্ঠে বৈষ্ণব-কবির অভিসারের পদ শুনিতে শুনিতে পরেশ তাহার গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিল।

৫

পরেশের এ অপরাধ তাহার সঙ্গীরা ক্ষমা করিতে পারিল না। পরদিন প্রভাতে ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল। এক দিকে সমগ্র মেস, আর এক দিকে বেচারী পরেশ। সঙ্গীদের বাক্য-বাণে জর্জ্জরিত হইয়া বেলা ন'টার সময় পরেশ মেস হইতে বাহির হইয়া প্রতিবাসী যতীন বাহাদুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

যতীন বাহাদুর তখন একখানি ফটোগ্রাফের 'নেগেটিভ্' 'টচ্' করিতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে এক জন হিন্দুস্থানী বসিয়া আধা-হিন্দী ও আধা-বাঙ্গালায় গল্প করিতেছিল। যতীনবাহাদুর পরেশকে দেখিয়াই বলিলেন, "পরেশ বাবু! আপনি নাকি প্রেমে পড়েছেন?"

পরেশ ভাবিল, 'যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।' কিন্তু সে কোনও উত্তর না দিয়া হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইল, দেখিল, টেবিলের উপর কলাপাতে কি মিষ্টান্ন রহিয়াছে।—বোধ হয়, পেস্তার বরফী।—পরেশ সেই দিকে অগ্রসর হইল—যতীন বাহাদুরের প্রশ্নটা চাপা দিবার জন্য হাত বাড়াইয়া একখানি বরফী তুলিয়া লইল।

বাহাদুর বলিয়া উঠিলেন, 'খাবেন না, খাবেন না।'

হিন্দুস্থানী বলিল, "কেনো খাবেন না? খাইয়ে বাবু, বহুৎ মৌজ হোগা। বাহাদুরের কথা শুনিবেন না।"

পরেশ সে বরফীখানা মুখে ফেলিয়া দিল। বাহাদুর বলিলেন,—'কি,—তা জানেন?'

পরেশ তাড়াতাড়ি আরও দুইখানা বরফীর সৎকার করিয়া বলিল, "পেস্তার বরফী;—বিষ নয় নিশ্চয়ই—'

যতীন বাহাদুর বলিলেন, 'মাজুম্!"

পরেশ বলিল, "মাজুম্? সে আবার কি?'

যতীন বাহাদুর বলিলেন, 'সিদ্ধির বরফী।'—হিন্দুস্থানীকে দেখাইয়া বলিলেন, 'উনি আমার জন্য আনিয়াছেন।—আপনি সিদ্ধি খান? অভ্যাস আছে?"

হিন্দুস্থানী বলিল, "বাহাদুর! কেনো ভয় দেখান? বাবু, আপনি খান। মেওয়া আছে। আমি বাহাদুরের জন্য বহুৎ তক্‌লিফ্ লিয়ে বানিয়েছি।"

পরেশ ভাবিল, মেওয়া—পেস্তার বরফী—কৌতুকপ্রিয় যতীন বাহাদুর তাহার সহিত রঙ্গ করিতেছেন, ভয় দেখাইতেছেন।

পরেশ বলিল, "সব আপনি একলা খাবেন? কাকেও ভাগ দেবেন না? আপনার ত এমন একলাষেঁড়ে রোগ ছিল না?"

যতীন বাহাদুর তাড়াতাড়ি আসন হইতে উঠিয়া পরেশের হাত ধরিলেন, বলিলেন, "আর খাবেন না। আপনার অভ্যাস নাই, কষ্ট পাবেন।"

বাহাদুর বরফী কয়খানি কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরেশের দৃঢ় বিশ্বাস, উহা মাজুমও নয়, খাজুমও নয়—পেস্তার বরফী। সুতরাং সে সহজে ছাড়িল না। কাড়াকাড়িতে দুই একখানা কার্পেটের উপর পড়িয়া গেল বটে, কিন্তু দু'একখানা পরেশ খাইয়া ফেলিল।

যতীন বাহাদুর বলিলেন, "কাজটা ভাল হইল না।—যদি বেশী নেশা হয়, আমাকে খবর দেবেন।

পরেশ বলিল, "পেস্তা খাইয়া কেহ মরে না। আপনি আমার জন্য অত ভাবিবেন না।"

হিন্দুস্থানী বলিল, "আপনি কুচ্ ডর্ করিবেন না। বাহাদুর আপনাকে বেকুফ্ করিতেছেন!"

পরেশ কিছুক্ষণ গল্প করিয়া মেসে ফিরিল।

৬

স্নান করিতে করিতে তাহার মনে হইল, তাহার চোখ যেন বুজিয়া আসিতেছে। সে কাপড় ছাড়িয়া খাইতে বসিল। খাইতে খাইতে হাসিতে লাগিল। আহারে তাহার অত্যন্ত তৃপ্তি হইতে লাগিল। দু'বার
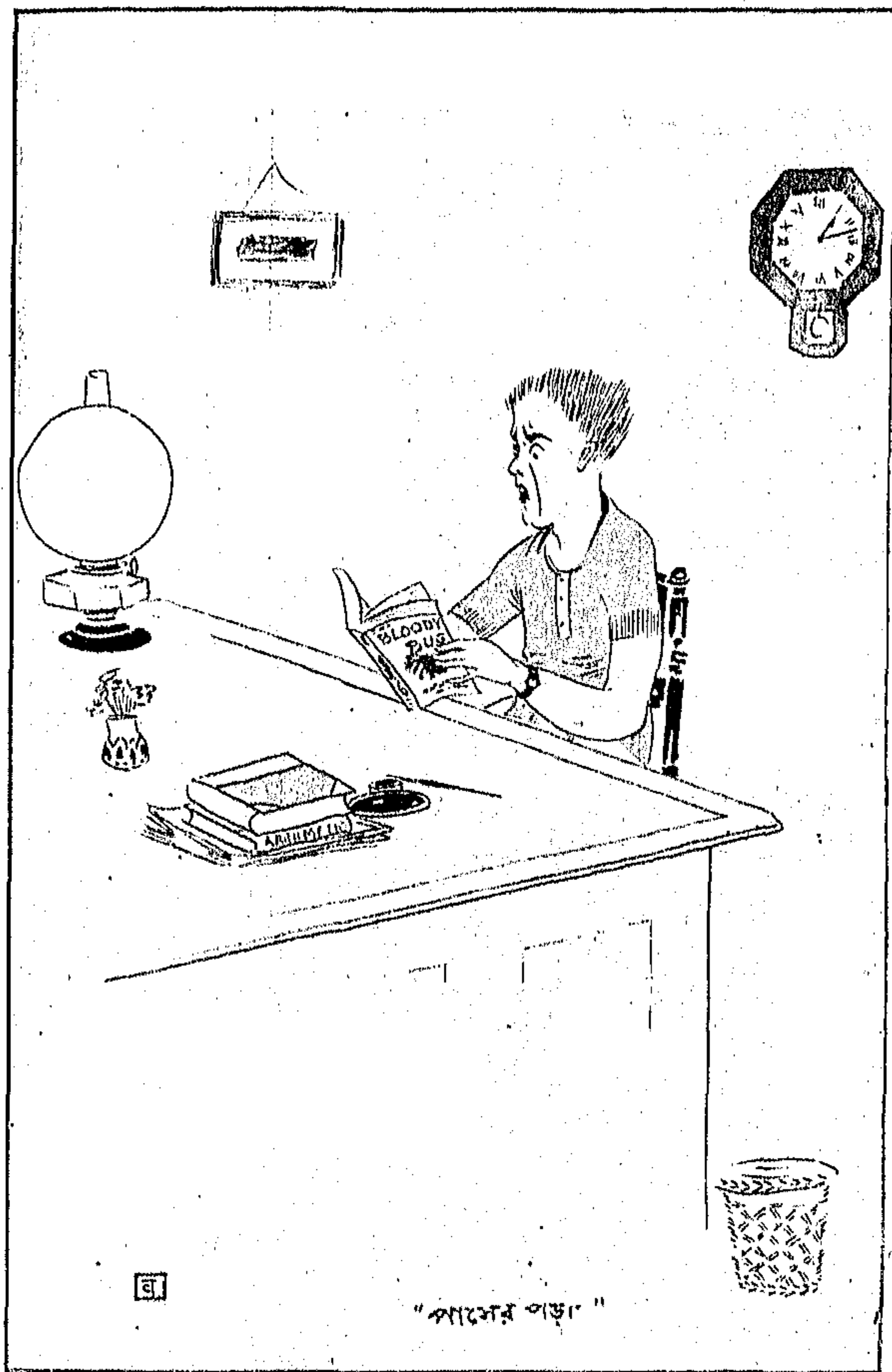
পাশের পড়া

চিত্রকর শ্রীযুত চঞ্চলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

ভাত চাহিয়া লইল। বামুন ঠাকুর অবাক্! ঝি পান দিতে আসিয়া বলিল, "পরেশ বাবু! আপনার চোখ বড় লাল হইয়াছে।"

পরেশ খুব হাসিয়া উঠিল। যাহাকে সাধু ভাষায় বলে, 'অট্টহাস্য'। পরেশ হাসিতে হাসিতে উপরে চলিয়া গেল। ঝি বামুনঠাকুরকে বলিল, "কাণ্ডখানা কি?"

পরেশ তাহার ঘরে গিয়া দেখিল, তাহার বই, কাগজপত্র—সব বিশৃঙ্খল! ঘরের দেয়ালে কে কয়লা দিয়া লিখিয়া দিয়াছে—"সকলই বিচিত্র পরেশের কাণ্ড, গোড়া নাই আগা!"

পরেশ খুব হাসিতে লাগিল। সে কল্পনায় দেখিল, তাহার সঙ্গীরা তাহার কাগজপত্র তন্ন-তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু হারানিধি খুঁজিয়া পাইতেছে না। তাহার মাথায় ঝুনু-ঝুনু নূপুর বাজিতে লাগিল।—পরেশের চোখ বুজিয়া আসিতেছিল। তবু সে উঠিল। দরজার নিকট আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িল। জড়িত-কণ্ঠে বলিল, "দরজা বন্ধ! এখন বাহিরে যাও না দেখি!"

তাহার মনে হইল, সে ক্রমাগত উপরে উঠিতেছে, কিছুতেই থামিতে পারিতেছে না; আবার নামিতেছে, নামারও শেষ নাই!

ঝি উপরে আসিয়া জানালা দিয়া দেখিল, পরেশ শুইয়া আছে। ঝি বলিল, "পরেশ বাবু, আপনি অমন করিতেছেন কেন?"

পরেশ বলিল, "কে ও,— ঝি—? ঝি! আমার পা—আমার ডান পাটা কোথায় গেল, বলিতে পার?"

ঝি বলিল, "চুলোয়। এই ক'দিনেই এত? ও মা, কোথায় যাব।"

৭

অপরাহ্নে ক্রমে ক্রমে সকলে মেসে ফিরিল। পরেশের ঘরের দরজা বন্ধ। জানালা দিয়া মাণিক দেখিল, পরেশ নিদ্রিত।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। পরেশ তখনও নিদ্রিত। রাত্রি অগ্রসর হইল, পরেশ তখনও নিদ্রিত। ক্রমে ঠাঁই হইল, সকলে খাইতে গেল। পরেশ অনুপস্থিত। থাকহরি পরেশকে ডাকিতে গেল। কিন্তু পরেশ কোনও উত্তর দিল না।

থাকহরি উপর হইতে চীৎকার করিয়া বলিল, "কুম্ভকর্ণের নিদ্রা,—জাগাইতে পারিলাম না।"

মাণিক বলিল, "কেন?"

তখন ঝি পরেশের মধ্যাহ্ন-কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করিল। মাণিক পাত হইতে উঠিল; উপরে গেল; পরেশকে ডাকিতে লাগিল কিন্তু কোনও সাড়াশব্দ পাইল না। মাণিক উৎকণ্ঠিত হইল। ভাবিল, "এ কি হইল? পরেশ এ কি করিল? সে কি—? খুব ঘুমাইতেছে।—আচ্ছা, এখন ঘুমাও।—আগে জাগো, তার পর আজ তোমারই এক দিন, কি আমারই এক দিন।

৮

রাত্রি ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছে। উপরে নক্ষত্র-দীপ্তি। প্রকৃতি নিস্তব্ধ। মাণিক ঘুমাইতে পারিল না। পরেশের কথাই ক্রমাগত তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে জাগাইয়া রাখিতেছিল। মাণিক

উঠিল। দ্বারে ঘা। পরেশের ঘরের জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। সে শুনিল, পরেশ গোঁ গোঁ করিতেছে!

মানিক চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। মানিক অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল, "যা ভাবিয়াছি, তাই!" মানিক ডাকিতে লাগিল—"পরেশ! পরেশ!"

পরেশ তখন হিমালয়ে দেবদারু-কুঞ্জে 'তৃতীয়-খণ্ডে' বসিয়া মদনভস্ম দেখিতেছে; কে উত্তর দিবে?

মানিক আবার ডাকিল, দ্বারে ধাক্কা দিতে দিতে উচ্চকণ্ঠে ডাকিতে লাগিল,—"পরেশ! পরেশ! ও পরেশ বাবু!"

মানিকের উদ্বেগের কারণ ছিল। মানিকের মনটা সরল। সে স্নেহময়। সে পরেশের অনুরাগী। বন্ধু-বৎসল মানিক পরেশের অনুপস্থিতির অবসরে তাহার এই ভাবান্তরের কারণ সন্ধানের জন্য পরেশের ঘরে খানাতল্লাসী করিয়া একখানি 'ডায়েরী' পাইয়াছিল, এবং তাড়াতাড়ি তাহার কতক কতক পড়িয়াছিল। সে রোজনামচায় গদ্যও ছিল, পদ্যও ছিল। তাহার অধিকাংশই 'কাব্য' হইলেও, মানিকের সন্দেহ হইয়াছিল, পরেশ কাহারও প্রেমে পড়িয়াছে। রোজনামচার শেষের দিকে মানিক হতাশের আক্ষেপ দেখিয়াছিল। —নিশীথে শয্যাকণ্টকী ভোগ করিতে করিতে মানিক ভাবিতেছিল—পরেশ—ভাবপ্রবণ নিরীহ পরেশ—হতাশ কবি পরেশ,—নিরাশ প্রেমিক পরেশ হঠাৎ কিছু করিয়া ফেলিবে না ত?—কিছু করে নাই ত?

ঢং—ঢং করিয়া কোথায় একটা ঘড়ীতে দুইটা বাজিল। মানিকের চিন্তার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মানিক আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে মেস্-সভ্যদের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট 'ম্যানেজার'কে জাগাইয়া বলিল,—"ব্যাপার গুরুতর। পরেশ বোধ হয় বিষ খাইয়াছে।"

"সে কি?"

মানিক বলিল, "দুপুরবেলা শুইয়াছে। এখন বাজে দু'টো। সহজ মানুষ এতক্ষণ ঘুমাইতে পারে না। অজ্ঞান—অচৈতন্য। এখন গোঁ-গোঁ করিতেছে। ধাক্কায় দরজা ভাঙ্গিয়া দেখিলাম—পরেশের সাড়া-শব্দ নাই।"

মানিক ক্রমে সকলকে জাগাইয়া তাহার সন্দেহের কথা জানাইল। তখনই 'কাউন্সিল' বসিয়া গেল। কেহ বলে, "ডাক্তার ডাকি!" কেহ বলে, "এত রাত্রে কোথায় ডাক্তার পাবে?" কেহ বলে, "ডাক্তার আসিয়াই বা কি করিবে?"

রামহরি বলিল, "হাসপাতালে লইয়া চল।"

তাহাই কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। মানিক একখানা গাড়ী ডাকিয়া আনিল।

মানিক প্রভৃতি কয়েক জন অজ্ঞান-অচৈতন্য পরেশকে গাড়ীতে তুলিয়া মেডিকেল কলেজে লইয়া গেল।

৯

হাসপাতালে মামুলী প্রথামত পরেশের পাকাশয়ে ডুবুরী নামাইবার ব্যবস্থা হইল, অর্থাৎ, ডাক্তার 'ষ্টম্যাক্ পাম্প' প্রয়োগ করিয়া, পরেশের উদর হইতে ভুক্ত দ্রব্য বাহির করিলেন।

তাহার পর ডাক্তার পরেশকে জাগাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে পরেশের চেতনা ফিরিল। সে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। ডাক্তার তাহাকে জাগাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। শারীরিক ও মানসিক অবসাদে পরেশের চোখ বুজিয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহাকে বাধ্য হইয়া জাগিয়া থাকিতে হইল। ঘুমন্ত প্রকৃতির সহিত যুঝিয়া সে আরও ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া উঠিল।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘটনা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। লজ্জায়, ক্ষোভে তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। এক একটা পাখী যেমন ফাক-জ্যোৎস্নায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উষার সমাগম কল্পনা করিয়া ডাকিয়া উঠে, কিয়ৎক্ষণ আশ্রয়শাখার উপর উড়িয়া, আর পাঁচটা পাখীকে জাগাইয়া আবার নিজের নীড়ে স্থির হইয়া বসে, পরেশের মনের অবস্থাও সেইরূপ হইয়া উঠিল। স্মৃতিপটে অস্পষ্ট-ভাবে প্রতিফলিত ঘটনার পরম্পরায় সে বিড়ম্বনা ও লজ্জা ভিন্ন আর কিছু আবিষ্কার করিতে পারিল না। তাহার চেতনা একবার জাগে, সংশয়ের অবসান কল্পনা করিয়া দৈনন্দিন জীবনে ফিরিবার চেষ্টা করে, আপনি জাগিয়া, আত্মবিস্মৃত পরেশের স্মৃতিকে জাগাইয়া, নানাবিধ অস্পষ্ট চিন্তার সৃষ্টি করিয়া আবার সুপ্ত হইয়া পড়ে। কবির ভাষায় তখন পরেশের অবস্থা—'অচেতনে চেতন, ঘুমন্তে জাগা'। কিন্তু এই আলো ও ছায়ার সন্ধিক্ষণে পরেশের মনে একটা ধারণা ক্রমে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। সে অকারণে ও অতর্কিতে কতটা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ও লজ্জার শিকার হইয়া পড়িয়াছে, তাহা বুঝিয়া সে আপনার উপর নিষ্ফল ক্রোধে, নিয়তির উপর ব্যর্থ আক্রোশে অত্যন্ত ব্যথিত হইতে লাগিল। কেন এমন হইল? ইহার জন্য দায়ী কে? কোন্ অপরাধে সে এমন কঠোর বিড়ম্বনা ভোগ করিতেছে?

ডাক্তার পরেশকে একটু কাফী খাইতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন আছেন?"

পরেশ কোনও উত্তর দিল না, উত্তর দিতে পারিল না। সে ভাবিতেছিল, কেন জাগিলাম? এই ঘুমই শেষ ঘুম হইল না কেন? সে কল্পনায় অনুভব করিতে লাগিল, তাহার সুপরি-চিত ও অল্প-পরিচিত বন্ধু ও মানিকের মত অন্তরঙ্গ, অনতিক্রমণীয় আত্মীয়-স্বজনগণের সকৌতুক দৃষ্টি শত সহস্র নিশিত নির্দয় বাণের মত তাহাকে বিদ্ধ করিতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, 'আপনি কি খাইয়াছিলেন, মনে পড়ে?"

পরেশ চক্ষু মুদ্রিত করিল। চক্ষু মুদিয়া ডাক্তারের প্রশ্নের উত্তরদানের দায় হইতে নিস্তার লাভের চেষ্টা করিবামাত্র সে একটা নূতন সঙ্কটের সম্মুখীন হইল। বাহিরের দৃশ্য-জগৎ—ডাক্তার, হাসপাতাল, কাফীর পেয়ালা তাহার দৃষ্টির অতীত হইল বটে, কিন্তু সংবিতের বিদ্যুদ্বিকাশে তাহার মনের পটে আর একটা ছবি ফুটিয়া উঠিল।—সহসা সে দেখিল, যে পরিবারের বন্ধুত্ব, প্রীতি, স্নেহ ইদানীং তাহার জীবনের অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছিল, ঘটনার সমবায় অকস্মাৎ সেই পরিবারের হাসির কেন্দ্রে পরেশকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে! পরেশ মনের চক্ষু মুদ্রিত করিবার কৌশল জানিত না। দুনিয়ায় এই চক্ষুই স্বাধীন। মানুষ তাহাকে নিজের ইচ্ছার অধীন করিতে পারে না। পরেশও পারিল না। সে আপনাকে সুপ্ত,—এমন কি, লুপ্ত করিয়াও এই বিষম লজ্জা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সফল হইতে পারিল না।

১০

এমন সময়ে ডাক্তারের মনে পড়িল, তিনি পরেশের জঠর মন্থন করিয়া যে হলাহল তুলিয়াছিলেন, তাহা তখনও বোতলজাত করা হয় নাই। যে পাত্রে ছিল, তিনি তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু পাইলেন না।

যে 'কুলী' তাহা লইয়া গিয়াছিল, সে নূতন ব্রতী; এক জনের 'বদলী'। সেই আধারের 'বস্তু' যে বৈদ্যক বস্তুতত্ত্বের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ও অপরিহার্য্য, সে তাহা জানিত না। সুতরাং অবৈজ্ঞানিক মানব যাহা করে, সেও তাহাই করিয়াছিল;—ফেলিবার জিনিস ফেলিয়া দিয়াছিল।

ডাক্তার যখন তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "যেখান্‌সে পাও, আবী লে আও, নয় ত তোম্‌কো হাম্‌ সহজে ছোড়েঙ্গা নেহী", তখন হিন্দী ভাষা লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু হাঁসপাতালের সেই নব-ব্রতী ভৃত্যের বিন্দুমাত্র ভাবান্তর লক্ষিত হইল না।

একটা পাকা, পুরাতন, বখেয়া ভৃত্য বলিল, "বাবু! ও বুড়বক্‌ আছে। নয়া কি না। আপনার কথা সমঝ করিতে পারে না। হামি সব ঠিক করিয়া দিবে—আপনি গোসা করিবেন না।"

সেই রাত্রে আর এক জন আফিং খাইয়া হাঁসপাতালে আসিয়াছিল। হাঁসপাতালের এই হুঁসিয়ার ভৃত্য তাহারই খানিক ঢালিয়া আনিয়া ডাক্তারের নিকট উপস্থিত করিল।

ডাক্তার হারানিধি ফিরিয়া পাইলেন; তৎক্ষণাৎ তাহা বোতলসাৎ করিলেন; অজ্ঞাতসারে 'উদোর পিণ্ডী বুধোর ঘাড়ে' দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন! পরেশের বিধাতা পুরুষ সেই প্রবচনপ্রসিদ্ধ কুলতলায় বসিয়া হাসিতে লাগিলেন!

১১

দুর্ব্বল, অবসন্ন, সঙ্কোচে মুহ্যমান, লজ্জায় নতশির পরেশকে ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আফিং খাইয়াছিলে?"

পরেশ বলিল, "না।"

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তুমি আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছ, আবার মিথ্যা বলিতেছ? তুমি কলেজের ছাত্র। এমন খাটী মিথ্যা এ ক্ষেত্রে কোনও কাজে লাগিবে না, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না?"

পরেশ কোনও উত্তর দিল না। ম্যাজিষ্ট্রেট চটিয়া ছিলেন, পরেশের মৌনব্রত দেখিয়া আরও চটিলেন; বলিলেন, "সায়েন্স বলিয়া একটা জিনিস আছে, জান ত?—সায়েন্স বলিতেছে, তুমি আফিং খাইয়াছিলে। যে কেমিষ্ট পরীক্ষা করিয়াছেন, বিশ্লেষণ করিয়া আফিং পাইয়াছেন, তাঁহার সহিত কি তোমার শত্রুতা আছে? তিনি কি মিথ্যা রিপোর্ট দিয়াছেন?"

পরেশ একবার মনে করিল, সকল কথা খুলিয়া বলে। সেই সেন্তার বরফী! কিন্তু সে কথা ভাবিবামাত্র সমস্ত আদালত যেন তাহার চোখে উকীল বাবুদের ছিন্ন-ভিন্ন বিবর্ণ গাউনের মত সবুজ হইয়া উঠিল! সে 'বলি-বলি' করিয়াও বলিতে পারিল না।—তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল, বলিয়াই বা লাভ কি? 'সায়েন্স' যখন মিথ্যা কথা বলে না, বলিতে জানে না, বলিতে পারে না, তখন সত্যসন্ধ সায়েন্সের

সম্পূর্ণ বিরোধী 'জলজীয়ন্ত' সত্য বলিয়াই বা লাভ কি? কে তাহা বিশ্বাস করিবে? সুতরাং সে তুলসী-দাসের 'সব্ সে ভালা চুপ' নীতিরই অনুসরণ করিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "তুমি তোমার পক্ষসমর্থনের জন্য কোনও উকীল দিতে চাও?"

পরেশ বলিল, "না।"

এমন সময়ে এক জন 'হোমরা-চোমরা' বিখ্যাত উকীল এজলাসে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক মলিনবেশ বুড়া ছিল। সে উকীল বাবুর গাউন ধরিয়া টানিয়া পরেশকে দেখাইয়া দিল। উকীল দ্রুতপদে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমি এই আসামীর পক্ষসমর্থন করিব।"

পরেশের মাথায় যেন বজ্রপাত হইল।—আসামী! সে চমকিত হইয়া উঠিল।

দুনিয়া যে একটা জটিল প্রহেলিকা, ইতিপূর্ব্বে কবির কল্পনায় সে বহুবার তাহা অনুভব করিয়াছে। কিন্তু সে প্রহেলিকা এমন 'বস্তু-তন্ত্র', এমন সাংঘাতিক সত্য, তাহা সে জানিত না। 'আসামী'!—কবিতা পড়া, কবিতা লেখা, কবি হইবার দুরাকাঙ্ক্ষা—দুর্ব্বলতা হইতে পারে, কিন্তু তাহা কি 'অপরাধ'?—'আসামী'! বন্ধুদের বিদ্রূপে বিরক্তি—গাত্রে গণ্ডারের চর্ম্মের অভাববশতঃ সেই বিদ্রূপে বেদনাবোধ—একটু অসহিষ্ণুতা, 'যঃ পলায়তি, স জীবতি'—এই অমূল্য নীতির অনুসরণে যতীন বাহাদুরের বৈঠকখানায় পলায়ন—সেখানে পরেশের দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সবুজ-বরফীর—কি তার নাম ছাই!—আবির্ভাব—একটা লজ্জাকর প্রশ্নের উত্তরদানের বিষম সঙ্কট হইতে নিস্তার পাইবার আশায় নিরুত্তর থাকিবার উপায় ও সুবিধার হিসাবে সেই সবুজ-বরফী-ভক্ষণ—ইহাও criminal offence? যে পরেশ এ জীবনে বিজয়ার দিনও সিদ্ধির ফোঁটা কাটে নাই, সেই পরেশ সিদ্ধির বরফী খাইয়া আদালতে 'আসামী'! সমস্ত দুনিয়া তাহার দিকে চাহিয়া হো-হো, হা-হা, হিঃ-হিঃ, খিল্-খিল্, খল্-খল্ করিয়া হাসিতেছে। কি বিড়ম্বনা! কি বিষম বিড়ম্বনা! নিয়তির কি কঠোর বিদ্রূপ!

উকীল বলিলেন, "হুজুর! আমার মক্কেল ছেলেমানুষ—না বুঝিয়া একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে—"

ম্যাজিষ্ট্রেট।—কিন্তু সে বেশ বুঝিয়াই মিথ্যা কথা কহিতেছে। রাসায়নিক পরীক্ষায় আফিং পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু আপনার মক্কেল বলিতেছে, সে আফিং খায় নাই।"

উকীল পরেশকে জনান্তিকে পরামর্শ দিলেন, "স্বীকার কর। আফিং কি ওড়ানো যায়?"

আফিং? পরেশ ভাবিল, আমাকে জব্দ করিবার জন্য মাণিক ছিল, যতীন ছিল, এক মেস লোক ছিল, যতীন বাহাদুর ছিলেন, আমার অযাচিত-শত্রু সেই হিন্দুস্থানী ছিল; মরকত-হরিত বরফী ছিল, আমার দুর্ব্বুদ্ধি ছিল; তাহাতেও বিধাতার মন উঠিল না? আবার আফিং?

পরেশের সংশয় হইতে লাগিল, আমি কি ভুলিয়া যাইতেছি? আফিং খাইয়াছিলাম? সবুজ-বরফী কি এমন করিয়া স্মৃতিকে মুছিয়া দিতে পারে? আফিং! পরেশ কোনও মতে এ সমস্যার সমাধান করিতে পারিল না।

কিন্তু সে স্বীকার করিল না।—যাহা হয় হউক, মিথ্যা—নির্জ্জলা খাঁটী মিথ্যা—অদ্ভুত, ভিত্তিহীন, মিথ্যা বলিয়া সে পরিত্রাণ ভিক্ষা করিবে না।

উকীল আবার স্বীকার করিবার পরামর্শ দিলেন। পরেশের মন ঘড়ীর পেণ্ডুলমের মত দুলিতে লাগিল।

কিন্তু সে স্থির করিল, যে নিয়তি তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া যতীন বাহাদুরের বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, বড়-বাজার হইতে হিন্দুস্থানীকে বাহন করিয়া তাহার জন্য সবুজ-বরফী আনিয়াছিল, তাহার পর 'ভায়া হাঁসপাতাল' তাহাকে পুলিসকোর্টে আনিয়া 'আসামী'র কাঠগড়ায় খাড়া করিয়া দিয়াছে, সে যেখানে লইয়া যায়—যাক। আমি তাহার সহিত পারিয়া উঠিব না। কি আশ্চর্য্য! আফিং? সিদ্ধির বরফী আমার পেটে পড়িয়া আফিং হইয়া গেল!

হাকিম বলিলেন, "আমি তোমাকে জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিলাম। ভবিষ্যতে সাবধান—মানুষের জীবন খেলানা নয়, আত্মহত্যা মহাপাপ, ইহা যেন মনে থাকে।"

পরেশ ভাবিল, "কি অন্যায়! সবুজ-বরফী খাইলে ফাঁসী হয় না? আবার লোকালয়ে—"

পাহারাওয়ালা পরেশকে কাঠগড়া হইতে নামাইয়া লইয়া যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "সঙ্গে টাকা আছে, না বাড়ীতে খবর দিবেন?"

পরেশ বলিল, "আমি জরিমানা দিব না।"

* * * *

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে পরেশ মুক্তিলাভ করিল। উকীল বাবু আসিয়া বলিলেন, "এখন ঘরের ছেলে ঘরে যাও।"

পরেশ বলিল, "আমি জরিমানা দিব না।"

"জরিমানা দেওয়া হইয়াছে।"

"কে দিল?"

"তাহা ত জানি না—তাই ত!—আমি মনে করিয়াছিলাম, আপনাদেরই সরকার!"

পরেশ ধীরে ধীরে আদালতের বারান্দা অতিক্রম করিয়া সিঁড়ির উপর উপস্থিত হইল।

১২

পরেশ দেখিল, রাস্তার অপর দিকের ফুটপাথে তাহার মেসের কয়েক জন বন্ধু দাঁড়াইয়া আছে। পরেশ মনে মনে পৃথিবীকে মিনতি করিতে লাগিল, "তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি!"

এমন সময়ে কে পরেশের পিঠে হাত দিল, এবং কাসিতে ও হাসিতে মিশিলে জরাজীর্ণ কণ্ঠস্বরে যে মিশ্র সুরের সৃষ্টি হয়, সেই সুরে ডাকিল, "পরেশ বাবু!"

পরেশ ফিরিয়া দেখিল, মিষ্টার বি দত্তর বিশ্বাসী বুড়া সরকার!

সরকার বলিল, "ছি পরেশ বাবু, এমন কাজও করে?"

"কি কাজ সরকার ম'শায়?"

"আর কথায় কাজ কি? দিন কতক দেশে কাটিয়ে আসুন, মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আচ্ছা, পরেশ বাবু, এত লেখাপড়া শিখেছেন, 'প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ' ব'লে একটা কথা আছে, তা কি কোনও কেতাবে পান নি?"

পরেশ বিস্মিত হইয়া বলিল, "এর মানে কি?"

"মানে আপনি জানেন, আর তাঁরা জানেন। আমরা তাঁবেদার, হুকুম তামিল করি।"

"আমার জরিমানার টাকা কি আপনি দিলেন ? কেন ?"

"মনিবের হুকুম তামিল করিয়াছি। মেমসাহেব বলিলেন,—'বেচারা মাথা-পাগলা—উহাদের সহিত হাসিয়া কথা কহিবারও যো নাই। দেখ, কি ফ্যাসাৎ বাধাইয়াছে। যাও, একটা ভাল উকীল দিও—"

পরেশের মনে হইল, পৃথিবী ঘোরে বটে, ভূগোল মিথ্যাবাদী নহে! "দিনের আলো নিভে এলো, সূর্য্যি ডোবে ডোবে'ও সেই নিদাঘের মধ্যাহ্নে সত্য হইয়া উঠিল! সমস্ত অসম্ভব আজ সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, আর সকলে মিলিয়া তাহাকে ধলন্দায় পাঠাইবার চেষ্টা করিতেছে।

অত্যন্ত আয়াসে কথা কহিবার শক্তি সঞ্চয় করিয়া পরেশ বলিল, "সরকার ম'শায়, আপনি বিশ্বাস করুন আর না করুন, সত্য বলিতেছি, আমি আফিং খাই নি,। কিন্তু আপনার মুখে যা শুন্‌ছি, এবার বোধ হয় বিষ খাব।"

শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

পদীর আয়ি

'পদীর আয়ি'র পিতা-মাতার প্রদত্ত নাম উত্তমপুরের কেহ না জানিলেও সেখানে এমন লোক এক জনও ছিল না, যে তাহাকে না চিনিত। সে তাহার নাতিনী 'পদী' ওরফে পদ্মমুখীর নামটিকে এক স্নেহ-মধুর সম্বন্ধের দুর্ভেদ্য বর্মে সুরক্ষিত করিয়া ক্ষুদ্র উত্তমপুর গ্রামে অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল।

পদীর আয়ি কোথা হইতে আসিয়া উত্তমপুর গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাও কেহ জানিত না; এবং পরিচারিকা-সমাজে সে এমন খ্যাতি লাভ করিয়াছিল যে, তাহাকে চাকরীতে বাহাল করিবার সময় তাহার পূর্ণ পরিচয় জানিবার জন্য কাহারও আগ্রহ হইত না। তাহার মধুর ও সহানুভূতিসিক্ত সরস কথায় লোকের মন সহজেই রসাভ্র হইয়া উঠিত, কিন্তু তাহার কঠোর কটূক্তির সুতীব্র ঝঙ্কারে ও কলহের বিকট আস্ফালনে তাহার প্রতিবেশিগণকে নিরন্তর বিব্রত থাকিতে হইত। পদীর আয়িকে বেশী লোক স্নেহ করিত কি বেশী লোক ভয় করিত—এ পর্য্যন্ত তাহার 'ষ্ট্যাটিস্‌টিক্স' লওয়া হয় নাই।

বিধবা যুবতী কন্যা পদীর মাকে লইয়া সে উত্তমপুরে চাকরী করিতে আসিয়াছিল। পদীর বয়স তখন দুই বৎসর। তাহার পর পাঁচ বৎসর উভয়ে গতর খাটাইয়া যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহা ব্যয় করিয়া উত্তমপুরের 'বোরেগীপাড়া'য় একখানি ঘর তুলিয়াছিল।—পাঁচ-চালা একখানি খড়ো ঘর; কন্যা ও নাতিনী সহ পদীর আয়ি রাত্রিকালে এই ঘরে শুইয়া থাকিত,—সকালে চাকরীতে বাহির হইত।

পদীর মার স্বভাব চরিত্র বড় ভাল ছিল না; বিধবা গোপযুবতী, তাহার উপর একটু রূপও ছিল, এবং গ্রামে বখাটে ডাঙপিটে লোফেটেরও অভাব ছিল না; বিশেষতঃ রূপসী বলিয়া তাহার বিশ্বাস থাকায় সে 'ধোপদস্ত' পাড়াপেড়ে শাড়ী ও বিলাতী কাচের চুড়ি কোন দিন ত্যাগ করে নাই। মনিববাড়ীর চক্‌চকে পিতলের ঘড়াটি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে সে যখন দত্তদের পুকুরে জল আনিতে যাইত, তখন পুকুরপাড়ের বটগাছের তলায় রাধু নাপিতের বড় ছেলে নদেরচাঁদকে চারিআনার রঙ্গিন গামছা কাঁধে লইয়া বায়ু সেবন করিতে দেখিত। শেষে উভয়ের এই প্রাত্যহিক সাক্ষাতের কি ফল হইল, কেহ জানে না; কিন্তু একদিন সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া পদীর আয়ি দেখিল, তাহার মেয়ে ঘরে নাই, এবং ঘণ্টা দুই পরে সে শুনিতে পাইল—নদেরচাঁদও ফেরার! সুতরাং নিষ্কর্ম্মা কুৎসাপ্রিয় প্রতিবেশীরা বিধবা গোপাঙ্গনা ও নরসুন্দরনন্দনের এই আকস্মিক অন্তর্ধানের মধ্যে একটি কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ অনুমান করিয়া তাহাদের অবসর কালকে পরম উপভোগ্য করিয়া তুলিল।

সে দিন রাত্রে পদীর আয়ির সতেজ কণ্ঠের সমুচ্চ ঝঙ্কারে বোরেগীপাড়া সরগরম হইয়া

GOETHE
DE MUSSET

উঠিয়াছিল, ভিন্ন পাড়ার লোকেরও তাহা শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; কিন্তু তাহা মুসলমান বাওয়া বলিয়া কেহ সন্দেহ করে নাই।

অগত্যা পদীর সমস্ত ভার পদীর আয়ির স্কন্ধেই পড়িল। নাতিনীকে লইয়া সে বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল, এবং তাহার বিবাহ দিয়া তাহার একটা 'হিল্লা' করিয়া দিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। কিন্তু কুলত্যাগিনীর কন্যাকে কেহ বিবাহ করিতে চাহিল না। পদীর আয়ি শেষে তাহার মনিব দেবেন্দ্রনারায়ণ বাবুকে মুরুব্বী ধরিল।

দেবেন্দ্র বাবু বড় কোমলপ্রকৃতির মানুষ, কিন্তু কিছু মুখর। দাসীর আব্দার শুনিয়া তিনি চটিয়া বলিলেন, "পদীর মা পদীকে ফেলে রেখে চ'লে যেতে পার্লে, আর তুই মেয়েটাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি আরম্ভ কর্‌লি কেন?—আমি কি ঘটক না প্রজাপতি ঠাকুর যে, তোর নাতনীর বিয়ে দিয়ে দেব?"—পদীর আয়ি হঠাৎ বসিয়া পড়িয়া তাঁহার দুই পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনি আমার বাপ, আপনাকে ধর্‌বো না ত কি আপনার শিবু খান্‌সামাকে ধর্‌বো?"—দেবেন্দ্র বলিলেন, "পা ছাড় মাগী। তোর অত্যাচারে দেখ্‌ছি আমাকে কোন্ দিন দেশত্যাগী হতে হবে।"

পদীর আয়ি বলিল, "মা বল্‌ছিলেন, আপনি বাবা বিশ্বেশ্বর দর্শন করতে কাশী যাবেন, মাও যাবেন। আমাকে না নিলে বিদেশে মায়ের যত্ন-টত্ন করবে কে?—সেই জন্যে আরও তাড়াতাড়ি পদীর এতটা 'হিল্লে' ক'রে দিতে চাচ্ছি। মা বলেছেন, বিয়ের 'খরচপত্তোর' ব'লে আমাকে দেড় কুড়ি টাকা আর পদীকে একখানা খাসা লাল চেলীর কাপড় কিনে দেবেন। আপনি ছুঁড়ীর বিয়েটা দিয়ে দিলেই আমি নিশ্চিন্তি হই।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ ক্রোধপ্রকাশপূর্ব্বক বলিলেন, "গিন্নীর মাথায় হাত বুলিয়ে এরই মধ্যে ত্রিশ টাকার যোগাড় ক'রে ফেলেছিস্? কি সর্ব্বনাশ! না,—তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। টাকা কি গাছের ফল যে, গিন্নী তোকে খাঁ ক'রে ত্রিশ টাকা দান করতে চাইলেন? প্রজাদের এবার কোষ্টা বিক্রী হলো না, এক পয়সা আদায় নেই, এ দিকে খরচের লম্বা ফিরিস্তী! যদি বা দু'দিন বিলম্বে কাশীবাসী হতাম ত আর দু'মাসও ঘরে টিঁক্‌তে দিলে না। তুই বেটী দেখ্‌ছি আমাকে মজাবি!—ভাদ্র মাসে ঝি-চাকর তাড়াতে নেই, থাক্ এ কদিন, আশ্বিনমাস পড়তে না পড়তে তোকে দূর ক'রে দেব।"

পদীর আয়ি বলিল, "আপনি তো আমাকে তাড়ানোর উপরেই রেখেছেন, বাপে মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু মায়ে দুবেলা দুমুঠো ভাত না দিয়ে থাক্‌তে পারেন না।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বলিলেন, "মর বজ্জাত্ মাগী! তোর যে ভারি আস্পর্দ্ধা।"

কিন্তু পদীর মার এই স্পর্দ্ধার যথেষ্ট কারণ ছিল। পদীর মা কর্ত্রীর নিতান্ত অনুগত ছিল, তাহার ছেলে দুইটিকে সে-ই মানুষ করিয়াছিল। রোগের সময় সে কর্ত্রীর সেবা করিত, তাঁহার প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন করিত, এবং সর্ব্বদা স্তবস্তুতিতে তাঁহাকে এমন মুগ্ধ করিত যে, সেই সরলা স্নেহশীলা মধুর-হৃদয়া জমীদারগৃহিণী তাহার ও তাহার নাতিনীর জন্য নিয়মিতরূপে অন্ন যোগাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, সে তাঁহার নিকট যখন যে আব্দার করিত, তিনি প্রসন্নমনে তাহাই পূর্ণ করিতেন। নাতিনীর জ্বর হইয়াছে, একটু মিছরী চাহিলে তিনি তাহাকে যে মিছরী দিতেন, তাহাতে একমাস

তাহার সরবত খাওয়া চলিত। সেদিনের দিন পদ্মার মা একদিন শুনিল, পদ্মার আয়ির প্রত্যহ এক 'থোরা মিছরীর সরবৎ না খাইলে চোঁয়া ঢেকুর উঠে, পদ্মার মা কৌতূহলী হইয়া পুকুরের ঘাটে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি, রোজ সরবৎ খাস, এত মিছরী কোত্থেকে জোটে?" পদ্মার আয়ি সাহঙ্কারে বলিল, "বাবুর সংসারে চাকরী করি, মায়ের কাছে চাইলে সোনার 'দেনা' পাই, এক আধসের মিছরী 'তুশ্চু' কথা।" পদ্মার মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "সাধে কি' ভাই লোকে চাকরী, 'আর জন্মে' তুই কত তপিস্যে করেছিস, তাই এতবড় চাকরী পেয়েছিস্। আর আমার যেমন পোড়াকপাল, তেমনই উনোনমুখো মুনিব! একঘণ্টা সে দিন খেতে দেরী হয়েছিল।---মানুষেরই ত ভাই 'শরীল', খেটে খুটে এসে যেমন শুয়েছি --আর কোথা দিয়ে বেলা গেল, টের পাইনি, তাই খেতে একটু দেরী হয়েছিল, মিন্‌সে যেন মার মূর্ত্তি, বলে, এক বেলার মাইনে কেটে নেব। গিন্নী আবার তারে বাড়া, বলে কি না, এবার পুজোয় কাপড় পাবি নে। এমন চাকরীর মুখে আগুন!"

পদ্মার আয়ি বলিল, "অমন কথা বলিস্‌নে বোন্। আমার মুনিবের কি দয়ার 'শরীল', মায়ের আবার তারে বাড়া দয়া। পুজোর সময় আমার নাতনীকে দিয়েছে কেমন কল্কাপেড়ে শাড়ী, শাড়ী ত নয় যেন গরদ! আর আমাকে দিয়েছেন নাটিম মার্কা একযোড়া ধুতি। কি বলবো, শাড়ী পরার আর বয়েস নেই!"

পদ্মার মা বলিল, "তা সখ্ হয়ে থাকে ত না হয় এই বুড়ো বয়সে একবার শাড়ী প'রে বাহার দে। তোর মেয়েও ত বাহার দিতে কসুর করেনি, এখন মজাটা টের পাচ্ছিস্! নাতনীকে নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছিস্!"

কন্যার কুচরিত্র সম্বন্ধে পদ্মার মা এই কদর্য্য ইঙ্গিত করিবামাত্র পদ্মার আয়ি রণরঙ্গিণী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া যে কোন্দল আরম্ভ করিল, তাহাতে সমস্ত পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল, তাহার চীৎকার শুনিয়া পল্লীরমণীগণ বলাবলি করিতে লাগিল, "ঐ রে! পদ্মার আয়িকে কে বুঝি ঘাঁটিয়েছে। মাগী যেন হাঁড়ি-চাঁচা, গলার আওয়াজে কানে তালা লাগে!"

কিন্তু পদ্মার মাও কলহ-বিদ্যায় প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ। সে তখন পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া উঠিয়াছিল, তাহার কক্ষে জলপূর্ণ পিতলের ঘড়া। সেক্ষণে ঘড়াটি কক্ষে লইয়াই পদ্মার আয়িকে দশ কথা শুনাইয়া দিতেছিল, কিন্তু পদ্মার আয়ি যখন তাহার পদ্মার পিতৃত্বে সন্দেহ প্রকাশ করিল, তখন আর পদ্মার মার ধৈর্য্য-ধারণের শক্তি রহিল না, পথের উপরেই সে ঘড়াটি নামাইয়া রাখিয়া, তাহার বস্ত্রের সিক্ত অঞ্চল কটিদেশে বাঁধিয়া, উভয় হস্ত পদ্মার আয়ির সম্মুখে প্রসারিত করিয়া, তাহার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে আক্রমণপূর্ব্বক গালি দিতে লাগিল। পদ্মার আয়ি তখন ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া পথের উপর ধুপ করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং মাটীতে দুই হাত রাখিয়া আঙ্গুল মটকাইতে মটকাইতে বলিল, "নিপাত যা! নিপাত যা! তিন দিনের মধ্যে যদি তোর মুখে কুড়িকুষ্ঠ না হয় ত আমি গয়লার মেয়ে নই।"

পদ্মার মা আর সেখানে দাঁড়াইল না, সে ঘড়াটি তুলিয়া লইয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "তুই হাড়ির মেয়ে, তুই মুচি, মুদ্দোফরাস, ডোম, মেথরের মেয়ে!" পদ্মার মা ঘড়ার জল হড় হড় করিয়া পথে ঢালিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার পুষ্করিণীতে নামিল, এবং ডুব দিয়া এক ঘড়া জল লইয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

পদীর আয়ি রাগে গর-গর করিতেছিল। সেও জলে নামিয়া দুই একটা ডুব দিয়া তাড়াতাড়ি তীরে উঠিল, এবং পঞ্চার মাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "শোন্ হারামজাদী!"—সে কলহের আর এক অঙ্ক আরম্ভ করিবে, এমন সময় তাহার মুনিব দেবেন্দ্র বাবুর খানসামা গয়ারাম, বাবুর স্নানের জল লইতে আসিল। সে পদীর আয়িকে বলিল, "তুমি তো এখানে ঝগড়া কত্তে লেগেচ, ওদিকে মা-ঠাক্‌রুণ রেগে আগুন হয়েছেন, ঠাকুর হেঁসেলে গিয়ে না পাচ্ছে তরকারি কোটা, না পাচ্ছে মশলা বাটা। তোমার আক্কেল কেমন?"

পদীর আয়ি অত্যন্ত ভালমানুষের মত মুনিববাড়ী প্রবেশ করিল, জলের ঘড়া রাখিয়া সিক্ত বস্ত্র পরিবর্তনপূর্বক সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিতেই দত্তগৃহিণীর সম্মুখে পড়িয়া গেল। তিনি তাহাকে সরোষে বলিলেন, "তোর আক্কেল কেমন লো! পুকুরে গিয়ে কি ঘুমুচ্ছিলি? না কার সঙ্গে কোঁদল বাধিয়েছিলি? যত ভালমানষি করি, ততই তোর 'আস্পর্দ্ধা' বেড়ে যাচ্ছে। তোকে দিয়ে আর আমার কাজকর্ম চলবে না, তোর পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে চ'লে যা। আমার পয়সা থাকে ত চাকরাণীর অভাব হবে না, ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব।"

পঞ্চার মার সহিত কলহ করিয়া পদীর আয়ির মেজাজ গরম হইয়াছিল; দত্তগৃহিণী তাহার অনেক অত্যাচার সহ্য করিতেন বলিয়া সে তাঁহাকে তেমন ভয় করিত না, সে মশলা বাটিতে বাটিতে বলিতে লাগিল, "নাইতে গিয়ে এক লহমা দেরী হয়েচে, তাইতেই কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড। পাড়াকুঁদুলীরা গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করতে আসবে, আমি তার জবাব দিতে পাব্‌ব না, জবাব দিতে গেলে আমার চাকরী থাকবে না। না থাক্‌লো চাকরী, এতই বা কি? হবত বজায় থাক্‌লে ঢের জায়গায় চাকরী মিলবে। চাকরাণীর অভাব নেই, চাকরীরই বা কি অভাব? ঐ ত রেজেষ্টারবাবু হাকিম ঝি পাচ্চে না, আমাকে রাখবার জন্য তিন বেলা খোসামোদ করছে—তা আছি এক জায়গায় অনেক দিন—ছেড়ে যেতে মন সরে না। এত লাথি-ঝাঁটা খেয়ে চাইনে চাকরী কর্‌তে। কাল থেকে আমি সেখানেই লাগ্‌বো, তোমরা চাক্‌রাণী দেখে নাও।"

দত্তগৃহিণী পদীর আয়ির কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি কোমলহৃদয়া স্নেহশীলা রমণী হইলেও দাসীর এই ধৃষ্টতা তাহার অসহ্য হইল। তিনি বলিলেন, "কাল থেকে যাবি কেন? আজই চ'লে যা, কে তোকে থাকবার জন্যে সাধছে। আসুন কর্ত্তা বাড়ীর মধ্যে, আমি তাঁকে সব কথা বলছি, আজ বিকালে তোর পাওনাগণ্ডা চুকিয়ে দেবেন।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বাবু মধ্যাহ্নে আহারে বসিয়া পদীর আয়ির ব্যবহারের কথা শুনিলেন, কিন্তু কোনও মতামত প্রকাশ করিলেন না। ঝি ভাবিল, তিনি এ সম্বন্ধে কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিবেন না। সে মধ্যাহ্নে যথানিয়মে ঠাকুরের প্রদত্ত ভাত-তরকারী পিতলের গামলায় তুলিয়া গামলাখানি গামছা দিয়া ঢাকিয়া লইয়া বাড়ী চলিল।

পল্লীগ্রামের দাসীরা মনিব-বাড়ীতে বসিয়া আহার করে না; ইহার কারণ, বসিয়া খাইলে যাহা পেটে ধরে, তাহার অধিক পাওয়া যায় না; কিন্তু ভাত-তরকারী বাড়ী লইয়া যাইলে পরিমাণে কিছু অধিক পাওয়া যায়। এই নিয়মে পদীর আয়ি প্রত্যহ যে অন্ন-ব্যঞ্জন পাইত, তাহাতে দুই জন

জোয়ানের অনায়াসে ক্ষুন্নিবারণ হইতে পারে। সে ভাত ব্যঞ্জন তাহার কুটীরে লইয়া গিয়া কতক নিজে খাইল, কতক তাহার নাতিনীকে খাওয়াইল, এবং ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন-ব্যঞ্জন সন্ধ্যার পর নাতিনী খাইবে বলিয়া একটা খোরায় ঢাকিয়া রাখিল।

আহারান্তে সে মেঝের উপর একখানা ছেঁড়া মাদুর বিছাইয়া ঘণ্টা দুই ঘুমাইয়া লইল, তাহার পর পুষ্করিণী হইতে এক কলসী জল আনিয়া পিতলের গামলাখানি ও কাঁসার বাটীগুলি ধুইয়া লইয়া মনিব-বাড়ী কাজে চলিল।

দেবেন্দ্রনারায়ণের পরিবারবর্গ মধ্যাহ্নে আহারাদি শেষ করিলে, উচ্ছিষ্ট পড়িয়া থাকে, অপরাহ্ণে তাহা পরিষ্কার করাই পদার আয়ির দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের একটি অঙ্গ। সে এঁটোকাঁটা ফেলিয়া ঘর ধুইয়া ও বাসন মাজিয়া পুকুর হইতে গা ধুইয়া আসিল, তাহার পর একটা ঘড়া লইয়া পানীয় জল আনিতে যাইতেছে, এমন সময় দেবেন্দ্রনারায়ণের সরকার তারক বিশ্বাস তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বাবু আজ থেকে তোকে জবাব দিয়েছেন, আর তোকে কাজ করতে হবে না, আজ মাসের সাতাশে, এখনও মাসের তিন দিন বাকি আছে, তা এ তিন দিনের মাইনে কাটতে চাইনে, তোর দেড় টাকা মাইনে বাকি আছে, নিয়ে চ'লে যা। আর এ বাড়ীতে আসিস্ নে।"

সরকার একটি টাকা ও একটি আধুলি তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। উড়ে চাকর মধুরা বারান্দায় বসিয়া বাবুর কাপড় কোঁচাইতেছিল, সে উঠিয়া আসিয়া বলিল, "কলসী রাখ্, তোকে জল আনতে হবে না, আমি জল এনে দিচ্ছি। কা'ল সকাল থেকে নতুন ঝি আসবে, সে কাজ করবে। মতে তোর এত তেজ হইল যে, তু মা ঠাকুরাণীর সাত্ মুখামো করিলি।"

সত্য সত্যই চাকরী যাইবে—পদার আয়ি ইহা একবারও মনে করে নাই; একবার সে মনে করিল, গৃহিণীর কাছে গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে; কিন্তু সে ইংরাজের আফিসের বাঙ্গালী কেরাণী নহে, সামান্য অপরাধে যে মনিব চাকরী কাড়িয়া লয়, সে তাঁহার নিকট গিয়া স্তব স্তুতি করিবে? হঠাৎ তাহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল, সে টাকা দেড়টা কুড়াইয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল, তাহার পর সরকারকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 'যার এক দুয়োর বন্ধ, তার শতেক দুয়োর খোলা। তা সরকার মশায়, নূতন ঝি বাহাল করলেন কাকে?"

সরকার বলিল, "পঞ্চার মাকে; বেটী ক'দিন থেকে চাকরীর জন্যে হাঁটাহাঁটি করচে, কা'ল থেকে তাকেই বাহাল করবো।"

পদার আয়ি আর সেখানে দাঁড়াইল না, নাতিনীর হাত ধরিয়া দত্তবাড়ী ত্যাগ করিল; তাহার পর সন্ধ্যাকালে তাহার অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীরে প্রবেশ করিয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল, এবং চক্ষুর জলে মাটী ভিজাইতে লাগিল। পদী কাঁদিয়া বলিল, "আইয়ো, ও আইয়ো, আমার ভয় লাগচে, পিদিম জ্বাল।"

তাহার আয়ি গর্জ্জন করিয়া বলিল, "তুই মর্, আমার জ্বালা জুড়োক! তোর মা গেল, তোকে নিয়ে যেতে পারলো না, আপদটাকে আমার ঘাড়ে ফেলে গেল। তোর জন্যেই ত আমার যত জ্বালা!"—ভাত, তরকারী ঢাকাই পড়িয়া রহিল, সে রাত্রে আর উঠিয়া

পদীকে খাইতে দিল না; পদী ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার আয়ির কোলের কাছে ঘুমাইয়া পড়িল।

পদীর আয়ি দত্তবাড়ীর চাকরী ছাড়িয়া দিয়াছে শুনিয়া, পরদিন প্রভাতে গ্রাম্য সবরেজিষ্টারের স্ত্রী গিরি ঠাকুরাণী রেজিষ্ট্রী আফিসের আরদালী কুড়ন ঘোষকে তাহার নিকট পাঠাইলেন।

কুড়ন ঘোষ পদীর আয়ির কুটীরে আসিয়া বলিল, "বেয়ান ঘরে আছ? আমার সঙ্গে চল, আমাদের হাকিমের পরিবার তোমাকে ডাকচেন।"

পদীর আয়ির মাসতুতো ভগিনীর একটি ভাসুরঝির সহিত কুড়ন ঘোষের পিসের দাদার শ্যালকের নাতির বিবাহের কথা চলিতেছিল, এই সূত্রে পদীর আয়ি কুড়নের বেয়ান।

কুটুম্ব গৃহদ্বারে দেখিয়া পদীর আয়ি তাড়াতাড়ি একখানি ছেঁড়া চট দ্বারের নিকট প্রসারিত করিয়া তাহাকে বসিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু কুড়ন ঘোষ না বসিয়া বলিল, "না, আর বোসবো না, আপিসের বেলা হলো, তা গিন্নী মা খবর দিয়েছেন, আসবে কি না?"

পদীর মা বলিল, "কেন গা? আমাকে তাঁর কি দরকার?"

কুড়ন বলিল, "তুমি ব'সে আছ নাকি? তাই চাকরীর জন্যে ডেকেছেন।"

পদীর মা বলিল, "না বেয়াই, হাকিম-টাকিমের বাসায় আমার চাকরী করা পোষাবে না। সে ঠাকরুণকে আমি জানি, চাকর-চাকরাণীর কোন কাজ তার পছন্দ হয় না, উঠতে বসতে টিক্-টিক্ করে, আর ছ'মাসে ন'মাসে মাইনে দেয়, তাতেই ত তার কাছে চাকরাণী টিকতে পারে না। তা বামনের মেয়ে ডেকেচে—যাব এক সময়।"

কুড়ন বলিল, "বেয়ানের যে ভারি লম্বা লম্বা কথা, তবু যদি চাকরী থাকতো।"

পদীর আয়ি বলিল, "কারও কাছে ত চোর দায়ে ধরা পড়িনি যে, কথা বলতে ভয় পাব। পরমেশ্বর না হয় ভাতই দেন নি, গতর দিয়েছেন ত। গতর থাকলে আর ভাতের ভাবনা নেই।"

সম্মুখ-যুদ্ধের সম্ভাবনায় কুড়ন ঘোষ পলায়ন করিল। পদীর আয়ি গিরি ঠাকুরাণীর সহিত দেখা করিয়া জানাইয়া আসিল, "সে চিরদিন জমীদারবাড়ীতে চাকরী করিয়া আসিয়াছে, অন্য জায়গায় বাঁধা মাহিনায় চাকরী করা তাহার পোষাইবে না।"

সে কোথাও চাকরী লইল না, অথচ জমীদারবাড়ীতেও গেল না, চাকরী করিয়া যে দশ টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া খাইতে লাগিল।

শীতের প্রারম্ভে বঙ্গের অনেক পল্লীতে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সহিত নিউমোনিয়া দেখা দিল। উত্তমপুরের অধিকাংশ পরিবার এই সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইল, অবশেষে ইহা জমীদারবাড়ীতেও প্রভাব বিস্তৃত করিল; দত্তগৃহিণী ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন; দুই দিন পরেই তাঁহাকে নিউমোনিয়ায় ধরিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ বাবু মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। ক্রমে পরিবারস্থ সকলেই একে একে শয্যা গ্রহণ করিল, সেই বৃহৎ জমীদার-পরিবারে কাহারও মুখে জল দিবার লোক রহিল না।

পদীর আয়ি তাহার ভূতপূর্ব্ব মনিবের বিপদের কথা শুনিতে পাইল। সে আর তাহার কুটীরে বসিয়া থাকিতে পারিল না। সুদীর্ঘ সাত বৎসর সে যাহার অন্নে জীবনধারণ করিয়াছে, যিনি তাহার

সকল আব্দার সহ্য করিয়াছেন, সকল অভাব দূর করিয়াছেন, রোগে ঔষধ-পথ্য দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তিনি আজ সাংঘাতিক রোগে আক্রান্ত হইয়া রোগশয্যায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন। একদিন তিনি তাহাকে রূঢ় কথা বলিয়া তাহাকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়াছেন বলিয়া এই বিপদের সময় সে তাঁহাকে দেখিবে না? পদীর আয়ি কাহারও অনুমতি না লইয়া দেবেন্দ্রনারায়ণের দ্বিতলে উঠিল, এবং রোগিণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার সাত বৎসরের পুরাতন অধিকার পুনর্গ্রহণ করিল। সে দগ্ধগৃহিণীর পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার উত্তপ্ত শীর্ণ কম্পিত পা দুখানি কোলে তুলিয়া লইল; মনিব-পত্নীর অবস্থা দেখিয়া তাহার উভয় চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, সে গদগদস্বরে বলিল, "মা, তোমার এমন দশা হয়েছে, তা কি একবার খবর দিতে নেই?"

গৃহিণী নির্জ্জীব দেহে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিলেন, পদীর আয়ির কথা শুনিয়া চক্ষু খুলিয়া নিষ্প্রভদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার চক্ষুতেও সহসা অশ্রুর উৎস উথলিয়া উঠিল, অথচ ওষ্ঠে ম্লান হাসি ফুটিল। যেন এক পশলা বৃষ্টির ভিতর হঠাৎ সূর্য্যালোকের আবির্ভাবে প্রকৃতির শ্যামল বক্ষে অপূর্ব্ব সুষমা বিকসিত হইল। গৃহিণী ক্ষীণস্বরে বলিলেন, এতদিন পরে তোর মাকে মনে পড়লো ঝি! রাগ ক'রে তাড়িয়েছিলাম ব'লে কি আসতে নেই? কিছু মনে করিস নে। আমার যাবার সময় হয়েছে, এবার আর বাঁচবো না পদীর আয়ি!"

পদীর আয়ি চক্ষু মুছিয়া বলিল, "ষাট ষাট, ও কথা কি বলতে আছে মা। আমার যত চুল, তত বছর তোমার পেরমায় হোক্। সোয়ামি পুত্তুর নিয়ে ঘর কর মা। রাগ ক'রে এত দিন আসি নি, এ পত্তানি আর যাবে না। আর আমি যাচ্ছিনে মা! বাবু তাড়ালেও যাব না। আমি তাগতের জোরে তোমাকে সারিয়ে তুলবো। আমার সেবা না পেলে তুমি সারতে পারবা না মা!"

সেই দিন হইতে পদীর আয়ি রুগ্নার পরিচর্য্যাভার গ্রহণ করিল, এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে দিবা-রাত্রি জাগিয়া যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া গৃহিণীকে নিরাময় করিয়া তুলিল।

দুর্দ্দিনের মেঘ কাটিয়া গেল। রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া গৃহিণী পুনর্ব্বার চলিতে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু পদীর আয়ি সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে থাকিতে লাগিল।

দীর্ঘকালেও গৃহিণীর শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসকের উপদেশে দেবেন্দ্রনারায়ণ বাবু বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য পুরীযাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি পদীর আয়ির প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া সচ্ছল অবস্থাপন্ন একটি গোপপুত্রের সহিত পদীর বিবাহ দিলেন। পদীর মায়ের কলঙ্কের জন্য গোয়ালারা প্রথমে বরের বাপকে অনেক ভয় দেখাইয়াছিল, এবং পদীকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিলে তাহাকে একঘরে করিবার পরামর্শও করিয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্র বাবু যখন গোয়ালাদের দুই এক জন চাঁইকে ডাকাইয়া জানাইলেন, এই বিবাহে গোলমাল পাকাইলে তাহারা তাঁহার কোন ক্ষেতে গরু চরাইতে পারিবে না, এবং তাহারা যে উটবন্দী জমীতে চাষ করে, তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে, তখন তাহাদের ষড়যন্ত্র ফাঁসিয়া গেল। তাহারাই বরকর্ত্তা সাজিয়া বিবাহ দিতে আসিল।

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে পদীর আয়ি গৃহিণীর সহিত পুরুষোত্তমে চলিল। দেবেন্দ্রনারায়ণ

হাসিয়া বলিলেন,"পদীর আয়ি, তুই তোর জিদ বজায় রেখেছিস্!" পদীর আয়ি আনন্দে চক্ষু মুছিয়া বলিল, "হাঁ, বাবা, আমি গোয়ালার মেয়ে। আমি ত বলেছিলাম, বাপে মেয়েকে তাড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু মায়ে দুবেলা দুমুঠো ভাত না দিয়ে থাক্‌তে পারে না, আমার কথা সত্যি কি না?"

পদীর আয়িকে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনারায়ণের আশ্রয় ত্যাগ করিতে হয় নাই।

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়।

স্বরলিপি।

রামকেলি—ঢিমে তেতালা।

দীন দয়াময় প্রভু ভুল না অনাথে,
জীবন-সাগরে ভাসি চাহি তব পথে।
নয়ন মেলিয়া দেখি তোমারি আলোকে ;
প্রভু, স্থান দিও প্রভু, তব চরণকমলে।
তুমি দেখা দাও, এসেছি তব দুয়ারে
প্রাণ মন দিনু মম, সঁপিনু তোমারে,
দয়া কর মোরে, রেখ তুমি পাদপদ্মে।

কথা, সুর ও স্বরলিপি :—শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

১ | ২ | ৩ | ●
| পা দা দা পা | ণদপদা দপা দপা মা | মা পা মগা ঋা | গমা পপা মা গমা
| দী ০ ন দ | য়া ময় প্রভু ০ | ভু ল না অ | না ০ থে ০

১ | ২ | ৩ | ●
| মা পা গা মা | পা মা পা পা | পা দা দর্সা র্সা | নর্সা র্ঋর্সনর্সা না দপা
| জী ব ন সা | গ রে ভা সি | চা হি ত ব | প ০ ০ থে

১ | ২ | ৩
| পা দা পা দা | র্সা না র্সা র্সা | নর্সা র্ঋা র্সর্ঋর্সর্ঋা র্ঋর্সা |
| ন য় ন মে | লি য়া দে খি | তোমা রি আ লো |

● | ১ | ২
| র্সা নর্সর্ঋর্সা নর্সনা দপা | পা দা র্দসা র্সর্সা | র্সা র্সর্ঋা নর্সা র্ঋর্সা
| কে ০ ০ ০ | প্র ভু স্থা নদি | ও তব চর ণ

স্বরলিপি

| ৩ না র্সা নদপা সধা | ০ সা ঋ গা মা | ১ গা মা পা মগা | ২ মা গমা পমা পা |
| ক ম লে, তুমি | দে খা দা ও | এ সে ছি তব | দু য়া ০ রে |

| ৩ পদা দর্সা নর্সা ঋর্সা | ০ নর্সঋর্সা নর্সঋর্সা নর্সনা দপা | ১ পদা দদা র্সনা র্সা |
| প্রাণ মন দিনু মম | সঁপিনু তো মা ০ রে | দয়া কর মো রে |

| ২ র্সা ঋ ঋা ঋা | ৩ র্সঋর্গা ঋা ঋা র্সা | ০ নর্সা ঋর্সা নর্সনা দপা | ১ দদা ঋর্সা |
| রে খ তু মি | পা দ প দ্মে | ০ ০ ০ ০ | দয়া ০ |

| র্সা র্সা | ২ নর্সা ঋর্সা নর্সা র্সা | ৩ র্সঋা ঋঋা র্সঋর্গা ঋা | ০ ঋর্সর্সা নর্সঋর্সা |
| ক র | মো ০ ০ রে | রেখ তুমি পা দ | প দ্মে ০ |

| নর্সনাদপমা গমা |
| ০ |.

শ্রীমতী প্রতিভা দেবী।

ঐ

মাতৃ-বন্দনা।

হে জননি, ফুরাবে না তোমার যে দান,
শিরার শোণিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন, সে ত তব আশীর্ব্বাদ।

মাতঃ!

পুণ্যময়ী মাতৃভূমি—
চিনায়ে দিয়েছ তুমি,
তোমা হ'তে জানিয়াছি নিখিল-মাতারে।
সে দোঁহার শ্রীচরণে
নত হয়ে কায়মনে,
পারি যেন তব পূজা পূর্ণ করিবারে।

জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজিকে অরুণ-কিরণ-রূপে,
জননি, তোমার মরণ হরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবনমাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি
ভক্তি-পাবন তোমার পূজার ধূপে।
জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজিকে অরুণ-কিরণ-রূপে।

মাতৃ-বন্দনা

জননি,

তোমার মঙ্গল-মূর্ত্তি অমৃতে লভিছে স্ফূর্ত্তি
অমর্ত্ত্য জগতে।
তোমার আশিষ-দৃষ্টি করিছে আলোক-বৃষ্টি
সংসারের পথে।
তোমার স্মরণপুণ্য করিতেছে গ্লানিশূন্য
সন্তানের মন।
যেন, গো মোদের চিত্ত চরণে যোগায় নিত্য
কুসুম-চন্দন।

হে জননি, বসিয়াছ মরণের মহা-সিংহাসনে,
তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভুবনে।
দিনের আলোক হ'তে চাও তুমি আমাদের মুখে,
রজনীর অন্ধকারে আমাদের লও টানি' বুকে।
মোদের উৎসব-মাঝে তোমার আনন্দ করে বাস,
মোদের দুঃখের দিনে শুনি যে তোমার দীর্ঘশ্বাস।
মোদের ললাটে আছে তোমার আশিষ-করতল,
এ কথা নিয়ত স্মরি দেহ মন রাখিব নির্ম্মল।

ওগো মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিণী।
সে দিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,
সে পূজা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ, মা, চলি,
তাঁহারি পূজায় দিনু তব পূজাঞ্জলি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।